ইতিহাস ও সংস্কৃতি

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

ইতিহাস ও সংস্কৃতি



সচ্চিদানন্দ প্রকাশনী কলকাতা ৭০০ ০৫৫

প্রকাশক
ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
১৩৪ এ ব্লক বি লেকটাউন
কলকাতা ৭০০ ০৫৫

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৬০

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

বিক্রয়কেন্দ্র
দি বুক হাউস
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
দুর্গাপ্রসাদ মিত্র
এলম্ প্রেস
৬৩ বিডন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

সোনাটা (কাব্যগ্রন্থ)

একটি দিনের জন্মদিনে (কাব্যগ্রন্থ)

কিশোরীচাঁদ মিত্রের দ্বারকানাথ ঠাকুর

(সম্পাদিত চরিতগ্রন্থ)

Indian Historiography and Rajendralal Mitra

A Tribal History of Ancient India : A Numismatic Approach

ভূমিকা

প্রধানত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির নানামুখী বিকাশের ধারাকে অবলম্বন করে লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধের গ্রন্থনায় বর্তমান গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ। আপাতদৃষ্টিতে প্রবন্ধগুলি বিষয়গতভাবে বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তাদের সহোদর সম্পর্ক আবিষ্কারের জন্য ধীমান পাঠকের সামান্য মনোযোগই যথেষ্ট বলে মনে করি। প্রথম রচনা 'ইতিহাস রচনার ইতিহাস' সমগ্র গ্রন্থের প্রবেশক-নিবন্ধ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। 'ইতশ্চিন্তা'র (শব্দটি আমার উদ্ভাবিত) অন্তর্গত বিষয়গুলিও গ্রন্থের সঙ্গে অসম্পৃক্ত নয় এবং দীর্ঘকাল আগে প্রকাশিত এ আলোচনাগুলির প্রাসঙ্গিকতা এখনও অম্লান বলে এ বইতে তাদের স্থান দিয়েছি। সংক্ষেপে, এই গ্রন্থ আবহমান ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক চিত্রলিপি রচনার বিনীত প্রয়াস।

গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলিতে পাঠক বর্তমান লেখকের মৌলিক গবেষণার সঙ্গে চিন্তার ও দৃষ্টিকোণেরও পরিচয় পাবেন বলে বিশ্বাস। ঔদুম্বর জনগোষ্ঠীর মুদ্রায় ঋষি বিশ্বামিত্রের উপস্থিতির এবং মহাদেবের বটুক-ভৈরব সংক্রান্ত মূর্তি-কল্পনার নূতন তথ্যনির্ভর ব্যাখ্যা প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন গান্ধার ও আন্ধ্রশিল্পের অর্থনৈতিক পটভূমিকা এবং কুমারস্বামী সম্পর্কিত আলোচনা দু'টিতেও আমার বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ ও নিজস্ব মতামতের উচ্চাবণ অস্পষ্ট নয়।

পাঠকের দৃষ্টি আরও দু'টি ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় : বানানের ব্যাপারে বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম মেনে আমি প্রধানতঃ, প্রথমতঃ ইত্যাদি তস্-ভাগান্ত শব্দে বিসর্গ বর্জন করেছি। দ্বিতীয়ত, নূতন শব্দের নির্মাণ ; এক্ষেত্রে পূর্বোক্ত 'ইতশ্চিন্তা' ছাড়া দু-একটি নূতন শব্দ বা তর্জমা সৃষ্টির নিদর্শন হিসাবে 'ট্রাইব'-এর ভারতীয় রূপ 'জনগোষ্ঠী'র উল্লেখ করতে পারি।

বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশের, এক হিসাবে আমার অধিকাংশ প্রবন্ধ রচনার, পিছনে অনেকের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা অবিরলভাবে বিদ্যমান। এবং এই সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আতাউর রহমান, করুণাশঙ্কর রায়, দিলীপ-কুমার সেনগুপ্ত, পূর্ণেন্দু পত্রী, রমাপদ চৌধুরী এবং সুভো ঠাকুর। এঁরা আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। মুদ্রণের ব্যাপারে সর্বৈব সহযোগিতার জন্য এলম্ প্রেসের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমার তিনজন স্নেহাস্পদ

ছাত্র—আশিস মাইতি, কোরক চৌধুরী এবং হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়—বর্তমান গ্রন্থপ্রকাশে নানাভাবে উৎসাহ দেখিয়েছেন ; শ্রীমান আশিস আমার দু'টি প্রবন্ধ বিস্মরণ থেকে উদ্ধার করেছেন, শ্রীমান কোরক ইংরেজীতে লেখা 'রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ করেছেন এবং নির্ঘণ্ট প্রণয়নের দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীমান হৃষীকেশ। এঁদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্নেহাশীর্বাদ জানাই। আমার মাতৃদেবী কয়েকটি প্রবন্ধের প্রেস-কপি তৈরি করে দিয়েছেন ; তাঁর কাছে লৈখিক কৃতজ্ঞতার প্রকাশ বাহুল্য মাত্র।

সচ্চিদানন্দ প্রকাশনীর বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং অম্বিকা ভট্টাচার্য ব্যয়সাপেক্ষ এ বই প্রকাশ করে শুধু সাহসেরই পরিচয় দেন নি, আমার সাহিত্যবিষয়-বহির্ভূত প্রবন্ধ রচনার অসামান্য প্রেরণারও কারণ হয়েছেন। তাঁদের পক্ষ থেকে আমি সুধী পাঠকবৃন্দের সোৎসাহ সমর্থন প্রার্থনা করি।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

ইতিহাস ও সংস্কৃতি

ইতিহাস রচনার ইতিহাস, ভারত প্রসঙ্গে

ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৯৩৮) মূল সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর বলেছিলেন, প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের পুনরুদ্ধারের কাজ উনিশ শতকের জে. এফ. ফ্লীট বা আর. জি. ভাণ্ডারকর নন, দ্বাদশ শতাব্দীর কাশ্মীরী পণ্ডিত কলহণই শুরু করেছিলেন। জন ফেথফুল ফ্লীট এবং রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর (দেবদত্ত রামকৃষ্ণের পিতা)—বিদেশী এবং দেশী এই দুই প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকের অনুষঙ্গে আরও অসংখ্য নাম মনে আসে। সীমাবদ্ধ পরিসরে এই সব লেখকের কর্মকৃতির মূল্যায়ন সাধ্যের অতীত। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের (আদি মধ্যযুগের) ভারতবর্ষের ইতিহাসের ক্ষেত্রে নানামুখী গবেষণার ধারা এবং সেই সূত্রে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনাই বর্তমান নিবন্ধের ভিত্তিভূমি।[১]

॥ দুই ॥

ঘটনা হিসাবে বিস্ময়কর হলেও একথা সত্য, সাধারণভাবে ভারতবর্ষের এবং বিশেষভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় প্রতীচী লেখকরাই পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছেন। অন্তত সমকালীন গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে আনুপূর্বিক ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার চেষ্টার জন্য প্রতীচ্যের লেখকদের কাছে আমাদের ঋণ অনস্বীকার্য। ১৭৮৩ সালে স্যার উইলিআম জোন্স-এর ভারত-আগমন এবং ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ভারত-ইতিহাস চর্চার ইতিহাসে দু'টি স্মরণীয় ঘটনা ; কারণ ভারতবাসীর মধ্যে স্বদেশ-সন্ধিৎসার সূত্রপাতের সঙ্গে ঘটনা দু'টির যোগ ঘনিষ্ঠ। পাশ্চাত্যের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের, এক হিসাবে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বড় অংশের, পরিচয় ঘটানোর ক্ষেত্রে উইলিআম জোন্স ও তাঁর সহকর্মীদের ভূমিকা সশ্রদ্ধভাবে স্মর্তব্য।

---

১ সংক্ষিপ্ত এ রচনায় জীবিত ঐতিহাসিকদের এবং তাঁদের মৌলিক গ্রন্থের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

'শকুন্তলা', 'গীতগোবিন্দ' এবং 'মনুস্মৃতি'র অনুবাদ করেন জোন্স, প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৭৮৯, ১৭৯৩ ও ১৭৯৪। জোন্স কর্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার বছরে চার্লস উইলকিন্স 'ভগবদ্‌গীতা'র অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং পাশ্চাত্ত্য লেখকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম একটি ইউরোপীয় ভাষাতে সংস্কৃত গ্রন্থ রূপান্তরণের কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। ১৭৮৭ সালে উইলকিন্স 'হিতোপদেশ' অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৭৮৯ সালে জোন্স-এর 'শকুন্তলা' এবং তারও আগে ১৭৮৪ সালে চার্লস উইলকিন্স-এর 'ভগবদ্‌গীতা'র ইংরাজী অনুবাদের মাধ্যমে আধুনিক পশ্চিমে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। উইলকিন্স ও জোন্স-এর সহকর্মী এবং পরবর্তী অনুগামীদের অনেকের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন : হেনরী টমাস কোলব্রুক (১৭৬৫-১৮৩৭), হোরেস হেম্যান উইলসন (১৭৮৬-১৮৬০), জেমস প্রিন্সেপ (১৭৯৯-১৮৪০), খ্রীস্টীয়ান ল্যাজেন (১৮০০-৭৬) ইউজীন ব্যুর্নুফ (১৮০১-৫২), মনিআর উইলিআমস (১৮১৯-৮৯), আলেকজাণ্ডার কানিংহাম (১৮১৪-৯৩), রুডলফ রোট (১৮২১-৯৫), ফ্রীডরিখ ম্যাক্স মুল্যার (১৮২৩-১৯০০), ইভান পাভ্লোভিচ মিনায়েফ (১৮৪০-৯০)। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পরে ১৭৮৮ সালে 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' নামে গবেষণা-পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করল। 'এশিয়ার ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে' গবেষণার ফসলবাহী এই পত্রের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো : এশিয়া তথা ভারতবর্ষেরও ইতিহাস ও সংস্কৃতি আছে এবং তা পুরাতন বলে পর্যাপ্ত গবেষণার বিষয়ীভূত। আরও পরে আত্মপ্রকাশ করল 'কোয়ার্টার্লি জার্নাল' (১৮২১), 'গ্লিনিংস ইন সায়েন্স' (১৮২৯) এবং 'জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি' (১৮৩২)। নতুন আবিষ্কার ও মূল্যবান ধারণা-সিদ্ধান্তে দেদীপ্যমান এই পত্রিকা ক'টি ইতিহাস-গবেষণার ক্ষেত্রকে বিস্তৃততর করল। বস্তুত, উইলিআম জোন্স আদি বিদেশী মনীষীদের কাছে ভারতবাসীর ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁদের কাছ থেকেই ভারতবাসী প্রথম তাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস শোনে এবং তাঁদের প্রেরণাতেই সে-ইতিহাস পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয়।

॥ তিন ॥

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভারতীয় মনীষীদের সান্ধিৎসা ও গবেষণার সূত্রপাত গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। এ সূত্রে স্মরণীয় এই

সময় থেকেই ভারতপ্রেমী বিদেশীদের গবেষণার ফলে ভারতীয়দের মধ্যে স্বাধীনভাবে স্বদেশের ইতিহাস রচনার ইচ্ছা ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে ১৮৫৭ সালে নীলমণি বসাকের বাংলা ভাষায় দেশের পুরাবৃত্তের অভাব দূর করার জন্য বাংলায় লেখা 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'। দু বছর বাদে ১৮৬০ সালে কেদারনাথ দত্ত 'স্বাধীন ও সংস্কারমুক্ত কলমে' স্বদেশের ইতিহাস রচনার প্রয়াস পেলেন এবং লিখলেন 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'।

নীলমণি বসাক বা কেদারনাথ দত্ত আজ বিস্মৃতির অন্তরালে, যদিও অপ্রতুল তথ্যের সাহায্যে ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার যথাসাধ্য চেষ্টার জন্য তাঁরা অবশ্যস্মর্তব্য। ব্যাপক ও গভীর গবেষণার ক্ষেত্রে পদচারণা ঘটেনি বলেই সম্ভবত তাঁরা দ্রুত বিস্মৃত হয়েছেন। অন্য পক্ষে, মূল্যবান গবেষণার জন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২–৯১), রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর (১৮৩৭–১৯২৫), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৭–১৯৩১) বা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০) প্রথম সারির ভারত-তাত্ত্বিকের মর্যাদা পান।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস-সংক্রান্ত গবেষকদের মধ্যে অগ্রপথিকের ভূমিকা মুখ্যত যে দু'জনের, তাঁরা হলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র (তৃতীয় নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) এবং রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর। এঁদের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও ভাউ দাজীর নামও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ১৮৪৬ সালে রাজেন্দ্রলাল এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী কর্মসচিব ও গ্রন্থাধ্যক্ষ হন এবং ১৮৪৮ সালে সোসাইটির জার্নালের জানুআরি সংখ্যায় তাঁর প্রথম রচনা Inscription from the Vijaya Mandir, Udaypur প্রকাশিত হয়। ঐ বছরের নভেম্বর মাসে তিনি কামন্দক-কৃত 'নীতিসার' নামে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি সংক্রান্ত সুপ্রাচীন গ্রন্থের একটি পুঁথির প্রতি সোসাইটির কর্মসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং পরে তিনিই তাঁর বিদেশী বিদ্যোৎসাহী বন্ধুদের প্রেরণায় ঐ গ্রন্থ সম্পাদনা করেন (১৮৮৪)। রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় আরও বহু প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর মৌলিক গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য The Antiquities of Orissa (প্রথম খণ্ডের প্রকাশ ১৮৭৫, দ্বিতীয় খণ্ডের ১৮৮০) এবং The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (১৮৮২)। উপকরণের ঐশ্বর্যে এবং কতকাংশে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে গ্রন্থ দু'টি এখনও পণ্ডিতমহলের সশ্রদ্ধ বিস্ময়।

রাজেন্দ্রলালের মতো রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকরও সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃতে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর The Early History of the Deccan (১৮৮৪) এবং A Peep into the Early History of India (১৯০০) প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে দু'খানি মূল্যবান গ্রন্থ। এই বই দু'খানির সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব শৈব প্রভৃতি বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্যধর্মগুলি সংক্রান্ত রচনাবলি। গবেষণার ব্যাপকতা ও গভীরতায় মূল্যবান ভাণ্ডারকরের এই রচনাগুলি ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-মতের, অন্য ভাবে হিন্দুধর্মের, বিবর্ধন-বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনার ভিত্তিরূপে পরিগণ্য। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও ভাণ্ডারকর স্বীয় মনীষার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বস্তুত ভাণ্ডারকরের বহুমুখী পাণ্ডিত্যের তুলনা অত্যন্ত দুর্লভ। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির গবেষণাক্ষেত্রে তিনি সোনা ফলিয়েই ক্ষান্ত হন নি, পরবর্তীদের জন্য সে ক্ষেত্র নানা-ভাবে উর্বর করে গেছেন।

রাজেন্দ্রলাল-রামকৃষ্ণগোপালের অল্পবিস্তর পরবর্তী গবেষক ও ঐতি-হাসিকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, (চতুর্থ নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। হরপ্রসাদের সারস্বত জীবনের উদ্বোধন রাজেন্দ্রলালের সান্নিধ্যে, রাজেন্দ্রলালের নেপালী বৌদ্ধসাহিত্য প্রণয়নের সূত্রে। রাজেন্দ্রলালের মতো হরপ্রসাদও প্রাচীন পুঁথিপত্রে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন এবং সারা জীবনের পরিশ্রমে ৮০০০-এরও বেশি পুঁথি সংগ্রহ করেন। এই পুঁথিগুলির মধ্যে কতকগুলি বিষয়বস্তুতে অনন্য, এবং কয়েকটির প্রাচীনত্ব সপ্তম শতক পর্যন্ত টানা যেতে পারে। মূল্যবান এই পুঁথিগুলি আবিষ্কারের ফলে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি কিভাবে কতখানি সমৃদ্ধ হয়েছে, সংক্ষেপে দু'টি দৃষ্টান্তের উল্লেখই বোধ করি পর্যাপ্ত হবে : প্রথম, বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি বৌদ্ধ-ধর্মের বিভিন্ন শাখার অস্তিত্বের বিশদ সংবাদ এবং দ্বিতীয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ' নামীয় সাড়ে ছেচল্লিশটি কবিতার আবিষ্কার। গুরু রাজেন্দ্রলালের মতো হরপ্রসাদও প্রাচীন লেখ সম্পাদনে উৎসাহ ও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (পঞ্চম নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) তাঁর পূর্বসূরিদের পথকে প্রশস্ততর করতে পেরেছিলেন অধীত বিষয়ের ব্যাপকতায় এবং চিন্তার গভীরতায়। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা যেমন অসংখ্য (প্রায় সবই

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত), তেমনই আধুনিক বা শেষ মধ্যযুগীয় ইতিহাসেও তিনি স্বচ্ছন্দভাবে পদচারণা করে গেছেন। 'গৌড়লেখমালা' (১লা সেপ্টেম্বর ১৯১২) গ্রন্থে তিনি যেমন প্রাচীন লেখ সম্পাদনে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তেমনই সিরাজউদ্দৌল্লার বিরুদ্ধে অন্ধকূপ-হত্যার অপবাদ অপনোদনে পরিশ্রমী তথ্য-সংগ্রাহক ও কুশলী তথ্য-বিশ্লেষকের ভূমিকায় সার্থক ঐতিহাসিকের পরিচয় রেখেছেন। অক্ষয়কুমারের 'সিরাজদ্দৌল্লা' (২১ জানুআরি ১৮৯৮), 'মীরকাসিম' (২৫ ফেব্রুআরী ১৯০৬) বা 'ফিরিঙ্গি বণিক' (২০ জুলাই ১৯২২) তথ্যনিষ্ঠ হয়েও কলার উদ্ভব, উপন্যাসের মতো সুখপাঠ্য। ভারতবর্ষের বিশেষত বাংলাদেশের শিল্প-কলার গতিপ্রকৃতি ও বিবর্তন সম্পর্কেও অক্ষয়কুমার কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে গেছেন ; সেই সব মন্তব্যে তাঁর ঐতিহাসিক মনীষার পরিচয় প্রদীপ্ত। অক্ষয়কুমার সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য ইংরেজীতে লেখার সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতন হয়েও তিনি তাঁর গবেষণার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মাতৃভাষাতে প্রকাশ করে গেছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি যথার্থই জাতীয়তা-বাদী ঐতিহাসিক।

অক্ষয়কুমারের সমগোত্র রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (ষষ্ঠ নিবন্ধ) ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় নাম। মহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কারের গৌরব তাঁর এই স্মরণযোগ্যতার ভিত্তি হলেও অসংখ্য নিবন্ধে ও ন্যূনাধিক চারটি বিশিষ্ট গ্রন্থে দীপ্যমান বহুমুখী পাণ্ডিত্য রাখালদাসকে বর্তমান শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের আসন দিয়েছে। লেখমালা মুদ্রা ইত্যাদি পুরাবস্তু অধ্যয়নে বিশ্লেষণে রাখালদাসের নৈপুণ্য সর্বজনস্বীকৃত। ভারতবর্ষের অঞ্চল বিশেষের প্রাচীন বা মধ্য যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনাতেও তাঁর সাফল্য বিস্ময়কর। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাখালদাসের 'বাংলার ইতিহাস' (দ্বিতীয় খণ্ড)-কে মধ্যযুগীয় ভারত-ইতিহাসের প্রমাণপুরুষ যদুনাথ সরকার 'অত্যন্ত মূল্যবান' গ্রন্থরূপে অভিনন্দিত করেছেন। রাখালদাসের গ্রন্থাবলির মধ্যে চারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : Age of the Imperial Guptas, History of Orissa (দু খণ্ড), 'বাংলার ইতিহাস' (দু খণ্ড) ও 'প্রাচীন মুদ্রা'। অক্ষয়কুমারের মতো রাখালদাসও মাতৃভাষার অনুরাগী ছিলেন এবং সদ্য উল্লিখিত 'প্রাচীন মুদ্রা' প্রণয়নে তিনি সম্ভবত এই প্রমাণই রাখতে চেষ্টা করেছিলেন যে, অধীত বিষয়ে যথার্থ অধিকার থাকলে মাতৃভাষায় তা যথাযথ প্রকাশ করা যায়। ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং ঘটনা অবলম্বনে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনাতেও

রাখালদাস সিদ্ধির সামীপ্য পেয়েছিলেন। 'শশাঙ্ক', 'ধর্মপাল', 'করুণা', 'ময়ূখ', 'অসীম', 'ধ্রুবা' ইত্যাদির স্রষ্টা রাখালদাস 'বেনের মেয়ে'র রচয়িতা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুগামী এবং 'গৌড়মল্লার', 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' প্রভৃতির প্রণেতা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বসূরি।

॥ চার ॥

রাজেন্দ্রলাল, রামকৃষ্ণগোপাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার এবং রাখালদাস এই পাঁচজন ইতিহাস-সাধক সামগ্রিকভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিচিত্র-ব্যাপক দানের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করে গেছেন। এঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমারের নাম অন্যভাষী পাঠকের কাছে অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিচিত হলেও অক্ষয়কুমারকে নানা কারণে আমি মহৎ ঐতিহাসিকের আসন দিতে ইচ্ছুক। কারণগুলির মধ্যে প্রধানতম, অক্ষয়কুমারের আধুনিক ঐতিহাসিক মনন (তুলনীয় : 'রাজা, রাজ্য, রাজধানী, যুদ্ধবিগ্রহ এবং জয়-পরাজয়—ইহার সকল কথাই ইতিহাসের কথা। তথাপি কেবল এই সকল কথা লইয়াই ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না।'—রমাপ্রসাদ চন্দের 'গৌড়রাজমালা'র ভূমিকা, পৃ. ১৫)। এই ঐতিহাসিক-পঞ্চক ছাড়াও আরও অসংখ্য দেশী বিদেশী মনীষী ও গবেষক প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন। তাঁদের সেই দানের মূল্যায়ন বৃহৎ কলেবর গ্রন্থের বিষয়। গবেষণার বিষয় অনুসারে অত্যন্ত সংক্ষেপে তাঁদের কয়েকজনের উল্লেখ মাত্র করা হলো।

॥ পাঁচ ॥

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষক মাত্রের একই সঙ্গে উপাদানের ব্যাপক বৈচিত্র্য ও উপাদানের আপেক্ষিক অপ্রতুলতার অভিজ্ঞতা আছে। 'বল্লাল সেন লক্ষ্মণ সেন ছিলেন দিল্লীর অধিপতি'—উনিশ শতকের গোড়ায় ফোর্ট উইলিআম কলেজের পণ্ডিতদের এই ধারণার সময় থেকে আমরা অনেক দূর চলে এসেছি, সময় এবং গবেষণা উভয় ক্ষেত্রেই। কিন্তু ভারতেতিহাসের এই অগ্রগামী গবেষণায় ছোট-বড়-মাঝারি কত অসংখ্য কর্মীর শ্রম ও মনন নিয়োজিত হয়েছে, তার অনুসন্ধান আজ স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ গবেষণার বিষয়। প্রাচীন ভারত-বর্ষের ইতিহাসের এক-একটি আকর-সন্ধানের ক্ষেত্রে এঁদের কারও

জীবনের অধিকাংশ সময় কারও বা সারা জীবনই ব্যয়িত হয়েছে। আকরগুলি প্রধানত দু ভাগে বিভক্ত : প্রত্নতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যগত। প্রত্নতাত্ত্বিক আকরের মধ্যে আছে লেখ, মুদ্রা, বিভিন্ন শিল্প-নিদর্শন ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ। সাহিত্যগত আকর দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থ নিয়ে গঠিত। পূর্বোক্ত পাঁচজন পথিকৃৎ-প্রতিম ঐতিহাসিক উভয়বিধ আকর নিয়েই গবেষণা করেছেন। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে গবেষণার ক্ষেত্র বিস্তৃততর হওয়ার ফলে অনেকে আকরবিশেষের প্রতি অধিকতর মনঃসংযোগ করেন।

প্রাচীন লেখসমূহ সম্পাদনে প্রাতঃস্মরণীয় জেমস প্রিন্সেপের পরে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম : কীলহর্ন, ফ্লীট, ব্যুহলার, সিউয়েল, কনো, হুল্‌জ্ ; এবং ভগবানলাল ইন্দ্রজী, রাজেন্দ্রলাল, হরপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ ও দেবদত্ত ভাণ্ডারকর (পিতাপুত্র), ননীগোপাল মজুমদার, কৃষ্ণশাস্ত্রী, বেঙ্কয়া, নিরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্তী ও অনন্তসদাশিব আলটেকর। মুদ্রাসংক্রান্ত গবেষণাতেও জেমস প্রিন্সেপের ভূমিকা পথিকৃতের। মুদ্রাতত্ত্বের বিশিষ্ট গবেষকদের কয়েকজন : ল্যাজেন, কানিংহাম, র‍্যাপসন, ভিনসেণ্ট স্মিথ, জন অ্যালান, আর. বি. হোয়াইট-হেড ; এবং দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী, নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং অনন্তসদাশিব আলটেকর। ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিল্পেতিহাস সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রেও প্রতীচ্য পণ্ডিতদের কাছে আমাদের ঋণ যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গে অনিবার্য-ভাবেই মনে পড়ে হ্যাভেল ও নিবেদিতাকে, ভারতশিল্পের পুনরুজ্জীবনে সহৃদয় ও পরিশ্রমী ভূমিকার জন্য যাঁরা আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতাভাজন। ভারতীয় স্থাপত্য ও শিল্পকলার ইতিহাসে হ্যাভেল ও নিবেদিতা ছাড়া বিশিষ্ট গবেষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : জেমস ফার্গুসন, বার্জেস, বার্ডউড, ভিনসেণ্ট স্মিথ, আলফ্রেড ফুশে, হাইনরিখ জিমার, রেনে গ্রুসে, আনন্দ কুমারস্বামী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শাহেদ সুরাবর্দী, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বাসুদেবশরণ অগ্রবাল, নির্মলকুমার বসু এবং মোতিচন্দ্র। চিত্র ও ভাস্কর্যশিল্পে রূপায়িত বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে ধর্মীয় ও সমাজমানসের প্রতিফলন ঘটে, ফলত মূর্তির বাহ্যিক বিবরণের সঙ্গে সমকালীন ধর্মীয় ও সামাজিক শক্তিগুলির অনুসন্ধানী অধ্যয়নও প্রয়োজন। দেবদেবীর মূর্তিসংক্রান্ত অধ্যয়ন-ক্ষেত্রের আবিষ্কার অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক হলেও ইতিমধ্যে যা কাজ হয়েছে, গুণগতভাবে তা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ভারতীয় মূর্তিতত্ত্বের ক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ

গবেষকদের তালিকা স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত। এই তালিকায় আছেন : আনন্দ কুমারস্বামী, গোপীনাথ রাও, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য, নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং বিনয়তোষ ভট্টাচার্য। ভারতীয় মূর্তিতত্ত্বে সম্প্রতি বিদেশীদের আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে।

ইতিহাসের জন্য সাহিত্যগত উপাদান সংগ্রহে ও বিশ্লেষণে দেশী-বিদেশী অনেকেই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রাজেন্দ্রলালের সময় থেকেই সাহিত্যগত উপাদানের মূল্য স্বীকৃত হয়ে আসছিল, যদিচ রাজেন্দ্রলাল একান্তভাবে এই উপাদানের উপর নির্ভর করার বিরোধী ছিলেন। বিদেশীদের মধ্যে বৈদিক সাহিত্যের অধ্যয়নে উইলসন, ম্যাক্স মুলার, ব্লুমফীল্ড, গ্রিফিথ, লুই রেনু ; মহাকাব্য ও পুরাণ সাহিত্যে ওয়েবর, উইণ্টারনিৎস (সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের স্তম্ভপ্রতিম ইতিহাস রচনায় আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন), কিরফেল, পার্জিটার এবং অন্যান্য সাহিত্য-শাখায় সিলভ্যাঁ লেভী, পিশেল, রিস ডেভিডস, জেকোবি, সুব্রিং প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয়-দের মধ্যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাঁরা ভারতীয় সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন তাঁদের কয়েকজন : শামা শাস্ত্রী, কাশীপ্রসাদ জয়শওয়াল, হারান-চন্দ্র চাকলাদার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, হেমচন্দ্র রায়-চৌধুরী, বেণীমাধব বড়ুয়া, অতীন্দ্রনাথ বসু, পি. ভি. কানে, উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, বিমলাচরণ লাহা, নলিনাক্ষ দত্ত, এ. ডি. পুশলকর প্রমুখ। সাহিত্যগ্রন্থ লব্ধ উপাদানকে এঁরা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনায় সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। বস্তুত, বর্তমান শতকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসের নানাক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতি অনস্বীকার্য। এই শতকেই আবিষ্কৃত হয়েছে মহেঞ্জোদাড়োর মতো আদি-ঐতিহাসিক শহর, কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'র মতো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। রাজেন্দ্রলাল রামকৃষ্ণ-গোপালের খনিত পথ দীর্ঘ ও প্রশস্ততর হয়েছে বহু মনীষীর বহু পরিশ্রমী গবেষণায়।

বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যগত আকরলব্ধ তথ্যের সার্থক সমন্বয়ের তিনটি দীপ্ত দৃষ্টান্ত : হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর Political History of Ancient India, হেমচন্দ্র রায়ের Dynastic History of Northern India এবং কে. এ. নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর The Cholas এবং তিনটি গ্রন্থই পরিশ্রমী তথ্যসংগ্রহ ও নিপুণ তথ্যবিশ্লেষণে প্রথম শ্রেণীর গবেষণাকর্ম।

ভারতেতিহাসের প্রাচীন যুগের কিছু অংশে এখনও অন্ধকার, কিছু অংশে আলো-আঁধারির অস্পষ্টতা। এই অন্ধকার বা আবছায়ার দূরীকরণ প্রধানত নতুন তথ্যের আবিষ্কারেই সম্ভব। এ ছাড়া ইতিপূর্বে অবহেলিত কাহিনী–কিংবদন্তী, লোকগাথা-লোকাচার ইত্যাদি উপাদানও যে অনেক সময় অপ্রত্যাশিত আলোকপাত করতে পারে, গবেষণায় তা সপ্রমাণ হয়েছে। সেই কারণে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের সঙ্গে এই সব জীবন্ত উপাদানের মূল্যও ক্রমশ উপলব্ধ হচ্ছে। অসংখ্য 'ট্রাইব' বা জনগোষ্ঠীর দেশ ভারতবর্ষে নৃতাত্ত্বিক উপাদানের গুরুত্ব আজ আর বিস্তৃত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এই শতকের গোড়াতে ই. টি. ড্যাল্‌টন এবং হার্বার্ট রীজলির ভারতবর্ষের ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠী ও জনসংস্কৃতি সংক্রান্ত গবেষণায় ভারতেতিহাস রচনায় নৃতাত্ত্বিক উপাদানের মূল্য স্বীকৃত হলো। প্রশংসনীয় ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ দ্বারা পরিচালিত রীজলির গবেষণা যাঁদের অন্নন্বিস্তর প্রেরণা দিয়েছে, তাঁদের মধ্যে হাটন, রমাপ্রসাদ চন্দ, দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, হারানচন্দ্র চাকলাদার, শরৎকুমার রায় এবং নির্মলকুমার বসু সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননেও বর্তমান শতকের প্রগতি আশাপ্রদ। স্যার জন মার্শাল, আর্নেস্ট ম্যাকে ও মর্টিমার হুইলারের বিশিষ্ট কর্মকৃতির সঙ্গে ভারতীয়দের নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম অবশ্য স্মরণীয়। এম. এস. বৎস, ননীগোপাল মজুমদার, কাশীনাথ দীক্ষিত এবং সুব্বা রাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

॥ ছয় ॥

বিভিন্ন আকরলব্ধ তথ্যের নিপুণ বিন্যাসে ঐতিহাসিকের কৃতিত্ব। আর একটু বিশদভাবে, তথ্যকে কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত করার ক্ষমতাই ইতিহাসশিল্প। উপাদানের অপ্রতুলতার কথা মেনে নিয়েও বলব, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত রচনার ক্ষেত্রে লেখক-সংখ্যার তুলনায় ঐতিহাসিকের সংখ্যা কম। অর্থাৎ অল্পসংখ্যক লেখকের মধ্যে যথার্থ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ করা যায়। এবং এই দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের ইতিবৃত্ত লেখকদের বা তথাকথিত গবেষকদের মধ্যেও লক্ষণীয়। তদুপরি অধিকাংশ ভারতেতিহাস-লেখক কি বলতে হয় জানেন, কেমন করে বলতে হয় জানেন না। তাঁদের অনেকের লেখা দুষ্পাঠ্য হবার ফলে সাধারণ পাঠক এখনও স্মিথের Early History of India-র স্বচ্ছন্দ লিখন-শৈলীতে আকৃষ্ট হন।

ভিনসেণ্ট স্মিথের এই বিখ্যাত বইটি প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার আর দু-একটি বিশিষ্ট প্রয়াসের উল্লেখ করা দরকার। এ ধরনের প্রথম সার্থক প্রয়াস মনস্টুআর্ট এলফিনস্টোন (১৭৭৯-১৮৫৯)-এর দু'খণ্ডে প্রকাশিত History of India (প্রথম খণ্ডের প্রকাশ ১৮৩৯ সাল)। এই ভারতবৃত্তান্ত দীর্ঘদিন ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য থাকার দরুন এটি বহু সংস্করণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিল।[১] এবং সম্ভবত এলফিনস্টোনের আদর্শে অনুপ্রেরিত হয়ে নীলমণি বসাক বা কেদারনাথ দত্ত ছোট আকারে অনুরূপ ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেছিলেন। স্মিথের ভারতেতিহাস প্রকাশের পরে এলফিনস্টোনের প্রচার কমে আসতে থাকে এবং কালক্রমে বন্ধ হয়ে যায়। এলফিনস্টোন এবং স্মিথের একক প্রচেষ্টার পর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের সাহায্যে ভারত-ইতিহাসের সামগ্রিক রূপকে মোট ছ'টি খণ্ডে ধরে রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে এই ইতিহাসমালার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ই. জে. র‍্যাপসন-এর সম্পাদনায়। পরে অন্যান্য খণ্ডগুলি (দ্বিতীয় খণ্ড ছাড়া) বেরোলে আমাদের অতীত জীবনের একটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। একালের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীতে কেম্ব্রিজ ইতিহাসমালার লেখকদের কারো কারো রচনা সমালোচনার যোগ্য হলেও এই সুলিখিত ভারতবৃত্তান্ত দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমাদের প্রধান অবলম্বন ছিল। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে এটির স্থান দখল করে আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় বিভিন্ন ভারতীয় পণ্ডিতদের রচনার সমবায়ে প্রকাশিত History and Culture of the Indian People (ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত) নামক গ্রন্থমালা (এগারোটির মধ্যে দশটি প্রকাশিত)। ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই ভারতবৃত্তান্ত সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস-চর্চায় কীর্তিস্তম্ভরূপে পরিগণিত হবার যোগ্য।

॥ সাত ॥

রাজেন্দ্রলাল, ভাণ্ডারকর, রাখালদাস প্রমুখের কর্মকৃতি প্রসঙ্গে আর একটি বৈশিষ্ট্য মনে পড়ে : উনিশ শতকের শেষার্ধে এবং বর্তমান শতকের প্রথম কয়েকটি দশকে ইতিহাস ও সাহিত্য হাত ধরাধরি করে পথ চলত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমারের লেখা কবি অক্ষয়কুমার বড়াল- রচিত

১ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে ডবু রবার্টসন প্রথম প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেন।

'কনকাঞ্জলি'র বিদগ্ধ ভূমিকা বা যদুনাথ সরকার-কৃত রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র সমালোচনার উল্লেখ করা যায়; এবং হরপ্রসাদ ও রাখালদাস তো নিজেরা সাহিত্যস্রষ্টাই ছিলেন। অন্যদিকে, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ সাহিত্যিক তাঁদের বহু রচনায় ইতিহাস-চেতনার দীপ্ত স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের খেদোক্তি ('বাংলার ইতিহাস নাই...ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালীর লজ্জার কথা আর কোথায়?') ও ইতিহাস রচনেচ্ছার ('এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব') এবং রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নিবন্ধমালার কথা আজ আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই।

বস্তুত, ইতিহাস ও সাহিত্যের যোগ্য সহযোগেই জাতি তার আত্ম-পরিচয় লাভ করে। বাংলাদেশে উনিশ শতকের শেষ দু তিনটি এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম তিনটি দশকের ইতিহাস ও সাহিত্যের এই শুভ সংযোগ ঘটেছিল। সাহিত্যের পথ থেকে ইতিহাস তারপর অনেক দূরে বেঁকে গেছে। ফলে বেশির ভাগ সাহিত্যব্রতী শুধু-লেখকের বেশি কিছু হতে পারলেন না, ইতিহাস-অধ্যাপকরা ঐতিহাসিকের ঈপ্সিত আসন অর্জনে অসমর্থ হলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে য়ুরোপকে ইতিহাস শিক্ষা দিয়েছিলেন যে ওয়াল্টার স্কট, তিনি পেশাদারী ঐতিহাসিক নন; সাহিত্যস্রষ্টা মাত্র—১৯৩০ সালে উচ্চারিত ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ান-এর এই উক্তি ট্রেভেলিয়ানের আধুনিক ধীমান বাঙালী পাঠকেরও মনন স্পর্শ করতে পারেনি বলে আমার বিনীত বিশ্বাস।

পরিশেষে, আরও দু'টি ক্ষেত্রে ভাণ্ডারকর-অক্ষয়কুমার-রাখালদাস প্রমুখ ইতিহাস-সাধকের সঙ্গে একালের ইতিহাস-লেখকের ব্যবধান: প্রথম, অক্ষয়কুমার, রাখালদাস ও তাঁদের সহকর্মীরা ইতিহাসকে কখনও খণ্ডিত-ভাবে দেখতেন না, ইতিহাসের সামগ্রিক রূপ তাঁদের চোখে ধরা পড়েছিল। ফলত যে নৈপুণ্যে অক্ষয়কুমার প্রাচীন ভারতের বা প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের নানা দিক নিয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছেন, সেই দক্ষতাতেই তিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক পর্বের ভারতেতিহাস আলোচনা করেছেন; প্রাচীন ভারতের লেখ- ও মুদ্রা-তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ রাখালদাসের ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য বাংলা দেশের মধ্যযুগীয় ইতিহাসে বা মধ্যযুগের পূর্বভারতীয় ভাস্কর্যকলা সংক্রান্ত গ্রন্থেও সমুজ্জ্বল; রমাপ্রসাদ চন্দের মতো সুপ্রতিষ্ঠ নৃশাস্ত্রবিদের কলমে বৈষ্ণবধর্ম ও পূর্বভারতে শিল্প-কলার সূচনাপর্ব বিষয়ক গবেষণাকর্ম সম্ভব হতে দেখা যায়। এই ইতিহাস-সাধকদের অন্যতম প্রতিনিধি হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মধ্যেও

ইতিহাসকে অখণ্ডভাবে দেখার চোখের, অন্যভাবে ইতিহাস-চেতনার, পরিচয় সংদীপ্ত এবং ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ হয়েও অন্যান্য পর্বে তাঁর সমান পাণ্ডিত্য ও তথ্যবিন্যাস-নৈপুণ্য বিস্ময়কর। অন্যপক্ষে, এ কালের তরুণ-অতরুণ ইতিহাসব্রতীরা ইতিহাসকে খণ্ডিতভাবে দেখার দুর্মর অভ্যাস গড়ে তুলেছেন, বাংলাদেশের আধুনিক যুগের ইতিহাসে যিনি নিজেকে বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করেন, শশাঙ্ক, ধর্মপাল, হোসেন শাহ তাঁর কাছে নাম মাত্র। 'প্রাচীন' 'মধ্য' এবং 'আধুনিক'—এই ত্রিবিধ যুগবিভাগ সাম্প্রতিক ইতিহাস-চর্চার গতিধারাকে যে-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে, যথার্থ ইতিহাসব্রতী মাত্রেই তাতে শঙ্কিত বোধ করছেন, এবং আমাদের পক্ষে খেদের আরও কারণ, আধুনিক কালে ইতিহাস চর্চার পীঠস্থান বাংলাদেশেই এই ঐতিহাসিক ব্যাধির জন্ম এবং তা ক্রমশ দূরপ্রসারী।

পূর্বসূরিদের সঙ্গে একালীন ইতিহাস-লেখকদের দ্বিতীয় ব্যবধান, মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা। আপাতত বাংলাদেশের প্রতি দৃষ্টি রেখে বলি, অক্ষয়কুমার, হরপ্রসাদ প্রমুখ ইতিহাস-সাধকগণ ইতিহাসকে মুখস্থ করে পরীক্ষা দেবার স্তর থেকে বৃহত্তর জনসমাজে প্রাণবন্ত বিদ্যারূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে সঙ্গতভাবে মাতৃভাষার আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফলত, অক্ষয়কুমারের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি রচনা বাংলায়। মুদ্রাতত্ত্বের মতো দুরূহ বিষয়ও রাখালদাস অনায়াস বাংলায় লিখতে পেরেছিলেন।[১] বাংলা ভাষায় যে ইতিহাস-চর্চা আদৌ হ'তে পারে, এইসব ঐতিহাসিকের একাধিক দীপ্ত দৃষ্টান্তের পরও এ কালের বাঙালী ইতিহাসব্রতীরা সে সম্পর্কে গভীর সন্দিহান। মনে পড়ছে, কয়েক বছর আগে জনৈক খ্যাতিমান অধ্যাপক-সহকর্মী বাংলায় ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনায় অপটুতার কথা আমাদের কয়েকজনের সামনে সগর্বেই ঘোষণা করেছিলেন। এবং আরেকজন অধিকতর বিশ্রুত অধ্যাপক বাংলা ভাষায় রচিত তথ্য-তত্ত্বে মূল্যবান

১ জীবিত ঐতিহাসিকদের মধ্যে রাধাগোবিন্দ বসাক এবং রমেশচন্দ্র মজুমদারও মাতৃভাষায় ইতিহাস চর্চা করেছেন। হরপ্রসাদ, অক্ষয়কুমার, রাখালদাসের প্রবর্তিত ইতিহাস-সাহিত্যধারার অন্যতম শেষ প্রতিনিধি রাধাগোবিন্দ বসাক 'কৌটিলীয় অর্থ-শাস্ত্রের'র মতো দুরূহ গ্রন্থের বা 'মহাবস্তু অবদান' (তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ), 'রামচরিত' এবং 'গাথা-সপ্তশতী'র বঙ্গানুবাদ করে যেভাবে বাংলা সাহিত্যের ঋদ্ধিসাধন করেছেন, তাতে যথার্থ বাঙালী মাত্রেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলাদেশের ইতিহাস', নলিনীনাথ দাশগুপ্তের 'বাংলায় বৌদ্ধধর্ম' এবং নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' স্বভাবতঃই এ সূত্রে স্মরণীয়।

ঐতিহাসিক নিবন্ধকেও গবেষণা-প্রবন্ধের মর্যাদা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন ; কারণ তাঁর ধারণা, গবেষণামূলক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ইংরেজীতেই সম্ভব। বলা বাহুল্য, এই সব ইংরেজীগর্বীদের অধিকাংশের ইংরেজী ভুল-ভ্রান্তিতে এতই দুঃসহ যে, রবীন্দ্রনাথের ভাষা ধার করে বলতে হয়, এঁরা ইংরেজীও শিখলেন না, বাংলাও ভুলে গেলেন।

॥ আট ॥

সারত, সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতবর্ষে ইতিহাস-চর্চার দুঃসময়। ঐতিহাসিক পরিভাষার সাহায্যে বলতে পারি, সম্প্রতি ভারতবর্ষে ইতিহাস চর্চা যেন 'পুরাপ্রস্তর যুগে' ফিরে চলেছে। ইতিহাস-চর্চার মূল মন্ত্র কার্য-কারণসূত্রে ঘটনাকে গ্রথিত করার ক্ষমতা অর্জন এবং দেশ-বিদেশের ইতিবৃত্ত অধ্যয়নের মাধ্যমে ইতিহাসকে অখণ্ডভাবে দেখার চোখ তৈরি হলে এই ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়। বর্তমানে গবেষণার ব্যাপক প্রসার ঘটছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি 'ডক্টর' তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছে, কিন্তু সেই তুলনায় 'ইতিহাস'-পদবাচ্য সার্থক গ্রন্থের সংখ্যা অযথেষ্ট। বিষয় বিশেষে গভীর অধ্যয়নের প্রমাণ কিছু কিছু সাম্প্রতিক কাজে পাওয়া যাচ্ছে না তা নয়, কিন্তু রচনাভঙ্গীর নীরসতায় এই সব গবেষণামূলক গ্রন্থের অধিকাংশই সুখপাঠ্য হয়ে উঠতে পারে নি। ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের পর্যাপ্ত অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও বলব, সমগ্র বনানীর সৌন্দর্যকে স্ব-রচনায় বিভাসিত ক'রে তোলাই সার্থক ঐতিহাসিকের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যের প্রতি ভারতীয় ইতিহাসকর্মীর দৃষ্টি ফিরুক, আমার ইতিহাসব্রতী চিত্তের এই কামনা।

প্রাচীন ভারতের সন্ধানে, জেমস প্রিন্সেপ

১৫ জানুআরি ১৭৮৪ সাল; উইলিআম জোন্সের নেতৃত্বে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলো। উদ্দেশ্য, এশিয়ার ইতিহাস, পুরাকীর্তি, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান। সোসাইটির সংস্থাপনে জোনসকে সক্রিয় সাহায্য করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদীরূপে নিন্দিত তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওআরেন হেস্টিংস।[১] জোন্স এবং তাঁর সহাধ্যায়ীরা বিপুল উৎসাহে ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের পুরাবৃত্ত গবেষণায় মগ্ন হলেন। ১৭৮৮ সালে *Asiatick Researches* বেরোল সোসাইটির মুখপত্র রূপে, পুরাবিদ্ প্রাজ্ঞদের রচনার ঐশ্বর্যে মুখপত্রটি ক্রমেই বিদ্বজ্জনদের অবশ্যপাঠ্য হয়ে দাঁড়াল। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটিতে মিউজিয়াম স্থাপিত হলো, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুরাবস্তু

১ ডক্টর স্যামুয়েল জনসন ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে মার্চ, ওআরেন হেস্টিংসকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে তিনি হেস্টিংসকে বিজিত দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে উৎসাহিত করেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত তাঁর এই চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ নিচে উদ্ধৃত হলো·

...I can only wish for information, and hope that a mind comprehensive like yours will find leisure amidst the cares of your important station to enquire into many subjects of which the European world either think not at all, or thinks with deficient intelligence and uncertain conjecture. I shall hope that he who once intended to increase the learning of his country by the introduction of the Persian language, will examine nicely the tradition and histories of the East, that he will survey the remains of its ancient edifices, and trace the vestiges of its ruined cities; and that at his return we shall know the arts and opinions of a race of men from whom very little has been hitherto derived.

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত, Additional manuscripts no. 29196. ন্যাশনাল আর্কাইভসের সৌজন্যে; ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মুখপত্র *Ancient India*-র নবম খণ্ডের (১৯৫৩) ১নং প্লেট দ্রষ্টব্য।

এসে স্থান পেতে লাগল এই সংগ্রহশালায়। তিন দশকের মধ্যে ভারত-বিদ্যা তথা প্রাচীতত্ত্ব যেন শক্ত জমির উপর দাঁড়াবার সুযোগ পেল।

এই তিন দশকের গবেষণা প্রধানত পূর্বজদের সাহিত্যকীর্তিকে কেন্দ্র করেই চলেছে। অর্থাৎ প্রাচীন সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও অনুবাদ ছাড়া অন্যবিধ পুরাবস্তু-সংক্রান্ত অধ্যয়নের কথা জোনস ও তাঁর সহকর্মীরা বিশেষ ভাবেন নি। জোন্স স্বয়ং 'শকুন্তলা', 'গীতগোবিন্দ' এবং 'মনুস্মৃতি'র অনুবাদ করেন, প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৭৮৯, ১৭৯৩ ও ১৭৯৪। জোন্সের সঙ্গেই উল্লেখনীয় 'ভগবদ্গীতা'র অনুবাদক চার্লস উইলকিন্স, পাশ্চাত্ত্য লেখকদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম একটি ইউরোপীয় ভাষাতে সংস্কৃত গ্রন্থ রূপান্তরণের কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন; ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ভগবদ্গীতা'র ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে উইলকিন্স পাশ্চাত্ত্য জগতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। জোন্স, উইলকিন্স প্রমুখ ভারতবিদ্দের সাহিত্যগত গবেষণা নিঃসন্দেহেই প্রশংসনীয় ও স্মরণযোগ্য, কিন্তু সাহিত্যের মতো লেখ, মুদ্রা এবং স্থাপত্য—ভাস্কর্যাদি শিল্পকীর্তির সন্ধান, উদ্ধার ও অধ্যয়নও যে সমান গুরুত্বপূর্ণ এ চিন্তা তখনও ভারতসন্ধীদের বিশেষ নাড়া দেয় নি। প্রাচীন লেখ, মুদ্রা ইত্যাদি তাঁদের চোখে পড়ে নি তা নয়, এলোরা, তাজমহল তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি তা নয়, কিন্তু ঐসব প্রত্যক্ষ বাস্তব প্রত্ন উপাদানের গুরুত্ব নিয়ে তাঁরা বিশেষ ভাবেন নি। এলোরা, কানহেরি, তাজমহল প্রভৃতি স্থাপত্য-কীর্তিগুলির বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বিশেষ অনুভব করেন নি, ফলে গত শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে এইসব শিল্পনিদর্শনের মাপজোখের হিসাব বিরল, নক্সা তো নেই-ই। এবং এই কারণেই আলেকজাণ্ডার কানিংহামের মতো সার্থক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ আঠারো-উনিশ শতকের ভারতবিদ্দের 'সীমা-সংকীর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক'রূপে বর্ণনা করেছেন।

অথচ সাহিত্য-বিধৃত উপাদানের চাইতে অধিকতর নির্ভরযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান—লেখ, মুদ্রা, শিল্পকীর্তিতে যার প্রমাণ বিস্তৃত ও বিবৃত। এইসব প্রত্ন উপাদানের নিয়মায়ত সমীক্ষা ও অধ্যয়নের জন্য ভারতবিদ্যায় উৎসাহীদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তাঁদের সে অপেক্ষা দীর্ঘতর হতো, কিন্তু তা হতে দেন নি জেমস প্রিন্সেপ। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকেই তাঁর দীপ্ত আবির্ভাবে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বচর্চার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো। অশোক-লিপির পাঠোদ্ধারকারী জেমস প্রিন্সেপের 'ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের জনক'রূপে স্বীকৃতি অযথার্থ নয়।

॥ দুই ॥

১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ২০ অগস্ট জেমস প্রিন্সেপ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জন প্রিন্সেপ ছিলেন লণ্ডনের অল্ডারম্যান। লর্ড সিডমাউথ এবং উইলিআম পিটএর আমলে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্যও ছিলেন। তিনি কিছুদিন ভারতবর্ষে ছিলেন এবং শোনা যায় ভারতবর্ষ, ইটালি ও ইংল্যাণ্ডে ব্যবসা-বাণিজ্য করে যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেছিলেন।

স্কুল-কলেজের প্রথাগত শিক্ষা পান নি প্রিন্সেপ, মাত্র দু বছর তিনি স্কুলে পড়েছিলেন ; পরিবর্তে স্থাপত্য, রসায়নশাস্ত্র, মুদ্রাবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার সৌভাগ্য ঘটেছিল। চিত্রকলা এবং সংগীতেও তাঁর প্রবণতা ছিল। জিজ্ঞাসা, পর্যবেক্ষণশক্তি এবং অধীত বিষয়ের সহজ ও দ্রুত আত্তীকরণক্ষমতার মতো মনীষার মূল লক্ষণগুলি অল্প বয়সেই তাঁর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যান্ত্রিক কলাকুশলতাও প্রিন্সেপের কম ছিল না।* তাঁর উদ্ভাবনী ক্ষমতা ছিল প্রায় অসাধারণ। শোনা যায়, ছোটবেলায় তিনি ৬ ইঞ্চি মাপের একটি চমকপ্রদ গাড়ির মডেল তৈরি করেছিলেন। গাড়িটিতে স্প্রিং, ল্যাম্প, দরজা-জানালা, ওঠা নামার সিঁড়ি ইত্যাদি সবই ছিল এবং ঐ দরজা-জানালাগুলি খোলা বা বন্ধ করা যেত। পরবর্তী কালে কলকাতার টাঁকশালে কাজ করার সময় তিনি স্বহস্তে এমন একটি নিক্তি তৈরি করেছিলেন, যার দ্বারা এক গ্রেনের তিন হাজার ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত নির্ধারণ করা যেত। বলা বাহুল্য, সরকার এটি তাঁর কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন।

জেমস প্রিন্সেপ লণ্ডনের রাজকীয় টাঁকশালার অ্যাসে মাস্টার শ্রীযুক্ত বিঙ্গলের কাছে কিছুদিন শিক্ষানবিশী করেছিলেন। বিঙ্গলের সার্টিফিকেট সঙ্গে নিয়ে তিনি ভারতবর্ষের পথে পাড়ি দিতে মনস্থ করলেন। ১৮১৯ সালে মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে ছোট ভাই টমাসের সঙ্গে তিনি এ দেশে এলেন। সে সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষ ছিলেন প্যাটার্সন, তিনিই প্রিন্সেপকে কলকাতা টাঁকশালার সহকারী অ্যাসে মাস্টারের চাকুরি দিয়ে আনিয়েছিলেন। অশোক-লিপির পাঠোদ্ধারে প্রিন্সেপের এই চাকুরি বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। কেন সে কথা বলছি।

যে সময় কলকাতা টাঁকশালার অ্যাসে মাস্টার ছিলেন স্বনামপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত হোরেস হেম্যান উইলসন।[১] উইলসনের সংস্পর্শে আসার

১ ডক্টর হোরেস হেমান উইলসন (১৭৮৬-১৮৬০). মেঘদূত (১৮১৩) বিষ্ণুপুরাণ (১৮৪০) এবং ঋগ্বেদ (১৮৫০-৬০, ছখণ্ডে সম্পূর্ণ)-এর সটীক অনুবাদ

ফলে জেমস প্রিন্সেপের মনে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসার উদ্বোধন ঘটে। উইলসনের মাধ্যমেই এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে তাঁর সংযোগ সাধিত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটিতে তখন প্রাচীন ভারতের তথা সারা প্রাচ্য দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যে নানামুখী গবেষণা চলছিল, জেমস প্রিন্সেপ তাতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে অগ্রণী হলেন।

যাই হোক, প্রিন্সেপের কাজে যোগদান করার কিছুদিন পর উইলসনকে বেনারসের টাঁকশালার পুনর্গঠনের জন্য বেনারস যেতে হলো। তাঁর অনুপস্থিতিতে অ্যাসে সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করতেন প্রিন্সেপ, অল্পদিনে তিনি এমনই আস্থা অর্জন করেছিলেন উইলসনের। তারপর উইলসন ফিরে এলেন কলকাতায়, প্রিন্সেপ গেলেন বেনারসে, একেবারে সেখানকার টাঁকশালার অ্যাসে মাস্টার তথা অধ্যক্ষ হয়ে (অক্টোবর, ১৮২০)। জল-পথে গেলেন প্রিন্সেপ, যাওয়ার সময় জাহাজে বসে ছবি আঁকলেন বেশ কিছু। পুরনো ঘিঞ্জি শহর বেনারসও চিত্রশিল্পী জেমস প্রিন্সেপের দৃষ্টিতে ধরা পড়লো; 'ভিয়ুজ অ্যাণ্ড ইলাস্ট্রেশানস অফ বেনারস' গ্রন্থে সেকালের বেনারসের পথঘাট, বাড়িঘর ও নৈসর্গিক দৃশ্যাবলির অনেক ছবি সংকলিত হয়েছে।

১৮৩০ সালে বেনারসের টাঁকশাল উঠে গেল, প্রিন্সেপ ফিরে এলেন কলকাতায়, পুরনো উপরওয়ালা ডক্টর উইলসনের অধীনে উন্নততর ডেপুটি অ্যাসে মাস্টারের পদে যোগ দিলেন। এই সময় থেকেই ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সম্পর্কে প্রিন্সেপের জিজ্ঞাসা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং উইলসনের মাধ্যমে এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে সংযুক্ত হবার পর থেকে তিনি সরকারী কর্মজীবনের বাইরে অধিকাংশ সময় ভারততত্ত্ব-চর্চায় অতিবাহিত করতে লাগলেন।[১] এইজন্যই বলেছি, ডক্টর উইলসনের

প্রকাশ করেছিলেন। তিনি মেকলে এবং রামমোহন রায়কে বিরোধিতা করে বলেছিলেন, ভারতবর্ষে ইংরেজীর পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হওয়া উচিত। টাঁকশালার চাকরি ছেড়ে দিয়ে উইলসন পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের 'বোডেন অধ্যাপক'-এর পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন।

১ ১৮৩২ সাল থেকে প্রিন্সেপ 'জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি'র দায়িত্ব নেন। এই সময় থেকে ১৮৩৮ পর্যন্ত এই মুখপত্রে প্রিন্সেপের অনেক রচনা প্রকাশিত হয়। নিচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনার তালিকা দেওয়া হলো। ১-১৬ সংখ্যক রচনাগুলি *Essays on Indian Antiquities* (ed. by E. Thomas, 2 vols., London, 1858) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

সঙ্গে যেমন প্রিন্সেপের সংযোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, টাঁকশালার অ্যাসে দপ্তরের কর্মচারীর 'ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের জনক'-রূপে নন্দিত হওয়ার মূলে ডক্টর উইলসনের এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সাহায্য ও অনুপ্রেরণা অবিস্মরণীয়।

---

1 On the ancient Roman coins in the Cabinet of the Asiatic Society.

2 On the Greek coins in the Cabinet of the Asiatic Society.

3 Notes on Lieutenant Burnes' coins, Syrian coins, Bactrian coins, Sassanian coins (cont).

4 Bactrian and Indo-Scythic coins (cont).

5 Discovery of a subterranean town near Behat in the Doab of the Jamna and Ganges.

6 Coins and relics discovered by M. Ventura in the Tope of Manikyala.

7 On the coins and relics discovered by General Ventura.

8 Further information on the Tope of Manikyala.

9 Further notes on Bactrian and Indo-Scythic coins.

10 On the connection of various ancient Hindu coins with the Grecian or Indo-Scythic series.

11 Notices of ancient Hindu coins.

12 New varieties of Bactrian coins.

13 New varieties of Mithraic or Indo-Scythic series of coins and their imitations.

14 New types of Bactrian and Indo-Scythic coins.

15 Specimens of Hindu coins descended from the Parthian type.

16 Legends of the Saurastra group of coins deciphered.

17 Inscription on the Iron Pillar at Delhi, *Journal of the Asiatic Society of Bengal* (henceforth *JASB*) 1834, Vol. III.

18 Various ancient inscriptions, *JASB*, 1836, Vol. V.

19 Various ancient inscriptions, *JASB*, 1837, Vol. VI.

20 Note on the facsimiles of inscriptions from Sanchi near Bhilsa, *Ibid.*

21 Interpretation of the most ancient of the inscriptions on the pillar called the Lat of Feroz Shah, near Delhi, *Ibid.*

22 Note on an inscription at Udaygiri and Khandagiri, Cuttack, *Ibid.*

23 Discovery of the name of Antiochus the Great in the edicts of Asoka, King of India, *JASB*, 1838, Vol. VII.

24 On the edicts of Piyadasi or Asoka, the Buddhist monarch of India, preserved in the Girnar Rock in the Gujerat Peninsula and on the Dhauli rock in Cuttack, with the discovery of Ptolemy's name therein, *Ibid.*

25 Notice of antiquities discovered in the Eastern Division of Gorakhpur, *Ibid.*

26 Inscription on Jain images from Central India, *Ibid.*

১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে ডক্টর উইলসন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হবার পর জেমস প্রিন্সেপ টাঁকশালার অ্যাসে মাস্টারের পদে উন্নীত হন এবং মিণ্ট কমিটির সেক্রেটারি হিসাবেও তাঁকে কাজ করতে বলা হয়। তাঁর উদ্যম ও কর্মক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাঁকে কমিটি অফ এডুকেশানের সদস্য মনোনীত করেন এবং শিক্ষা-উপদেষ্টা হিসাবে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেন। এ সময় প্রিন্সেপ এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারি পদেও নির্বাচিত হন। বস্তুত ১৮৩২ থেকে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত সময় জেমস প্রিন্সেপের কর্মবহুল জীবনের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। প্রিন্সেপের সারস্বত সাধনার সূত্রপাত ও সিদ্ধিতে দীপ্যমান এই কালসীমা ভারতবৃত্ত–চর্চার ইতিহাসেও অবিস্মরণীয়।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে জেমস প্রিন্সেপ মৃত্যুবরণ করেন।

॥ তিন ॥

প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক হিসাবে জেমস প্রিন্সেপের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব অশোক-লেখর পাঠোদ্ধার। ১৮৩৪ থেকে ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তাঁর এই পাঠোদ্ধারের ইতিহাস বিধৃত।[১] শোনা যায়, ন্যূনাধিক এই চার বছরে প্রায় প্রতিদিন সকালে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত পুরনো শিলালেখগুলির ছাপ (এস্টেম্পেজ) সামনে খুলে বসে থাকতেন, নিবিষ্ট মনে অপলক চোখে চেয়ে থাকতেন ছাপের অচেনা অক্ষরগুলির দিকে। প্রাচীন এই অক্ষরগুলি যে- হরফে বা লিপিতে লেখা তার নাম 'ব্রাহ্মী'।

অবশেষে একদিন সাঁচী (বর্তমান মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত) অঞ্চলের বিখ্যাত বৌদ্ধস্তূপের ছোট ছোট নিবেদন-লেখগুলির (ভোটিভ রেকর্ড) ছাপ পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন, নিবেদন-লেখগুলি[২] একই চেহারার দু'টি অক্ষর দিয়ে শেষ হচ্ছে। তখন তিনি অনুমান করলেন, এগুলি

১ প্রিন্সেপের নিজের ভাষায় বিবৃত এই আবিষ্কারের ইতিহাসের জন্য *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. VI, pp. 460-77, 566-609 দ্রষ্টব্য।

২ সেকালে বৌদ্ধ পুণ্যার্থীরা তীর্থস্থানগুলিতে মূল স্তূপের আকৃতিতে ছোট ছোট স্তূপ উৎসর্গ করতেন। এইগুলিকে 'ভোটিব' বা নিবেদন-স্তূপ বলা হয়। বেশির ভাগ স্তূপে দাতার নাম থাকত।

স্বয়ংসম্পূর্ণ বড় কোন লেখার অংশ নয়; এগুলি হয় কোন মৃত্যু-সংবাদ, নয়তো কোন ভক্ত বা সাধকের দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদনাত্মক বিজ্ঞপ্তি। অর্থাৎ কোন ভক্ত দেবোদ্দেশে তাঁর ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদনের সূত্রে পাথরে তাঁর নাম খোদাই করে গেছেন। যাই হোক, ভেবেচিন্তে শেষের অনুমানটিই তিনি গ্রহণ করলেন; লেখগুলি নিবেদনাত্মক বিজ্ঞপ্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

নিবেদন-লেখগুলিতে আরও একটি ব্রাহ্মী অক্ষরের নিত্য উপস্থিতি বিদেশী পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দিন দুই আগে সৌরাষ্ট্রে (বর্তমান গুজরাতে) প্রাপ্ত মুদ্রায় উৎকীর্ণ অক্ষরটি তিনি 'স' বলে প্রতিপন্ন করেছেন। এই 'স' আর কিছুই নয়, ব্যক্তিবিশেষের নামের সঙ্গে যুক্ত ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন পালি-প্রাকৃতের 'স'—সংস্কৃতের 'স্য' অর্থাৎ অমুক-'স' (পালি-প্রাকৃতে) অমুক-'স্য' (সংস্কৃতে)।

প্রিন্সেপ আরও লক্ষ করলেন, উপরি-উক্ত একই ধরনের অক্ষর দু'টির প্রত্যেকটির মাঝে ও শেষে একটি করে চিহ্ন আছে। চিহ্ন দুটি কী হতে পারে? বিদেশী গবেষক ভারতীয় পণ্ডিত-বন্ধু রত্নপালের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করলেন, লেখগুলি যখন নিবেদনাত্মক, তখন চিহ্নসহ অক্ষর দু'টির পাঠ হবে 'দানং' (অক্ষর দুটি 'দ' ও 'ন' এবং চিহ্ন দু'টির একটি আকার ও অপরটি অনুস্বার) এবং অপর অক্ষরটি 'স' অর্থাৎ '....স দানং', মানে 'স'-এর আগে ভক্তের নাম, অমুক-'স দানং'।

নিবেদন-লেখ ছাড়া সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের প্রাচীন মুদ্রায় উৎকীর্ণ লেখাবলিও তিনি পরীক্ষা করলেন। জে. আর. স্টুয়ার্ট-এর পাঠানো ২৮টি মুদ্রার ছাপ[১] থেকে তিনি যে দু'টি লেখর পাঠোদ্ধার করেছিলেন, ১৮৩৭-এর

১ 11th May 1837.—"Here are two plates addressed to me by Harkness on the part of J. R. Steuart, quarto engravings of 28 Saurashtra coins, all Chaitya reverses, and very legible inscriptions, which are done in large on the next plate. Oh! but we must decipher them! I'll warrant they have not touched them at home yet. Here to amuse you try your hand on this" (here follows a copy of three of the coin legends, with the letters forming the words *Rajnah* and *Kshatrapasa*, each of which occurs twice, marked, respectively, 1, 2, 3, 4, 5, 6, shewing that he had begun to analyze them the same day).

১২ মে তারিখে আলেকজাণ্ডার কানিংহামকে লেখা চিঠিতে[১] উদ্ধৃত সে লেখা দুটি হলো :

রজ কৃত্তমস রুদ্রসহস স্বামি জহতমপুত্রস

রজ কৃত্তমস্য সগদংত রজ রুদ্রসহস পুত্রস্য

সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বলছেন, 'মুদ্রাগুলির প্রত্যেকটিতে মুদ্রা-প্রবর্তকের পিতার নাম বিদ্যমান এবং এইভাবে আমরা আট কিংবা দশ জন রাজার নাম পাচ্ছি, যাঁরা গুপ্ত-সম্রাটদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।' চিঠিতে তাঁর পাঠ ছাপাবার ব্যগ্রতাও দেখা যাচ্ছে। কয়েকদিন আগে অন্য একটি মুদ্রায় 'বিজয়মিতস' অর্থাৎ 'বিজয়মিত্রস্য' লেখর পাঠোদ্ধারে তাঁর সাফল্যের কথাও জানাচ্ছেন। দু দিন বাদে লেখা ১৪ মে-র একটি চিঠিতে[২] তিনি জানাচ্ছেন, 'রুদ্রসহ'-র পিতার নাম 'জনদম' ('জহতম'

১ 12th May, 7 o'clock, a. m.—"You may save yourself any further trouble. I have made them all out this very moment on first inspection. Take a few examples (here follow both the original legends and the Nagari renderings).

1 to 4—*Raja Krittamasa Rudra Sahasa Swāmi Jahatama putrasa.*

5 to 8—*Raja Krittamasya Sagadamta Raja Rudra Sahasa putrasya.*

And thus every one of them gives the name of his father of blessed memory, and we have a train of some eight or ten names to rival the Guptas ! ! Hurra ! I hope the chaps at home wont seize the prize first. No fear of Wilson at any rate ! I must make out a place of the names on ours added to Steuart's, and give it immediate insertion. It is marvellously curious that, like the modern Sindhi and Multani, all the mātrās, or vowels, are omitted, and the Sanskrit terminations *sya*, etc., Pali or vernacularized. This confirms the reading which I had printed only a day or two ago, *Vijaya Mitasa* for *Mitrasya*, of Mithra, identifying him and the devise with our OKPO bull coin ! Bravo, we shall unravel it yet."

Here we see that, although he had mastered the greater part of these legends almost at first sight, yet the readings of some of the names were still doubtful. But two days later he writes as follows :

২ Sunday (postmark, May 14, 1837).—"Look into your cabinet and see what names you have of the Saurashtra series. Steuart's list is as follows :

যা আগে পড়েছিলেন তা নয়); তাছাড়া 'অত্রিদাম্নঃ', 'বীরদাম্নঃ', 'বিশ্বসহস্য' প্রভৃতি নামগুলির প্রত্যেকটি ষষ্ঠী বিভক্তিচিহ্নযুক্ত অর্থাৎ মূল নামগুলি যথাক্রমে 'অত্রিদাম', 'বীরদাম', 'বিশ্বসহ' ইত্যাদি, 'পুত্রস্য'-এর সঙ্গে যুক্ত হলে মূল নামগুলির ষষ্ঠী বিভক্তিচিহ্ন অবলুপ্ত হয়। তারপর আর-একটি মুদ্রালেখর পাঠোদ্ধার করলেন, এ মুদ্রাও সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের:

শ্রীবমসগ দেব জয়তি—ক্রমদিত্য পরমেশ

এই পাঠোদ্ধারে উৎফুল্ল প্রিন্সেপ তাঁর আনন্দকে যেন ধরে রাখতে পারছেন না। কানিংহামকে চিঠির শেষে লিখছেন: 'চলো ভাই, জলদি পৌহঁছোগে।'[১]

Rajas Rudra Sah, son of Swami Janadama.'
,, *Atra Dama* ,, Rudra Sah. etc., etc.

"The Sanskrit on these coins is beautiful, being in the genitive case after the fashion. We have *Rājña* for *Raja*, *Atri-Dāmnaḥ* for *Atri-Dāma*, *Vira-Dāmnaḥ* for *Vira-Dāma*, *Viswa Sahasya* for *Viswa Saha*, which are all confirmed by the real name losing the genitive affix when joined to *Putrasya*.

"I have made progress in reading the Peacock Saurashtrans—

Sri bama saga deva jayati

——————*kramaditya, parameśa*

"Chulao bhai, juldee puhonchoge !"

এই চিঠিগুলি সম্পর্কে কানিংহামের মন্তব্য (*Archaeological Survey of India*, Reports, ed., A. Cunningham, vol. I, p. x.):

In these lively letters we see that the whole process of discovery occupied only three days, from the first receipt of Steuart's plates to the complete reading of all the legends. Nothing can better show the enthusiastic ardour and unwearying perseverance with which he followed up this new pursuit than these interesting records of the daily progress of his discoveries. When I recollect that I was then only a young lad of twenty-three years age, I feel as much wonder as pride that James Prinsep should have thought me worthy of being made the confidant of all the great discoveries.

১ পরবর্তী কালে আরও অধিক সংখ্যক মুদ্রার আবিষ্কারের ফলে প্রিন্সেপ পঠিত নামগুলি ও প্রাসঙ্গিক মুদ্রালেখগুলির পাঠ অল্পবিস্তর সংশোধিত হয়েছে। এই সংশোধন-কার্যে র‍্যাপসন-এর কৃতিত্ব সর্বাধিক। যেমন, 'রুদ্রসহ' হবে 'রুদ্রসীহ', 'জনদম' হবে 'রুদ্রদাম', 'অত্রিদাম্নঃ' হবে 'ভর্তৃদাম্নঃ', 'বিশ্বসহস্য' হবে 'বিশ্বসীহস' ইত্যাদি। 'কৃত্তমস' শব্দের সঠিক পাঠ 'ক্ষত্রপস'।

লক্ষ্যাভিমুখে জলদিই পৌঁছেছিলেন প্রিন্সেপ, অশোক-লেখর প্রায় সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করতে তাঁর বেশি সময় লাগেনি। যে সমস্ত অক্ষর তিনি পাঠ করেছিলেন, তাদের পাঠমান আরোপ করে তিনি দিল্লীর অশোক-লেখ পড়ে ফেললেন। তিনি আরও লক্ষ করলেন, দিল্লীর অশোক-লেখর অক্ষর এলাহাবাদ, ধৌলি (উড়িষ্যা) এবং গিরনারের (কাথিয়াওয়াড়) অশোক-লেখর অক্ষরের সঙ্গে অভিন্নপ্রায়।[1] কিছুদিনের মধ্যে তিনি গিরনারস্থ অশোক-লেখর পাঠোদ্ধার করলেন। এন্টিওকাস, টলেমি, মেগাস এবং অ্যান্টিগোনাস—এই চারজন বিদেশী রাজার (এঁদের সঙ্গে অশোক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন) নাম তিনি ঐ প্রস্তর-লেখতে আবিষ্কার করলেন। পরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের শাহবাজগঢ়হি ও মানসেরাতে আবিষ্কৃত খরোষ্ঠী হরফে (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত) লেখা অশোক-লেখ থেকে 'অলিক-সুদর' এবং কালসিতে (দেরাদুন অঞ্চলে) আবিষ্কৃত ব্রাহ্মী লেখ থেকে 'অলিক্যসুদর' অর্থাৎ আলেকজাণ্ডার নামে পঞ্চম রাজার নাম জানা গেছে।

শুধু ব্রাহ্মী লিপি নয়, খরোষ্ঠী লিপির (এই লিপি দক্ষিণ থেকে বামে প্রবহমান) পাঠোদ্ধারেও প্রিন্সেপের দান স্মরণীয়রকমের অসামান্য। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে কিছু গ্রীক বা যবন রাজা আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তাঁদের মুদ্রাগুলির একপিঠে গ্রীক, অন্যদিকে আঞ্চলিক লিপি খরোষ্ঠীতে একই অর্থবহ লেখ উৎকীর্ণ হতো। প্রিন্সেপ গ্রীক জানতেন, সুতরাং গ্রীক লেখর প্রাকৃত অনুবাদের লিপি খরোষ্ঠীর পাঠোদ্ধার তাঁর পক্ষে দুরূহ হবে না মনে করে তিনি মুদ্রালেখগুলিতে মনঃসংযোগ করলেন। তাঁর এ কাজে সহায়ক হয়েছিল পূর্বাচার্য ম্যাসন-এর প্রয়াস, কারণ ম্যাসন-ই প্রথম 'মিনন্দ্র' (অর্থাৎ মিনাণ্ডার), 'অপলদত' (অর্থাৎ অ্যাপোলোডোটস), 'এরমেও' (অর্থাৎ হারমিউস), 'ব্যাসিলেওস' (অর্থাৎ মহারাজা) এবং 'সোটেরস্' অর্থাৎ 'ত্রতর' (অর্থাৎ 'ততরস') প্রভৃতি শব্দগুলি পড়েছিলেন।[১] প্রিন্সেপ সবশুদ্ধ ১২ জন গ্রীক রাজার নাম এবং ৬টি উপাধি উদ্ধার করেছিলেন। প্রিন্সেপ মোট ৩৩টি খরোষ্ঠী ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ১৬টি অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক বর্ণ এবং ৫টি স্বরবর্ণের (অ ই উ এ ও) ও ৪টি ই-উ-কারাদি মাত্রার মধ্যে ৩টি স্বরবর্ণ ও ২টি ই-কারাদি মাত্রা আবিষ্কার

১ *JASB*, 1835, p. 329.

করেছিলেন। আকস্মিকভাবে অসুস্থ না হলে হয়তো তিনি প্রায় সব ক'টি খরোষ্ঠী অক্ষরই পড়ে ফেলতে পারতেন। তাঁর আরব্ধ ও অসমাপ্ত কাজ তাঁর উত্তরসূরিরা শেষ করেন।

বস্তুত, বিশ্বের স্মরণীয় ও মহান সম্রাটদের অন্যতম অশোক সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না, যদি না ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত তাঁর লেখগুলির পাঠোদ্ধার হতো। মৌর্য যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় অশোক-লেখর অসাধারণ মূল্য নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পশ্চিম এশিয়ার পাঁচজন রাজার সঙ্গে অশোক বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন, তাঁদের রাজ্যে শান্তি ও মৈত্রীর দূত পাঠিয়েছিলেন, এই গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক তথ্য কী জানা যেত, যদি না অশোক-লেখ পড়া হতো?

আলোচ্য লেখমালায় বর্ণিত 'দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী'ই যে সম্রাট অশোক এবং এই সম্রাট পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক বা যবনরাজ দ্বিতীয় অ্যান্টিআোকাস থিওস (২৬১—৪৬ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ) ও মিশরের দ্বিতীয় টলেমি ফিলাডেলফোস (২৮৫—৪৭ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ)-এর সমসাময়িক—এই দুই তথ্য নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন করে প্রিন্সেপ ভারতের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বকে শক্ত জমির উপর স্থাপন করেছেন। তাঁর এই কীর্তি স্মরণীয় ও সুবিদিত। কিন্তু এ ছাড়া আরও একটি ক্ষেত্রে প্রিন্সেপের ভূমিকা পথিকৃতের, যে-ভূমিকা অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত: জেমস প্রিন্সেপ সরেজমিন তদন্ত এবং প্রত্নস্থল ও প্রত্নদ্রব্যের পর্যবেক্ষণভিত্তিক নক্শা প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন; এবং শুধু কথাতেই ক্ষান্ত থাকেন নি, স্বয়ং তা কাজে সপ্রমাণ করেছিলেন।

॥ চার ॥

প্রাচীন ভারতীয় লেখ, মুদ্রা ইত্যাদি বিষয় ছাড়া ফসিল-প্রাণীর নিদর্শন সম্পর্কেও প্রিন্সেপ বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ডক্টর হিউ ফ্যাকোনার এবং পি. টি. কটলি নামে দুজন বিজ্ঞানী উত্তর ভারতে বহু প্রাচীন ফসিল-প্রাণীর নিদর্শন আবিষ্কার করেছিলেন। প্রিন্সেপ এই ফসিলগুলি সম্পর্কে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে কয়েকটি আকর্ষণীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব এবং ফসিল-প্রাণিবিদ্যা ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও জেমস প্রিন্সেপ মনঃসংযোগ করেছিলেন। জীবনের প্রারম্ভে তাঁর অধ্যয়নের বিষয় ছিল স্থাপত্য। তারপর ভারতবর্ষে

আসার আগে রসায়ন-শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করে তিনি কিছুকাল লণ্ডন টাঁকশালার অ্যাসে মাস্টারের অধীনে শিক্ষানবিশী করেছিলেন। সারা দেশে প্রচলিত মুদ্রা-মানের সংস্কার করে প্রিন্সেপ ওজন ও মাপের সমতা এনেছিলেন। প্রিন্সেপের আগে মুদ্রার ওজনে ও মাপে তারতম্য থাকত, আর সারা দেশে প্রচলিত মুদ্রা-মানে সমতাও ছিল না। প্রিন্সেপ এই সমস্ত ত্রুটি দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সর্বশেষে, জেমস প্রিন্সেপের অসাধারণ সংগঠন-ক্ষমতা ও কর্মনৈপুণ্যের উল্লেখ করতে হয়। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী থাকাকালীন প্রতিষ্ঠানটির নানাবিধ উন্নতি হয়েছিল। তাঁর সময়ে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাকক্ষ নিয়মিত অধিবেশন আলোচনা-সভা ইত্যাদিতে মুখর হয়ে থাকত। ১৮৩২ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালগুলি দেখলে বোঝা যায় কত বিভিন্ন বিষয়ে কত মূল্যবান আলোচনাই না তখন এশিয়াটিক সোসাইটিতে হয়েছিল।

জনকল্যাণমূলক অনেক কাজও প্রিন্সেপ করেছিলেন। বেনারসে থাকার সময় তিনি সেখানকার পথঘাটের অপ্রশস্ততার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর পরামর্শক্রমে সরকার পথঘাটগুলি যথাসম্ভব প্রশস্ত ও উন্নত করেন। শহরের জনস্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়; জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং সামগ্রিকভাবে শহরটিকে পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করা হয়। প্লাবনের হাত থেকে শহরকে বাঁচাবার জন্য কর্মনাশা নদীর উপর একটি উঁচু প্রস্তর-সেতু তৈরি হয়। তা ছাড়া আওরঙ্গজেবের মসজিদের ছোট ছোট বিপজ্জনক মিনারগুলির সংস্কার করা হয়। এই সময় প্রিন্সেপ বেনারসের প্রধান প্রধান রাস্তা ও বাড়িগুলির নিখুঁত নক্শা ও ছবি এঁকেছিলেন, যেগুলি তাঁর পূর্বোল্লিখিত 'ভিয়ুজ অ্যাণ্ড ইলাস্ট্রেশানস অফ বেনারস' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তা ছাড়া আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে যখন লোকগণনার আধুনিক পদ্ধতি জানা ছিল না, তখন প্রিন্সেপ আশ্চর্য দক্ষতায় বেনারসের লোকগণনা[১] করেছিলেন এবং নিজের কাছে চমৎকার হিসাব রেখেছিলেন। প্রত্নতত্ত্বের নিতান্ত শৈশবাবস্থায়, সন-তারিখের হিসাবে ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে, প্রিন্সেপ বেনারসের নগর-পরিকল্পনার এবং রাস্তাঘাটের ও বাড়িঘরের কয়েকটি নিখুঁত নক্শা এঁকেছিলেন। প্রসঙ্গত এ কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

---

১ এই লোকগণনার পরিচিতিমূলক নিবন্ধের জন্য ১৮৩২ সালের *JASB* দ্রষ্টব্য।

যে, ভারতীয় প্রত্নসন্ধানীদের মধ্যে প্রিন্সেপই প্রথম 'ফীল্ড আর্কিওলজি' (বা 'ক্ষেত্রীয় প্রত্নতত্ত্ব') শব্দবন্ধের প্রবর্তন করেন ;[১] পুরাতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবিষ্কারে ক্ষেত্রীয় প্রত্নতত্ত্বের ভূমিকার গুরুত্ব আজ বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। অ্যাসে মাস্টারের দায়িত্বপালনে এবং পুরনো লেখ-মালার পাঠোদ্ধারে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হওয়ার জন্য প্রিন্সেপ নিজে সরেজমিন অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রত্নস্থল ও প্রত্নবস্তুর আবিষ্কারে মুখ্য অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি, কিন্তু জেনারেল ভেণ্টুরা ও কোর্টের মতো সহকারী ও সহকর্মীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে ভেণ্টুরা 'ও কোর্ট পশ্চিম পাঞ্জাবের মানিকিয়ালায় এবং ১৮৩৩ ও ১৮৩৪ সালে অন্যান্যরা সিন্ধু-বিতস্তা অঞ্চলে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যনিদর্শন এবং মুদ্রা ও লেখমালা আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার বহু মূল্যবান উপাদান সংগ্রহ করেন। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে কুষাণজাতির রাজাদের আধিপত্য এইসব আবিষ্কারে সপ্রমাণ হয়। গবেষণার সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য সরেজমিন অনুসন্ধানের সঙ্গে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর পরিশ্রমী ও নিবিড় অধ্যয়নের সনিষ্ঠ সমন্বয় যে কতখানি গুরুত্ব-পূর্ণ প্রিন্সেপ সে দিকে তাঁর সহকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তবে একালে সরেজমিন প্রত্নসন্ধানী বলতে যা বোঝায় প্রিন্সেপ ও তাঁর সহকর্মীরা তা ছিলেন না, হওয়া সম্ভবও ছিল না। সরেজমিন অনু-সন্ধানের মাধ্যমে একটি সভ্যতার উৎস ও গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের প্রয়াসের চাইতে মিউজিয়ামের বৈভববৃদ্ধির দিকেই তাঁদের অধিকতর আকর্ষণ ছিল।

॥ পাঁচ ॥

আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে জেমস প্রিন্সেপ হয়তো অনেক কিছুই করতে পারেন নি, কিন্তু তিনি যা পেয়েছিলেন গুণগত বিচারে তার মূল্য অসাধারণ। কানিংহামের সাক্ষ্য থেকে জানতে পারি, প্রিন্সেপ দৈনিক প্রায় বারো থেকে ষোল ঘণ্টার মতো খাটতেন। এবং তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের কথা স্মরণে রাখলে পরিমাণগত বিচারেও তাঁর গবেষণা বিস্ময়কর। জন্মসূত্রে বিদেশী হয়েও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং যথার্থ মনীষীর মতো এ দেশের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অশোক-লেখর পাঠোদ্ধারের মাধ্যমে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসের দ্বারোদ্ঘাটন করেন,

১ *Archaeological Survey of India*, Reports, Vol. I, p. 19.

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বকে সন-তারিখের শক্ত জমিনের উপর দাঁড়াতে সাহায্য করেন। ফীল্ড আর্কিওলজি বা ক্ষেত্রীয় প্রত্নতত্ত্বের একালীন সংজ্ঞা ও প্রয়োগপদ্ধতি তাঁর জানা ছিল না সত্য, কিন্তু ফীল্ড আর্কিওলজির যা ভিত্তি সেই সরেজমিন অনুসন্ধানের মাধ্যমে সভ্যতার বাস্তব নিদর্শন সংগ্রহ সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা প্রশংসার দাবি রাখে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, জেমস ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র, কর্মজীবনে টাঁকশালার অ্যাসে মাস্টার, এবং কৈশোরে অর্জিত স্থাপত্যবিদ্যার জ্ঞান পরবর্তী জীবনে বিস্মৃত হন নি। অর্থাৎ মৌলত বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন বলে তাঁর প্রত্নতত্ত্বগত গবেষণাপদ্ধতি ছিল বৈজ্ঞানিক। বিনা তথ্যে কোন কিছু প্রমাণের চেষ্টা বা নিছক অনুমানের উপর নির্ভরশীল কোন রকম মন্তব্য প্রকাশের প্রয়াস তাঁর রচনাবলিতে দুর্লভ। বরং তিনি তাঁর সহকর্মীদের বারবার বলতেন : যেমন দেখবে তেমন লিখবে; তোমার উপাদান যা বলছে তুমি তাকেই বিশ্বাস্যভাবে উপস্থিত করবে। তাঁর একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য[১] :

What the learned world demand of us in India, is to be quite certain of our data, to place the monumental record before them exactly as it now exists, and to interpret it faithfully and literally as the document says itself, 'without exaggeration and without extenuation'.

এই উক্তিতে বিজ্ঞানী প্রিন্সেপকে খুঁজে পেতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না।

॥ ছয় ॥

বিজ্ঞানমনস্ক প্রিন্সেপ নিরাবেগ ও মননসর্বস্ব ছিলেন না। মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অপার, সমবেদনা ও উপচিকীর্ষা ছিল তাঁর চরিত্রের সহজাত। বিদ্যা মানুষকে বিনয়ী করে এই প্রবাদবচনের তিনি ছিলেন জীবন্ত উদাহরণ। যে- ধরনের ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা মাঝে মাঝে

১ *JASB*, 1838, p. 227. প্রায় দু দশক পরে গভর্নর-জেনারেল লর্ড ক্যানিং-ও অনুরূপ সুরে বলেছিলেন :

What is aimed at is an accurate description, illustrated by plans, measurements, drawings or photographs and by copies of inscriptions, of such remains as most deserve notice, with the history of them so far as it may be traceable, and a record of the traditions that are preserved regarding them.

বিদ্বজ্জনকে আক্রমণ করে, প্রিন্সেপ সেই ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতায় কখনও আক্রান্ত হন নি। তাঁর চিত্তের ঔদার্য ছিল বিস্ময়কর, নিজের ত্রুটি সংশোধনে যেমন নিঃসংকোচ ছিলেন, তেমনই অন্যের সাফল্যকে নিজের বলে মনে করতে পারার মতো এক আশ্চর্য মহত্বও ছিল। তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সমসাময়িক অন্য এক পণ্ডিতের অভিমত প্রাসঙ্গিক ও নির্ভরযোগ্য বিবেচনায় উদ্ধৃত করি :[১]

He has left abundant proofs behind him to establish that he was one of the most talented and useful men that England has yet given to India. Of his intellectual character, the most prominent feature was enthusiasm—one of the prime elements of genius ; a burning, irrepressible enthusiasm, to which nothing could set bounds and which communicated itself to whatever came before him.

...To this enthusiasm was fortunately united a habitude of order and power of generalization, which enabled him to grasp and comprehend the greatest variety of details. His powers of perception were impressed with genius—they were clear, vigorous and instanteneous.

It was in the conduct of this *Journal*, that the amiable and good qualities of the man were most apparent and of most benefit to the public.

...His purse, too, was freely opened where occasion required.

...Never was there a mind more free from the paltry and mean jealousies which sometimes beset scientific men. The trimph of others seemed to give him as much pleasure as if achieved by himself...There was a charm, too, about his writings, which it is rare to meet with ; he hunted after truth, and cared not how often or how notoriously he stumbled upon error in the pursuit...He was

১ Dr Hugh Falconer, *Colonial Magazine*, December, 1840.

utterly devoid of that intolerance of being found in error and loathness to recant which often beset meaner minds.

বস্তুত, জেমস প্রিন্সেপের মতো একাধারে জ্ঞানতপস্বী, কর্মকুশল ও পরিশ্রমী সংগঠক, জনসেবক এবং সর্বোপরি মহান মানুষের এমন মূর্ত সমন্বয় বিরলদর্শন। গবেষক হিসাবে তিনি অসামান্য, বলতে গেলে তিনিই ভারতবর্ষের ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন। তাঁর সময় থেকে ভারততত্ত্ব ও ভারতীয় প্রত্নবিদ্যা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু প্রিন্সেপ চিরকালই পথিকৃৎ ভারততাত্ত্বিকের সম্মান পাবেন। ইংরেজ আমাদের কাছ থেকে নিয়েছে অনেক, কিন্তু জেমস প্রিন্সেপ এবং তাঁর সহকর্মী ও অনুবর্তীদের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে যা দিয়েছে তার পরিমাণ অল্প নয়। জেমস প্রিন্সেপের নামে কলকাতায় একটি রাস্তা ছিল, আমাদের কর্তাদের স্বদেশীয়ানার আতিশয্যে ইতিমধ্যেই তার একটি অংশের নাম-বদল ঘটেছে, হয়তো অদূর ভবিষ্যতে বাকি অংশ থেকেও তাঁর নাম মুছে যাবে। গঙ্গাতীরে এখনও একটি ঘাট টিমটিম করে তাঁর স্মৃতি বহন করছে, হয়তো একদিন সে ঘাটেরও নতুন নামকরণ হবে। কিন্তু যথার্থ শিক্ষিত ভারতবাসী কখনও জেমস প্রিন্সেপকে ভুলবেন না, প্রিন্সেপের স্মৃতির পক্ষে এইটিই সান্ত্বনার ও ভরসার কথা।

স্বদেশ সন্ধানে,
রাজেন্দ্রলাল মিত্র

ঘটনা হিসাবে বিস্ময়কর হলেও একথা সত্য প্রতীচী লেখকদের কলমেই ভারতবর্ষের ইতিহাস জন্মলাভ করে। অন্তত সমকালীন গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস আনুপূর্বিকভাবে রচনার চেষ্টার জন্য প্রতীচ্যের লেখকদের কাছে আমাদের ঋণ অনস্বীকার্য। ১৭৮৩ সালে স্যার উইলিঅম জোন্স-এর ভারত-আগমন এবং ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ভারত-ইতিহাস চর্চার ইতিহাসে দু'টি স্মরণীয় ঘটনা, কারণ ভারতবাসীর মধ্যে স্বদেশ-সন্ধিৎসার সূত্রপাতের সঙ্গে ঘটনা দু'টির যোগ ঘনিষ্ঠ। ১৭৮৮ সালে 'এশিয়ার ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে' গবেষণার ফসলবাহী 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' পত্রের আত্মপ্রকাশে এই কথাই প্রমাণিত হলো : এশিয়া তথা ভারতবর্ষেরও ইতিহাস এবং সংস্কৃতি আছে এবং তা পুরাতন বলে পর্যাপ্ত গবেষণার বিষয়ীভূত। আরও পরে বেরোল 'কোয়ার্টালি জার্নাল' (১৮২১) 'গ্লিনিংস ইন সায়েন্স' (১৮২৯) এবং 'জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি' (১৮৩২)। নতুন আবিষ্কার ও মূল্যবান ধারণা-সিদ্ধান্তে দেদীপ্যমান এই পত্রিকা ক'টি ইতিহাস-গবেষণার ক্ষেত্রকে বিস্তৃততর করল। স্যার উইলিআম জোন্স, যিনি ভারতবর্ষের উন্নত সভ্যতায় বিশ্বাসী, শুধু বিশ্বাসী নন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাচীতত্ত্ব তথা ভারতবিদ্যা-গবেষণার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। এবং সেই বনিয়াদের উপর হর্ম্য-নির্মাণের দায়িত্ব নিলেন যাঁরা তাঁরাও বিদেশী ; উইলকিন্স, উইলসন, কোল-ব্রুক, প্রিন্সেপ, কানিংহাম, ম্যাক্স ম্যুলর, ব্যুর্নুফ, মনিআর উইলিআমস— অনেক নামের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম। এই বিদেশী মনীষিবৃন্দের কাছ থেকেই ভারতবাসী শুনল তার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। শুনে উপলব্ধি করল অন্য সভ্য দেশের মতো তারও অতীত আছে। এবং হয়তো উৎসাহিত ভবিষ্যতও।

জোন্স-প্রিন্সেপ-কানিংহামের বিপরীত মেরুতে ছিলেন একশ্রেণীর প্রতীচী লেখক : জেমস মিল, উইলিআম ওঅর্ড, জন ক্লার্ক মার্শম্যান। এঁরা ছিলেন আত্ম-তুষ্ট, অহংদৃপ্ত। ভারতবর্ষের মতো একটা অসভ্য দেশকে তাঁরা সভ্য করেছেন নানাভাবে এই কথাটার প্রচারণাতেই তাঁদের সমস্ত প্রয়াস সীমাবদ্ধ ছিল।

তাদের এই উচ্চমন্য দৃষ্টিভঙ্গী, ভারতীয়দের মধ্যে বিরক্তির সঞ্চার করল এবং সেই বিরক্তির সঙ্গে অনিবার্যভাবেই স্বদেশপ্রেম উন্মীলিত হলো। ইতিমধ্যে জোন্স-উইলসন-কোলব্রুক-প্রিন্সেপ প্রমুখের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক তথ্য উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে। সেই তথ্য-উপকরণ দিয়েই মিল-মার্শম্যানদের উচ্চমন্যতাকে আঘাত দেওয়া যায়। সুতরাং মার্শম্যানের 'হিস্টরী অফ ইণ্ডিয়া' বা 'হিস্টরী অফ বেঙ্গল' জাতীয় গ্রন্থের আদর্শে স্বদেশের ইতিহাস রচনার প্রয়োজন কি? নতুনভাবে স্বাধীন-ভাবে স্বদেশের ইতিহাস রচনা করতে হবে। প্রমাণ, ১৮৫৭ সালে নীলমণি বসাক বাংলায় লেখা এ দেশের পুরাবৃত্তের অভাব দূর করার জন্য 'ভারত-বর্ষের ইতিহাস' লিখলেন। দু বছর বাদে ১৮৬০ সালে একজন কেদারনাথ দত্ত 'স্বাধীন ও সংস্কারমুক্ত কলম'-এ স্বদেশের ইতিহাস রচনার প্রয়াস পেলেন : 'ভারতবর্ষের ইতিহাস।'

সংক্ষেপে, এইভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই বাংলাদেশে একটি স্বদেশচেতন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল।[১] এই সম্প্রদায়ের অনেকেই সুগৃহীতনামা ; দু-চারজন যেমন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মধুসূদন দত্ত। এই অবিস্মরণীয়দের কর্মে কৃতিত্বে মনীষায় ভাস্বর উনিশ শতকী বাংলার ইতিহাসের পাতায় আর-একটি শ্রদ্ধার্হ নাম : রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

১ এই স্বদেশচেতনা ও ইতিহাসবোধের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর ১২৮১ বঙ্গাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ উক্তি ; 'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। ...যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি ছিল, যেখানে নৈষধচরিত-গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য, রঘুনাথশিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই।'

১৮৫৭ সালে প্রকাশিত নীলমণি বসাকের বইয়ের বিজ্ঞাপনেও এই ধরনের কথা শোনা যায় :

'এই দেশের যে পুরাবৃত্ত আছে, তাহা ইংরাজী ভাষাতে লিখিত, বাঙ্গালা ভাষাতে এই পুরাবৃত্ত প্রায় নাই। এই ভাষাতে যে দুই একখানা পুস্তক দেখা যায়, তাহা ইংরাজী হইতে ভাষান্তরিত।...এই সকল পুস্তক বালকদিগের পাঠের উপযোগী নহে, এইজন্য তাহা কোন পাঠশালাতে পঠিত হয় না, সুতরাং বালকেরা ভারতবর্ষের ভালমন্দ কিছুই জানিতে পারে না. ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক বালকের এমত সংস্কার জন্মে যে এদেশের ধর্ম্মকর্ম্ম সকলি মিথ্যা এবং হিন্দুরা পূর্ব্বকালে অতি মূঢ় ছিলেন, অপর বালকেরা অন্য দেশের ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে, কিন্তু জন্মভূমির কোন বিবরণ বলিতে পারে না।'

॥ দুই ॥

পূর্ব কলকাতার শুঁড়ার এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশে ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে ১৬ ফেব্রুআরী রাজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। পাথুরিয়াঘাটার ক্ষেমচন্দ্র বসুর ইংরেজি স্কুলে এবং গোবিন্দচন্দ্র বসাকের হিন্দু ফ্রি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব সমাপন করে তিনি পনেরো বছর বয়সে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। চার বছর পড়াশোনা করার পর তিনি কলেজের বিদেশী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদহেতু কলেজ ছেড়ে দেন। সমসাময়িক শিক্ষাবিষয়ক সরকারী প্রতিবেদনে রাজেন্দ্রলালকে মেডিকেল কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রদের অন্যতম বলে স্বীকৃতি পেতে দেখা যায়। কৃতিত্বের নিদর্শনস্বরূপ তিনি একটি রৌপ্যপদক ও পঞ্চাশ টাকা পেয়েছিলেন। মেডিকেল কলেজ ছাড়ার পর রাজেন্দ্রলাল কিছুদিন আইনশাস্ত্র পড়েছিলেন। তারপর তিনি ভাষা-শিক্ষায় মনঃসংযোগ করেন। ফার্সী, সংস্কৃত, হিন্দী ও উর্দুতে তিনি প্রশংসনীয় পারঙ্গমতা অর্জন করেছিলেন। তা ছাড়া ইংরেজি ভাষাতেও যে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল, তাঁর ইংরেজি প্রবন্ধাবলিই তার প্রমাণ।

তাঁর একান্ত জীবন সম্পর্কে উল্লেখনীয় এই, ১৮৩৯ সালের অগস্ট মাসে তিনি নিমতলার ধর্মদাস দত্তের কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। পাঁচ বছর পরে সৌদামিনী দেবী পরলোকগমন করেন। আনুমানিক আটত্রিশ বছর বয়সে রাজেন্দ্রলাল ভবানীপুরের কালীধন সরকারের কন্যা শ্রীমতী ভুবনমোহিনীকে বিবাহ করেন। ভুবনমোহিনীর গর্ভে রমেন্দ্রলাল ও মহেন্দ্রলাল নামে রাজেন্দ্রলালের দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

॥ তিন ॥

অসংখ্য ঘটনার মধ্যে দু'একটি ঘটনাই মানুষের জীবনে সুদূরপ্রসারী ফল নিয়ে হাজির হয়। রাজেন্দ্রলালের জীবনে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে সংযোগ। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দের ৫ই নভেম্বর রাজেন্দ্রলাল মাসিক ১০০ টাকা বেতনে সোসাইটির সহকারী কর্মসচিব ও গ্রন্থাধ্যক্ষ হন। এশিয়াটিক সোসাইটিতে দশ বছর তিনি কাজ করেছিলেন, কিন্তু এই দশ বছরের কর্মকালই তাঁর চিন্তাজীবনের ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল। সোসাইটিতে তিনি বহু প্রাচীতত্ত্বজ্ঞের সান্নিধ্যে যেমন আসার সুযোগ পেয়েছিলেন, তেমনি ঐ প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান গ্রন্থসংগ্রহকেও নিজের জ্ঞানার্জনের কাজে লাগিয়েছিলেন। ১৮৫৬ সালের মার্চ মাসে

রাজেন্দ্রলাল ওআর্ডস ইন্‌স্টিটিউশন-এর পরিচালকপদে যোগদান করলেও এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি। এই বৎসরে ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁকে সোসাইটির সাধারণ সদস্য বলে ঘোষণা করা হয় এবং জুন মাসে তাঁকে সোসাইটির কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য মনোনীত করা হয়। সেকালে কোন ভারতীয়ের পক্ষে কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হওয়া বিশেষ সম্মানের বিষয় ছিল। রাজেন্দ্রলাল অনুরূপ সম্মানিত ভারতীয়দের অন্যতম ছিলেন।

॥ চার ॥

এশিয়াটিক সোসাইটিতে যোগদানের দু বছর পরে, ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে, রাজেন্দ্রলাল গবেষকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ঐ বছরের এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের জানুআরি সংখ্যায় তাঁর প্রবন্ধ Inscription from the Vijaya Mandir, Udaypur প্রকাশিত হয়। এটিই রাজেন্দ্রলালের প্রথম রচনা। ১৮৪৮-এর নভেম্বর মাসে তিনি কামন্দক-কৃত নীতিসার নামে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি সংক্রান্ত সুপ্রাচীন গ্রন্থের একটি পুঁথির প্রতি সোসাইটির কর্মসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মেজর কিটো নামে একজন বিদ্যোৎসাহী ঐ মূল্যবান পুঁথিটি সোসাইটিকে উপহার দিয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলালের বিদ্যাবত্তায় আস্থাশীল সোসাইটির কর্মসচিব ও কাউন্সিল-সদস্যরা সোসাইটি–প্রবর্তিত Bibliotheca Indica নামে গ্রন্থমালায় পুঁথিটি প্রকাশের সিদ্ধান্তই শুধু গ্রহণ করেননি, তাঁর উপর সমগ্র পুঁথিটি সম্পাদনের ভারও অর্পণ করেন। ১৮৮৪ সালে উপরি-উক্ত গ্রন্থমালায় কামন্দকীয় 'নীতিসার' প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থমালায় রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ' ১-৩ খণ্ড (১৮৫৯, ৬২, ৯০), 'তৈত্তিরীয় আরণ্যক' (১৮৭২), 'ঐতরেয় আরণ্যক' (১৮৭৬), 'ললিতবিস্তর' (১৮৭৭) 'বায়ুপুরাণ', ১-২ খণ্ড (১৮৮০, ৮৮) 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' (১৮৮৮) প্রভৃতি আরও কয়েকটি সুপ্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

রাজেন্দ্রলাল পরিচিত ও জ্ঞাত পুঁথি নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না, নতুন পুঁথির সন্ধানেও তাঁর উৎসাহ ও প্রয়াস ছিল অপরিসীম। তাঁর এই সন্ধানকার্যের ফলে অনেক নতুন ও মূল্যবান পুঁথি আবিষ্কৃত হয়। ১৮৭০ থেকে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আবিষ্কৃত সংস্কৃত পুঁথিগুলি সম্পর্কে তিনি *Notices of Sanskrit Manuscripts* নামে একটি পরিচিতি-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ন'টি খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থখানি রাজেন্দ্রলালের বিদ্যোৎসাহিতা

ও পরিশ্রমের প্রদীপ্ত প্রমাণ। ঐ সময়ের মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহভুক্ত পুঁথি, বিকানীরের মহারাজার গ্রন্থাগারভুক্ত পুঁথি, অযোধ্যায় প্রাপ্ত পুঁথি প্রভৃতি সম্পর্কেও কয়েকটি পরিচিতি-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন জায়গায় পুঁথিসংগ্রহ সংক্রান্ত প্রতিবেদন-গ্রন্থগুলিরও উল্লেখ করা যায়।

॥ পাঁচ ॥

ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলালের চারখানি বিখ্যাত বই : দু খণ্ডে প্রকাশিত *The Antiquities of Orissa* (প্রথম খণ্ডের প্রকাশ ১৮৭৫, দ্বিতীয় খণ্ডের ১৮৮০), *Buddha Gaya, the hermitage of Sakya Muni* (১৮৭৮), দুখণ্ডে প্রকাশিত *Indo-Aryans* (১৮৮১) এবং *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* (১৮৮২)। সময়ের ক্ষয়কারী প্রভাবে তাঁর অন্যান্য বইগুলির মূল্য হ্রাস পেলেও প্রথম ও চতুর্থ বই দু'টি উপকরণের ঐশ্বর্যে এখনো পণ্ডিতমহলের সশ্রদ্ধ বিস্ময়।

১৮৬৮-৬৯ সালের শীতকালে বাংলাদেশের তদানীন্তন লেফটেনাণ্ট গভর্নর গ্রে সাহেব রাজেন্দ্রলালের উপর উড়িষ্যার মন্দিরগুলি সম্পর্কে সরজমিনে বিস্তৃত তথ্য ও উপকরণ আহরণের ভার অর্পণ করেন। কয়েকজন কারিগর ও শিল্পীকে নিয়ে তিনি ভুবনেশ্বর, পুরী, কোনারক প্রভৃতি মন্দির-নন্দিত স্থানগুলিতে যান। উদ্দেশ্য, মন্দিরগুলি পর্যবেক্ষণ এবং সেই সঙ্গে কারিগর ও শিল্পীদের দিয়ে মন্দিরগুলির শিল্পানুকৃতি ও মন্দিরগাত্রের অলঙ্করণের নিদর্শন প্রস্তুত করা। উড়িষ্যার মন্দিরগুলি সম্পর্কে যতখানি বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণ সেকালে সম্ভব ছিল, রাজেন্দ্রলাল তার নিঃসন্দিগ্ধ স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁর এই গ্রন্থে। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে উড়িষ্যার প্রত্নবস্তুসমূহের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডটি বিভিন্ন মন্দির ও প্রত্নবস্তুর স্বতন্ত্র ও বিশদ আলোচনার গ্রন্থনায় প্রকাশিত। প্রথম খণ্ডের 'ভূমিকা'য় প্রাচীন সাহিত্যে উড়িষ্যা সংক্রান্ত তথ্যগুলি সমাহৃত হয়েছে। এবং ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাস, উড়িষ্যার মন্দির-স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যগত অলংকরণ, ভাস্কর্য-নিদর্শন থেকে উড়িষ্যার মন্দিরনির্মাতাদের সামাজিক অবস্থা, উড়িষ্যার শিল্পকলার বিবর্ধন-বিবর্তনে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার দান খণ্ডটির অবশিষ্ট পাঁচটি পরিচ্ছেদে স্থানলাভ করেছে। দ্বিতীয় খণ্ডে খণ্ডগিরির প্রত্ননিদর্শন, এবং ভুবনেশ্বর, পুরী, কোনারক ও

সত্যবাড়ি এবং দর্পণ, জাজপুর, অলতি প্রভৃতি স্থানের মন্দিরনিচয় সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থিত হয়েছে।

The Antiquities of Orissa পরিশ্রম ও মনীষার হার্দ্য সমন্বয়ে, ভারতীয় কলমে ইতিহাসরচনার ক্ষেত্রে, স্মরণীয় কীর্তি।

রাজেন্দ্রলালের আর-একটি গ্রন্থ *Buddha Gaya, the Hermitage of Sakyamuni*. এই গ্রন্থে অবশ্য *The Antiquites of Orissa*-র মতো সুপ্রসিদ্ধ নয়। মৌলিকতার দিক থেকেও এটি খুব উল্লেখনীয় নয়। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক নিজেও সে কথা স্বীকার করে বলেছেন, গ্রন্থটির অধিকাংশ উপাদান তিনি তাঁর পূর্বসুরি কিটো, কানিংহাম ও অন্যান্যদের বুদ্ধগয়া- সংক্রান্ত রচনাবলি থেকে সংগ্রহ করেছেন এবং গ্রন্থপ্রণয়নে মৌলিক তথ্যানুসন্ধানীর চাইতে পরিচিত তথ্যসংগ্রাহকের ভূমিকাকেই প্রধানত বেছে নিয়েছেন। তবে মূলত পূর্বাচার্যদের আবিষ্কৃত তথ্যকে ভিত্তি করলেও সব সময় তিনি তাদের ব্যবহারে নির্বিচার নন, প্রয়োজনমতো কোন কোন তথ্যকে যাচাই করে পূর্বগামীদের অভিমত সিদ্ধান্তের উপর নতুন আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ হিসাবে কিটো কানিংহাম অবশ্যই শ্রদ্ধেয়, কিন্তু ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে তাদের সমস্ত মতই যে অভ্রান্ত নয়, ১৮৭৮ সালে—ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের শৈশবাবস্থায়—একজন ভারতীয়ের পক্ষে একথা বলতে পারা প্রশংসনীয় নয় কি ?

দু খণ্ডে প্রকাশিত *The Indo-Aryans* ভারতের ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধের নির্বাচিত সংকলন। *The Antiquities of Orissa* গ্রন্থেরও কিছু কিছু অংশ এতে স্থান লাভ করেছে। গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলির বিষয় বৈচিত্র বিস্ময়কর। একদিকে জটিল নন্দনতত্ত্ব বা প্রাচীন ভারতের মন্দিরস্থাপত্য, অন্যদিকে প্রাচীন ভারতে খাদ্য হিসাবে গোমাংসের ব্যবহার বা প্রাচীন ভারতে সুরাপান—নানা ধরনের বিষয় অবলম্বনে লেখা প্রবন্ধগুলি রাজেন্দ্রলালের অধ্যয়নের বিস্তৃতিই শুধু প্রমাণ করে না, সেই সঙ্গে তাঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও কিছুটা ঐতিহাসিক-সুলভ নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিচয় বহন করে।

গৃহীতনামা হজসন সাহেব নেপাল থেকে ৩৮১ বাণ্ডিল সংস্কৃতে লেখা প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথি আবিষ্কার করে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের উপর যুগান্তকারী আলোকসম্পাত করেন। আবিষ্কৃত পুঁথিগুলির মধ্যে ৮৫ বাণ্ডিল হজসন কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটিকে দেন। সোসাইটির তদানীন্তন সভাপতি আর্থার গ্রোট পুঁথিগুলির প্রামাণিকতা ও ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে স্থির-

নিশ্চয় হয়ে সেগুলিকে অবিলম্বে বিদ্বজ্জনসমক্ষে প্রকাশ করতে ব্যগ্র হলেন। তিনি পুঁথিগুলিকে পরীক্ষা এবং তাদের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ ও লিপিবদ্ধ করার ভার রাজেন্দ্রলালের উপর অর্পণ করলেন। হরিনাথ বিদ্যারত্ন, রামনাথ তর্করত্ন এবং কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ নামে তিনজন পণ্ডিতের সহায়তায় রাজেন্দ্রলাল সমস্ত পুঁথি পরীক্ষণ ও বিষয়বস্তু- সংকলন-কার্য শেষ ক'রে ফেললেন। তাঁর এই অসাধারণ পরিশ্রমের ফল চতুর্থ গ্রন্থ *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal.* এখানে মনে রাখা দরকার, সমস্ত পুঁথিই যে উক্ত তিনজন পণ্ডিত পড়েছিলেন বা তাদের বিষয়বস্তু সংকলন করেছিলেন তা নয়, রাজেন্দ্রলাল নিজেও অনেক পুঁথি পড়ে তাদের সারসংগ্রহ করেছিলেন। তা ছাড়া পণ্ডিতদের প্রত্যেকটি পাঠ ও বিষয়বস্তু সংকলন তিনি মূল পুঁথির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছিলেন। এই সময় রাজেন্দ্রলাল অসুস্থ হয়ে পড়লে (সম্ভবত অত্যধিক পরিশ্রমে) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন এবং মোট ১৬টি বড় পুঁথির বিষয়বস্তুর ইংরেজী অনুবাদ করে দেন।[১] পরবর্তী কালে পুঁথিসংগ্রহ, পুঁথির বর্ণনাত্মক সূচিসংকলন ইত্যাদি কাজে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে- অসাধারণ দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়েছিলেন, রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে সংযোগে তার উৎসভূমি নিহিত, এ কথা মনে করাটা খুব একটা অন্যায় হবে না। সংক্ষেপে, *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* ভারতবিদ্যার ক্ষেত্রে একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি। আয়তনেই শুধু নয়, উপাদানের প্রাচুর্যে ও ঐতিহাসিক ঐশ্বর্যে এটি মহাগ্রন্থের মর্যাদা দাবি করতে পারে এবং আজও এ গ্রন্থ পণ্ডিতমহলে শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজেন্দ্রলালের এই গ্রন্থভুক্ত 'মহাবস্তু অবদান'-এর কুশের কাহিনী (পৃ. ১৪২-৫) এবং 'শার্দুলকর্ণাবদান' (পৃ. ২২৩-৪) থেকে রবীন্দ্রনাথ যথাক্রমে তাঁর 'রাজা' (১৯১০) ও 'শাপমোচন' (১৯৩১) এবং 'চণ্ডালিকা'র (১৯৩৩) কাঠামো নিয়েছিলেন।[২] এ ছাড়া আরও কিছু কিছু কবিতার জন্যও— যেমন, 'পরিশোধ' (বজ্রসেন ও শ্যামার কাহিনী)—রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য গ্রন্থের কাছে ঋণী।

---

১ গ্রন্থের সূচিপত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনূদিত অংশগুলির পুঁথিসংখ্যার পাশে H.P.S. আদ্যক্ষর আছে।

২ মূল গল্পে নায়ক এবং নায়িকা কুশ এবং তদীয় পত্নী সুদর্শনা। 'রাজা'য় সুদর্শনা নাম অবিকৃত কিন্তু নায়ক শুধুমাত্র 'রাজা' বলে অভিহিত। 'শাপমোচন'-এ কুশ এবং সুদর্শনা অরুণেশ্বর এবং কমলিকায় নামান্তরিত হয়েছেন। 'অরূপরতন' (১৯২০) 'রাজা'র-ই ভিন্নতর সংস্করণ।

॥ ছয় ॥

শুধু ইংরেজী নয়, মাতৃভাষাকেও রাজেন্দ্রলাল তাঁর ইতিহাস-সাধনার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এ দিক থেকে রাজেন্দ্রলাল উনিশ শতকের স্বদেশচেতন বাঙালী সমাজের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি। রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে যে-সাময়িকপত্রের প্রকাশ ঘটল, তার পরিচয়ই হল 'পুরা-বৃত্তেতিহাস প্রাণিবিদ্যা শিল্পসাহিত্যাদিদ্যোতক মাসিকপত্র'। ইংরেজিতে যাকে বলে পেনি ম্যাগাজিন, 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ছিল তা-ই এবং বাংলা ভাষায় এটি প্রথম সচিত্র ও সর্বঙ্কর পত্রিকা। 'যাহাতে সাধারণ জনগণে অনায়াসে বিদ্যালাভ করিতে পারে' সেই মহান উদ্দেশ্য নিয়েই রাজেন্দ্রলাল পত্রিকাটি বার করেছিলেন। এবং পত্রিকাটি যে এ বিষয়ে কী আশ্চর্য সার্থকতার সামীপ্য লাভ করেছিল, 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকমাত্রই তা জানেন। এবং 'জীবনস্মৃতি' রচনাকালে যখন কবি আক্ষেপ করে বলেন,—

'এই ধরনের কাগজ একখানিও নাই কেন।..সর্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না' ('জীবনস্মৃতি', বিশেষ সংস্করণ, পৃ. ৬৩)।

তখন বোঝা যায় সার্থক সম্পাদক হিসাবেও রাজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের কতখানি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

বস্তুত, 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' বাঙালীর ইতিহাসচেতনার উদ্বোধন-বিবর্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। পত্রিকাটি শুধুমাত্র এদেশের ইতিহাস-ভূগোল-বা পুরাবৃত্ত সংক্রান্ত আলোচনা প্রকাশেই ক্ষান্ত ছিল না, পরন্তু সমগ্র বিশ্বই ছিল 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র বলয়ধৃত। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র পাঠকবৃন্দ তাই কাশ্মীরদেশের, হুলকররাজ্যের, বা রোহিলাদিগের ইতিহাসের সঙ্গে 'আরব লোক দ্বারা পারশ্যদেশের পরাজয়ে'র বা রুষিয়া রাজ্যের ইতিহাস জানবার দুর্লভ সুযোগ অর্জন করেছিল। তা ছাড়া 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' এ দেশের কীর্তিমান পুরুষদের জীবন-চরিত আলোচনার মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে সমুচ্চ আদর্শ স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছিল, সে কথাও এ সূত্রে স্মরণীয়। উদাহরণস্বরূপ 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' 'ক্রমশঃ প্রকটিত' শিবাজীর জীবনালেখ্য—নবেম্বর ১৮৬০ সালে 'শিবজীর চরিত্র' নামে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত—রচনার উল্লেখ করা যায়। রাজা চন্দ্রগুপ্তের বিবরণ বা অশোক সম্পর্কিত প্রবন্ধ (ঐ প্রবন্ধে অশোকের অনুশাসনের ব্যাখ্যা ও ব্রাহ্মী অক্ষরের প্রতিলিপি প্রদত্ত হয়েছিল) প্রকাশ করে রাজেন্দ্রলাল প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের

প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সেকালের জ্ঞানলিপ্সু বঙ্গভাষীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র ঐতিহাসিক রচনার পাশাপাশি দেশবিদেশের পশুপাখির সচিত্র' বর্ণনা, ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, নানাবিধ শিল্পদ্রব্যসংক্রান্ত আলোচনা, সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থাদির বিশ্লেষণমূলক পরিচিতি প্রভৃতি স্থান পেত। এবং এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য, সাময়িকপত্রে গ্রন্থ-সমালোচনার রীতি প্রবর্তনের সম্মান রাজেন্দ্রলালের প্রাপ্য। বিশ্লেষণাত্মক ও বৈদগ্ধ্যগর্ভ গ্রন্থ-সমালোচনার যে-কয়েকটি নমুনা আলোচ্য পত্রিকা থেকে পাওয়া গেছে, এ কালের মননশীল গ্রন্থসমালোচকরাও তাদের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দেবেন বলে আমার বিশ্বাস।

১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় ১৮৬৩ সালের ফেব্রুআরী মাসে 'রহস্য-সন্দর্ভ' নামে অনুরূপ একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, কিন্তু প্রায় ন বছর চলার পরে পত্রিকাটি উঠে যায়।

স্বদেশী কলমে দেশের ইতিহাস রচনা প্রয়োজন, প্রয়োজন শুধু নয়, জাতীয় কর্তব্য—উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই এই বোধ বাঙালীচিত্তে উন্মীলিত হতে শুরু করেছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (প্রতিষ্ঠা-কাল ১৬ অগস্ট, ১৮৪৩) 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা' (১৭৭১ শকাব্দ, ৭১ সংখ্যা) বা 'ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের পূর্ব্বকালীন বাণিজ্য-বিবরণ' (ঐ, ৭৮ সংখ্যা) জাতীয় প্রবন্ধ বাঙালীর স্বদেশচেতনা ও ঐতি-হাসিক জিজ্ঞাসার পরিচয়বাহী। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র প্রকাশের মূলে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র আদর্শ অনুপ্রেরণার কাজ করেছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র তৈরি জমির উপর 'বঙ্গদর্শন' (১২৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত) আবির্ভাব তাই স্বভাবী ঘটনা হিসাবেই পরিগণ্য। ইতিহাস-চেতনা জাতীয় জাগরণের ভিত্তিভূমি, উনিশ শতকের বাঙালী সমাজে সেই চেতনা সঞ্চারে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' এবং 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। অন্যভাবে, 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল নবজাগ্রত দেশবুদ্ধ বঙ্গমনীষীদের অন্যতম বিশিষ্ট প্রতিনিধি।

॥ সাত ॥

শুধু ইতিহাসেই নয়, ভাষাতত্ত্ব, ভূগোল, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে রাজেন্দ্রলালের আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা লক্ষণীয়। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ

আমাদের জানিয়েছেন, তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'সারস্বত সমাজ'—এর (প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দ) প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল। ১২৮৯ সালে ২রা শ্রাবণ সমাজের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে রাজেন্দ্রলাল বাংলা বানানের উন্নতি সাধন, ঐতিহাসিক অথবা ভৌগোলিক নামগুলির বানানে নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ, ইংরেজী পারিভাষিক শব্দের যথার্থ অনুবাদ প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে সমাজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। 'সারস্বত সমাজ' স্বল্পায়ু নিয়ে এসেছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'যে কয়দিন সভা বাঁচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন। ভৌগোলিক পরিভাষা নির্ণয়েই আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরিভাষার প্রথম খসড়া সমস্তটা রাজেন্দ্রলালই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন।'[১] রাজেন্দ্রলালের মাতৃভাষাপ্রীতি, বৈদগ্ধ্য এবং কর্মৈষণা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাগর্ভ উক্তি: 'তখন যে বাংলা সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠাচেষ্টা হইয়াছিল সেই সভায় আর কোন সভ্যের কিছুমাত্র মুখাপেক্ষা না করিয়া যদি একমাত্র মিত্র মহাশয়কে দিয়া কাজ করাইয়া লওয়া যাইত তবে বর্তমান সাহিত্য পরিষদের অনেক কাজ কেবল সেই একজন ব্যক্তি দ্বারা অনেক দূর অগ্রসর হইত সন্দেহ নাই।'[২]

রাজেন্দ্রলাল কিছু কিছু ভৌগোলিক পরিভাষিক শব্দের অনুবাদ করেছিলেন, যেমন isthmus=সঙ্কটস্থান, peninsula=প্রায়দ্বীপ ইত্যাদি।[৩] 'প্রাকৃত ভূগোল' নামে তিনি যে ভূবিদ্যাগ্রন্থ রচনা করেছিলেন (প্রকাশকাল ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দ) তার শেষের দিকে একটি 'পারিভাষিক শব্দের নির্ঘণ্ট' আছে। তা ছাড়া ১৮৫০-৫৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কয়েকটি ছোট-বড় মানচিত্র বাংলায় প্রকাশ করেছিলেন এবং 'বঙ্গাক্ষরে সর্বপ্রথমে এ দেশের মানচিত্র প্রকাশের গৌরব তাঁহারই প্রাপ্য।' ব্যাকরণে ও ভাষা-তত্ত্বে তাঁর আগ্রহের পরিচয়স্বরূপ 'ব্যাকরণ-প্রবেশ' (প্রকাশকাল ১৮৬২) পুস্তিকাটির উল্লেখ করা যায়। 'পত্রকৌমুদী' (প্রকাশকাল ১৮৬৩) নামে আর একটি বইতে তিনি বিভিন্ন সম্পর্কীয় লোককে ও প্রতিষ্ঠানকে কিভাবে চিঠি লেখা উচিত তা শেখাবার জন্য কয়েকটি আদর্শ চিঠির

১ জীবনস্মৃতি, পৃ. ১২৭
২ জীবনস্মৃতি, পৃ. ১২৮
৩ মন্মথনাথ ঘোষ রচিত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', পৃ. ১১২

সংকলন করেছেন। এই সব বই ছাড়া 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্য-সন্দর্ভ'-র বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত অসংখ্য রচনায় তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় তাঁর জিজ্ঞাসা ও পারঙ্গমতার স্বাক্ষর ছড়িয়ে রয়েছে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা এবং যুক্তির কষ্টিপাথরে জানা জিনিসকে যাচাই করে নেবার বাসনা মননবিত্ত লেখকের পরিচয়-পত্র এবং এ ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলাল বাঙালী তথা ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন।

।। আট ।।

রাজেন্দ্রলাল যে সেকালের ভারতীয় মনীষীদের অন্যতম ছিলেন, দেশবিদেশের নানা পণ্ডিত ও বিভিন্ন বিদ্বৎপ্রতিষ্ঠান সে কথা নিঃসংশয়িত-ভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। যে- এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি-পদ আজও বিদ্বজ্জনমাত্রেরই কাঙ্ক্ষণীয়, রাজেন্দ্রলাল ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে সেই পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। এবং এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই, রাজেন্দ্রলালই এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সভাপতি। ইতি-পূর্বে ১৮৫৭ এবং ১৮৬৫ সালে তিনি সোসাইটির কর্মসচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্ল্যাণ্ডের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে তাঁদের সম্মানিত সদস্য মনোনীত করে-ছিলেন। এ ছাড়া জার্মান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি, আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি, এথ্নোলজিক্যাল সোসাইটি অফ বার্লিন প্রভৃতি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি সম্মানিত অথবা সংযোগ-সদস্যরূপে যুক্ত ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' ডিগ্রীতে ভূষিত করেন। ১৮৭৭ এবং ১৮৭৮ সালে সরকার তাঁকে যথাক্রমে 'রায় বাহাদুর' ও 'সি. আই.ই' খেতাব দেন। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে সরকার তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে সম্মানিত করেন।

এই সব খেতাব উপাধির সাংসারিক মূল্য আপাতদর্শন বলে উল্লেখ করা যাক সেই তথ্যটি যে- তথ্যে রাজেন্দ্রলাল একজন বিদেশী বুধপ্রবর কর্তৃক সশ্রদ্ধ স্বীকৃত। ম্যাক্স ম্যুলর নামে প্রাতঃস্মর্তব্য সেই মনীষী রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে বলেছেন :

He is a Pandit by profession, but he is, at the same

time, a scholar and critic in our sense of the word...Our Sanskrit scholars in Europe will have to pull hard, if, with such man as Babu Rajendralal in the field, they are not to be distanced in the race of scholarship.

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কমিটি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্মানিত ও সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকে রাজেন্দ্রলাল এ কথাও প্রমাণ করেছিলেন, ইতিহাসের ধূসর পাণ্ডুলিপির বাইরেও তাঁর সজীব দৃষ্টি ছিল। দেশের প্রবহমান জীবনধারায় তিনিও যে একজন অংশীদার, নানাভাবে তার নির্ভুল প্রমাণ দিয়ে খ্যাতি ও গৌরবের কোলে ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জুলাই তিনি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন।

॥ নয় ॥

স্বদেশবৃত্ত-চর্চার সূচনাপর্বে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আবির্ভাব। একদিকে জোন্স-কোলব্রুক-প্রিন্সেপ প্রমুখ বিদেশী ভারতবন্ধুদের রচনা-ধৃত গৌরবময় অতীত ব্যাখ্যান, অন্যদিকে মিল-মার্শম্যানদের ভারতনিন্দা ও স্বাজাত্য-দর্প—দু'য়ের মাঝখানে ধীরে ধীরে ভারত-ইতিহাস-চর্চার ডাঙা জাগতে শুরু করেছে। সে-ডাঙায় স্বদেশী ঐতিহাসিকদের পদক্ষেপ তখনও ভীরু, দ্বিধাগ্রস্ত। বাংলা ভাষায় ইতিহাস লেখা শুরু হয়েছে, কিন্তু যে দু চারখানা বই বেরিয়েছে তার অধিকাংশই, নীলমণি বসাকের কথায়, 'ইংরাজী হইতে ভাষান্তরিত, তাহাতে হিন্দুদিগের প্রাচীন বৃত্তান্ত কিছুই নাই, এবং তাহা এমত নীরস যে, কোন ব্যক্তি তাহা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন না, এবং পাঠ করিলেও তৃপ্তিবোধ হয় না।' নীলমণি বসাকের এই উক্তির উচ্চারণ-কাল ১৮৫৭, সিপাহী বিদ্রোহের বছর। রাজেন্দ্রলাল তখন গবেষকরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তাঁর কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। *Bibliotheca Indica*-য় তিনি 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক (১৮৫৪) সম্পাদনা করেছেন এবং 'সোসাইটি'র প্রত্নসংগ্রহের তালিকা (১৮৪৯), বই ও মানচিত্রের তালিকা (১৮৫৬) এবং 'জার্নাল'-এর প্রথম চব্বিশ খণ্ডে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলির সূচি (১৮৫৬) প্রস্তুত করেছেন। রাজেন্দ্রলালের বেশির ভাগ কাজ ১৮৬০ সালের পরে এবং তাঁর প্রধান রচনাবলির কালসীমা ১৮৭৫ থেকে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ-বিধৃত। এই সময়-সীমার মধ্যেই তাঁর

বিখ্যাত *The Antiquities of Orissa* এবং *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষের প্রণালীবদ্ধ আনুপূর্বিক ইতিহাস রচনা তখন সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে দোলায়িত, কারণ তথ্যের অপ্রতুলতা এবং ফলত যুক্তিসহ কাঠামোর অভাব, তদুপরি প্রাপ্ত তথ্যের যথাযথ বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল বিজ্ঞানসম্মত রচনাপদ্ধতির অনুপস্থিতি। এমতাবস্থায় ঐতিহাসিকের প্রাথমিক কর্তব্য তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ। প্রিন্সেপ, কিটো, কানিংহাম প্রমুখ বিদেশী প্রত্নশাস্ত্রীদের চেষ্টায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক মূল্যবান আবিষ্কার সম্ভব এবং সেগুলির মূল্য নির্ধারিত হয়েছে। এঁদের কাছ থেকেই প্রেরণা সংগ্রহ করলেন রাজেন্দ্রলাল। উপাদান, আরও উপাদান চাই, এবং নিজের চোখে সে সব উপাদান পরীক্ষার প্রয়োজন, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজেন্দ্রলাল কাজে নামবার ব্রত গ্রহণ করলেন।

রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর বহু পরে ইতিহাস-রচনার রীতি-পদ্ধতির উন্নয়ন-সংক্রান্ত অজস্র আলোচনার মধ্যে একটি কণ্ঠস্বর[১] শ্রুত হলো: ইতিহাস-সৌধ নির্মাণ করতে হবে গোড়া থেকে উপরের দিকে ('from the bottom up')। এবং প্রত্যেক দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিস্তৃত তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ করে ও ঐ সব জায়গার আঞ্চলিক গুরুত্বের কথা মনে রেখে এই কাজ করতে হবে। অর্থাৎ সমগ্র দেশের ইতিহাস রচনা করার আগে সে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস রচনার, অন্তত সে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের, দিকে মনঃসংযোগ করতে হবে। সমাপতন কি না বলতে পারব না, ১৮৬৮-৬৯ সালে আঞ্চলিক ইতিহাসের বিস্তারিত উপাদান সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে রাজেন্দ্রলাল সদলবলে উড়িষ্যায় গিয়েছিলেন। উড়িষ্যার প্রত্নকীর্তিগুলি সরজমিনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রত্যবেক্ষণ করে তা থেকে ভারতের ইতিহাসের, বিশেষত ভারতের সামাজিক ইতিহাসের, উপাদান সংগ্রহ ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। তাঁর নিজের কথাতেই:

১ The American History Association প্রকাশিত ও Caroline F. Ware সম্পাদিত *The Cultural Approach to History* (Columbia University, 1940) পৃঃ ২৭৫ দ্রষ্টব্য। গ্রন্থভুক্ত The Value of Local History প্রবন্ধ-লেখকের মতে: In writing cultural history, local historical research must take rank as a basic discipline. পৃ, ২৮৬।

In prosecuting my researches I had a two-fold object in view ; in the first place, to carry out the directions of the Lord Canning, as laid in his memorable resolution on the antiquities of India, that is to say, to secure 'an accurate description,—illustrated by plans, measurements, drawings, or photographs, and by copies of inscriptions—of such remains as most deserve notice, with the history of them so far as it may be traceable, and a record of the traditions that are retained regarding them' ; and in the second place to notice prominently such points in them as were calculated to throw any special light on the *social history of the ages* to which they referred. For this purpose, Sir, Gardner Wilkinson's learned work on the 'Ancient Egyptians' has served me for a guide. (ইটালিকস আমার) *Antiquities of Orissa*, Vol. I, preface, p. 1.

রাজেন্দ্রলালের ইতিহাস-দৃষ্টি যে ভারতের ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করতে পেরেছিল, স্যার গার্ডনারের *Ancient Egyptians*—এর আদর্শে উড়িষ্যার প্রাচীন সামাজিক ইতিহাস রচনা-প্রচেষ্টাতে তার পরিচয় নিহিত।

রাজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ইতিহাস রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা সুস্পষ্টভাবে তাঁর উপরি-উদ্ধৃত উক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে। সে উক্তি বিশ্লেষণে দেখা যায়, ঐতিহাসিকরূপে দ্রষ্টব্য বস্তুর নিখুঁত ও বিশদ বিবরণ সংগ্রহ তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য এবং এ কর্তব্যের সুষ্ঠু সমাধা সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা ক্রমশ মনোযোগী ও যত্নশীল হয়ে উঠছেন। দ্বিতীয়ত, আধুনিক ঐতিহাসিকসুলভ দ্রষ্টব্য বস্তু, প্রত্নকীর্তি-সংক্রান্ত কিংবদন্তী, স্থানীয় জনশ্রুতি ইত্যাদির উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ; যেমন 'মাদলা পঞ্জী' নামে উড়িষ্যার মন্দির-সংক্রান্ত পুরাবিবরণগুলিকে তিনি সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক বলে কখনো নস্যাৎ করেন নি এবং 'মাদলা পঞ্জী' যে একেবারে মূল্যহীন নয় পরবর্তী গবেষণায় একথা প্রমাণিত হয়েছে। শেষত, প্রত্নকীর্তিকে নিছক বস্তুমূল্যে গ্রহণ করা অর্থহীন, কারণ প্রত্নকীর্তি-গুলি, যেমন উড়িষ্যার মন্দির ও ভাস্কর্য, সমসাময়িক কালের দর্পণ। আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে, একজন ভারতীয়ের মধ্যে এই আধুনিক ঐতিহাসিকসুলভ ইতিহাস-বোধের উপস্থিতি নিঃসন্দেহেই বিস্মিত শ্রদ্ধা

আকর্ষণের যোগ্য। আরও অবাক হতে হয় যখন দেখি, সেই ভারতীয় ঐতিহাসিকের দৃষ্টি-বলয়ে শুধু স্বদেশ নয়, সমগ্র বিশ্ব এসে ধরা দিয়েছে এবং বিশ্ব-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর স্বদেশবৃত্তকে স্থাপনের প্রয়াস পাচ্ছেন। প্রাচীন উড়িষ্যার সামাজিক ইতিহাস রচনায় যেমন তিনি স্যার গার্ডনারের বইকে আদর্শ করছেন তেমনি উড়িষ্যার শিল্পকলা অধ্যয়নের সময় ওয়েস্টম্যাকটের *Handbook of Sculpture* বা লিবকি-র *The History of Art* ও *The History of Sculpture*-এর কথা মনে রেখেছেন।

পুনরুক্তির সুরে বলি, যে সময় রাজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিকের কলম হাতে নিয়েছিলেন, দেশীয় ইতিহাসচর্চার তখন শৈশবাবস্থা, তথ্য অপ্রচুর, রচনাপদ্ধতি অজ্ঞাত। উড়িষ্যাসংক্রান্ত মহাগ্রন্থের গোড়ায় তিনি তথ্যের অপ্রতুলতার কথা মেনে নিয়ে বলছেন, মানুষের অন্বেষণের সীমা নেই, আপাতদৃষ্টিতে নিরাশ হবার মতো ক্ষেত্রেও মানুষ শুধু অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের দ্বারা অনেক কাজ করতে পারে। বলাই বাহুল্য, এই প্রত্যয় দৃঢ়মূল না হলে রাজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক হিসাবে কীর্তিমান ও স্মরণীয় হতেন না।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে, ভারতের ইতিহাসচর্চায় অন্যতম পথিকৃতের সম্মান কি রাজেন্দ্রলালের প্রাপ্য? এ প্রশ্নের উত্তর নিঃসন্দেহেই সম্মতি-সূচক। উড়িষ্যায় তাঁর আগে কোন প্রত্নসন্ধীর পদার্পণ ঘটেনি বা উড়িষ্যার প্রাচীন নিদর্শনাদি নিয়ে কেউ কিছু লেখেননি এমন নয়, কিন্তু সমগ্র প্রাচীন উড়িষ্যাকে তার বর্ণবৈভবে আমাদের দৃষ্টির সামনে নিয়ে আসার কৃতিত্ব রাজেন্দ্রলালের প্রাপ্য। উড়িষ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থে ১৮৮০ অবধি প্রাপ্ত তাবৎ প্রত্ননিদর্শনের বিশদ বিবরণই শুধু লিপিবদ্ধ হয়নি, নানা শিল্পবস্তুর রেখাচিত্র ও আলোকচিত্রেও এই গ্রন্থ অত্যন্ত মূল্যবান। রাজেন্দ্রলালের পর উড়িষ্যা সম্পর্কে আরও বহু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু এখনও উড়িষ্যার ইতিহাস প্রণয়নেচ্ছুকে রাজেন্দ্রলালের বইয়ের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। রাজেন্দ্রলালের অপর গ্রন্থ *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য করে বলা যায়, ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচয়িতা মাত্রেরই এটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থের প্রাথমিক ভিত্তি যদিচ হজসন রচিত এবং যদিচ হজসন-এর পুঁথিগুলির পাঠোদ্ধারে তিনজন পণ্ডিত রাজেন্দ্রলালকে সাহায্য করেছিলেন,[১] তবু বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন এই

গ্রন্থ রাজেন্দ্রলালের, একান্তভাবে রাজেন্দ্রলালেরই, কীর্তি! রসিক ভোক্তা সুস্বাদু ব্যঞ্জনের কৃতিত্ব রন্ধনশিল্পীকেই দিয়ে থাকেন, তেল-নুন সরবরাহ-কারীকে নয়। ইতিহাসরচনার পথ-প্রস্তুতির কাজে রাজেন্দ্রলালকে অসামান্য পরিশ্রমী অংশ নিতে হয়েছিল। এবং সেই কাজে রাজেন্দ্রলাল যদি কিছু ভুল-ত্রুটি করে থাকেন তবে তা নিশ্চয়ই ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু আমার হাতের কাছেই এমন তথ্য আছে যা প্রমাণ করে, সে সব ভুল-ত্রুটি উপাদানের স্বল্পতা বা অসম্পূর্ণতাজনিত, রাজেন্দ্রলালের বিচারবোধ থেকে তারা জন্মায়নি। পরন্তু, ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনাশক্তির বলে রাজেন্দ্রলাল সেদিন এমন কতকগুলি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, যেগুলি পরবর্তীকালে অধিকতর তথ্য উপাদানের দ্বারা সপ্রমাণ হয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ ভারতীয় স্থাপত্যের উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা যায়। ফার্গুসনের মতো ভারতীয় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে একজন প্রমাণ-পুরুষের যুক্তি-তর্ক খণ্ডন করে রাজেন্দ্রলাল তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস পেয়ে বলেছিলেন, ভারতীয় স্থাপত্যের উৎপত্তি এই ভারতবর্ষেই; আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পরে ভারতীয়রা গ্রীক স্থপতির কাছে পাথরের সাহায্যে বাড়ি তৈরি করার বিদ্যা শিখেছিল ফার্গুসনের এ মন্তব্য ঐতিহাসিকসুলভ নয়।[১] বলাই বাহুল্য, আদি-ঐতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার ভারতীয় স্থাপত্যের দেশীয় ভিত্তিভূমি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত করেছে। ফার্গুসনের মতো খ্যাতিমান পণ্ডিতের সঙ্গে বিতর্ক রাজেন্দ্র-লালের বিদ্যাবত্তার শুধু নয়, স্বীয় বিদ্যাবত্তা ও অন্তর্দৃষ্টিতে তাঁর গভীর আত্মবিশ্বাসেরও পরিচয় দেয়। এই আত্মবিশ্বাস ছিল ঐতিহাসিক রাজেন্দ্র-লালের অন্যতম চরিত্রবৈশিষ্ট্য। আর তা যুক্তিবুদ্ধির উপর সহজভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তথ্যের বিশদ সংগ্রহ এবং নিরাসক্ত বিশ্লেষণ, অতঃপর বিশ্লেষণ-নির্ভর তথ্যের বিন্যাস ও সামান্যীকরণ— ঐতিহাসিক-

১ এখানে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কথায়: "তখনকার কালের মহত্ত্ববিদ্বেষী ঈর্ষাপরায়ণ অনেকেই বলিত যে, পণ্ডিতেরাই কাজ করে ও তাহার যশের ফল মিত্র মহাশয় ফাঁকি দিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। আজিও এরূপ দৃষ্টান্ত কখনো কখনো দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি যন্ত্রমাত্র ক্রমশ তাহার মনে হইতে থাকে, 'আমিই বুঝি কৃতী আর যন্ত্রীটি বুঝি অনাবশ্যক শোভামাত্র।' কলম বেচারার যদি চেতনা থাকিত তবে লিখিতে লিখিতে নিশ্চয় কোন একদিন সে মনে করিয়া বসিত, 'লেখার সমস্ত কাজটাই করি আমি, অথচ আমার মুখেই কেবল কালী পড়ে আর লেখকের খ্যাতিই উজ্জ্বল হইয়া উঠে।' 'জীবনস্মৃতি,' পৃ. ১২৯।

সুলভ এই কাজগুলি করতে গিয়ে যদি তাঁকে বিখ্যাত কীর্তিমান পণ্ডিতদের (প্রায়শ বিদেশী) বিরোধিতা করতে হত, তা হলে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করে নিজের যুক্তি ও আত্মবিশ্বাসের হাতিয়ার নিয়ে সেই সব প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন, তাঁদের মতকে খণ্ডন করার চেষ্টা করতেন। এ বিরোধিতার সময় তিনি তাঁদের প্রতি কোনরকম অশ্রদ্ধা দেখাতেন, এ কথা যেন আমরা ভুলেও মনে না করি। তাঁর বিতর্ক জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে কখনও ব্যক্তিকে স্পর্শ করেনি।

প্রসঙ্গক্রমে আমি 'তথ্যের নিরাসক্ত বিশ্লেষণ' অংশে 'নিরাসক্ত' এবং 'যুক্তি-বুদ্ধি' শব্দবন্ধের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। প্রাচীন ঐতিহ্য, কিংবদন্তী, গল্পগাথা প্রভৃতিকে রাজেন্দ্রলাল আদৌ অবজ্ঞা করতেন না, কারণ তাঁর মতে ঐ সমস্ত জিনিসের মধ্যে ইতিহাসের উপাদানের সন্ধান পাওয়া সম্ভব, বিশেষত যে-সমাজের মধ্যে তাদের জন্ম ও বিবর্ধন, সেই সমাজের চেহারা পেতে তাদের সাহায্য অনস্বীকার্য। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি উড়িষ্যার মাদলাপঞ্জীর প্রতি অনেকখানি আস্থাবান ছিলেন এবং পুরীর মন্দির সম্পর্কে পুরী স্কুলের হেডমাস্টার ক্ষীরোদচন্দ্র রায়কে লেখা চিঠির এক জায়গায় বলছেন: 'আমার মতে লাঙ্গুলীয় নরসিংহই বর্তমান মন্দিরের নির্মাতা। এবং তাঁহার সময় হান্টার সাহেব নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ঐ নির্দেশের মূল মাদলা পাঁজী এবং তৎকালের মাদলা পাঁজী অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য।'[২] প্রাচীন ঐতিহ্য, কিংবদন্তী ইত্যাদি যে একেবারে মূল্যহীন নয়, তা পরে সপ্রমাণ হয়েছে যদিচ তারা প্রধানত সমর্থক উপাদানের মূল্যেই বিশিষ্ট। আশ্চর্য এই, সেকালের অনেক দেশপ্রেমী লেখকের মতো তিনি কখনও ঐসব কিংবদন্তী গল্পগাথাকে অভ্রান্ত তথ্য বা ইতিহাস রচনার প্রাথমিক উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেননি। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তিনি তাদের বিশ্লেষণ করে তা থেকে বুদ্ধিগ্রাহ্য উপাদান সংগ্রহ করে অন্যবিধ আকরলব্ধ তথ্যের

---

১ রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে ফার্গুসনের বিতর্ক তাঁর *The Antiquities of Orissa*-র প্রথম খণ্ডে এবং *Indo-Aryans*-এর প্রথম খণ্ডে পাওয়া যাবে। ফার্গুসন পরে রাজেন্দ্রলালের মত মেনে নিয়ে বলেছিলেন Indians knew the use of stone and did use it in the construction of walls and plinths and bridges before the time of Alexander.

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র' (সাহিত্যসাধক চরিতমালা, তৃতীয় খণ্ড) পুস্তিকার ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সঙ্গে মিলিয়ে কাজে লাগাবার প্রয়াস পেয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি দেশপ্রেমের উপরে ইতিহাস ও ইতিহাস-সত্যকে স্থান দিয়েছেন। সেই কারণেই জেমস প্রিন্সেপের মতো প্রাজ্ঞ জন যখন সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে পালি গল্পগাথাকে বিশ্বাস্য ও ইতিহাসের অপরিহার্য উপাদানরূপে স্বীকার করে মন্তব্য করেন :

...if the rationality of a story be a fair test of its genuineness, which few will deny, the Pali record will here bear away the palm.

তখন রাজেন্দ্রলাল তাদের 'legendary and full of romantic fables' রূপে বর্ণনা করে বলেন :[১]

Plausibility is no proof in law, nor can it be its history. If we admit the reverse of the position, we have to accept all the society novels and stories of the day as history.

সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে রাজেন্দ্রলাল একালের ইতিহাসব্রতীদের কাছে হয়তো নামমাত্র। রাজেন্দ্রলালের রচনায় ত্রুটি নির্ণয়, তাঁর কোন কোন সিদ্ধান্তের অসারতা প্রতিপাদন আজ হয়তো দুঃসাধ্য নয়। তাঁর সময় থেকে ভারতবিদ্যা তথ্যে তত্ত্বে প্রয়োগপদ্ধতিতে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। ভারতবিদ্যার এই প্রগতি দর্শনের জন্য রাজেন্দ্রলাল যদি পুনর্বার জন্ম নিতেন, তা হলে তিনি নিজেই উনিশ শতকের রাজেন্দ্র-লালের সমালোচনায় তৎপর হয়ে নতুন করে উড়িষ্যার বা বুদ্ধগয়ার ইতিহাস লিখতেন। সেই সঙ্গে তিনি নতুন তথ্যের আলোকে ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টিতে রচিত সিদ্ধান্তের নির্ভুল প্রতিষ্ঠায় পরিতৃপ্ত হতেন। জানি, রাজেন্দ্রলালের সেই সব নির্ভুল সিদ্ধান্তকে কেউ কেউ সমাপতন বলে পাশ কাটাতে চাইবেন, কিন্তু এক হিসাবে পৃথিবীর প্রায় সব উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারও কোন-না-কোনভাবে সমাপতন নয় কি ? সময়, পরিবেশ এবং কর্মোপাদান থেকে বিচ্ছিন্ন করে কর্মী-সাধকের বিরূপ সমালোচনা এক ধরনের অক্ষমতা। ইতিহাসচর্চার শৈশবাবস্থায় রাজেন্দ্রলালের আবির্ভাব, তথ্য-উপাদানের অপ্রতুলতার মধ্যে তাঁকে ইতিহাস রচনার রাস্তা তৈরি করে পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল। ফলত, তাঁর দোষ-ত্রুটি-স্খলন পথিকৃতের। এবং পথিকৃতের দুরূহ ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই বোধ করি তিনি 'বুদ্ধগয়া' গ্রন্থের মুখবন্ধে বলেছেন :

১ *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, পৃ. XXXVIII.

I feel myself under great obligation to my predecessors for the assistance I have derived from their researches. If in the discharge of my self-imposed tasks it has become necessary for me occasionally to question the correctness of their opinions, my object has been to serve the cause of truth, and not to find fault with them. As pioneers traversing a new and untrodden path, they had grave difficulties to overcome and mistakes and misconceptions were under the circumstances unavoidable.

মাঝে মধ্যে সন্দেহ জাগে, হয়তো রাজেন্দ্রলালের মনে কোন ক্রটিসন্ধী উত্তরপুরুষের ছায়াপাত ঘটেছিল ।

প্রাচীন সাহিত্যের সন্ধানে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

রাজেন্দ্রলালের যোগ্য শিষ্য ও সহযোগী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আমাদের ইতিহাস-চর্চায় আর-একজন বিশিষ্ট পথিকৃৎ। গুরুর মতো তিনিও প্রাচীন ও মধ্য যুগের স্বদেশবৃত্ত রচনার ভিত্তি স্থাপনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। ভারতের দূর অতীতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যয়ন উভয়ের ঈপ্সিত হলেও গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁদের সন্ধানী পন্থা ছিল কিছুটা ভিন্নমুখী : দৃষ্টিগ্রাহ্য পুরা নিদর্শনে রাজেন্দ্রলালের প্রধান আকর্ষণ, প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্গত ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক উপকরণের উদ্ধার ও গবেষণায় হরপ্রসাদ তাঁর শ্রম ও মনন নিয়োজিত করেছিলেন। ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাজেন্দ্রলাল প্রাচীন সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন নি তা নয় এবং হরপ্রসাদের পুরা সাহিত্য-সন্ধিৎসার মূলে তাঁর গুরুর প্রেরণাও অনস্বীকার্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজেন্দ্রলাল ঝুঁকলেন পাথুরে প্রমাণে আর হরপ্রসাদ অপার পুরা সাহিত্যের সংসারে সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ করতে আগ্রহী হলেন। ফলত হরপ্রসাদের আবিষ্কৃত প্রত্নস্থল আবহমান ভারতীয় সাহিত্যে বিসারিত : অশ্বঘোষের 'সৌন্দরনন্দ' ও সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত', বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা', মাণিক গাঙ্গুলির 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' এবং সর্বোপরি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের 'চর্যাপদ' আবিষ্কার করে তিনি আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে শক্ত বনিয়াদের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁর অনলস অনুসন্ধানের ফলেই বৌদ্ধ ধর্মের সহজযান কালচক্রযান প্রভৃতি পরবর্তী শাখাগুলির সম্যক জ্ঞান সম্ভব হয়েছে, চর্যাপদ আবিষ্কার করে তিনিই আমাদের বাংলা এবং আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার আদিপর্বের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছেন।

॥ দুই ॥

চব্বিশ পরগণার নৈহাটির একটি ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হরপ্রসাদের[১] জন্ম ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর। সে কালে নব্যন্যায়-চর্চার জন্য

১ হরপ্রসাদের আদি নাম ছিল শরৎনাথ, একবার কঠিন রোগ থেকে মুক্তি পাবার পর তাঁর নাম রাখা হয় হরপ্রসাদ; নামকরণের মূল হরের প্রসাদে রোগমুক্তি সংক্রান্ত বিশ্বাস।

এই ভট্টাচার্য পরিবারের টোল সুপ্রসিদ্ধ ছিল। হরপ্রসাদের পিতা রামকমল এবং অন্যতম অগ্রজ নন্দকুমার ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নন্দকুমার ছিলেন পাইকপাড়ার জমিদারদের কান্দী স্কুলের হেডপণ্ডিত। অল্প বয়সে (৮ ও ৯, এক বছরের ব্যবধানে) হরপ্রসাদ পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হারান, ফলে তাঁকে দু:খকষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্যে বিদ্যার্জন করতে হয়েছিল। তিনি এনট্রান্স পাশ করেছিলেন সংস্কৃত কলেজ থেকে, বি. এ. প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে, যথাক্রমে ১৮৭১ ও ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে। এবং ১৮৭৭ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে এম. এ. পরীক্ষাতে একাই সংস্কৃতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেছিলেন। পরবর্তী বৎসরে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ—কাটোয়ার নিকটবর্তী দেয়াসিন গ্রামের রায় কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের দ্বিতীয় কন্যা হেমন্তকুমারীর পাণিগ্রহণ। হরপ্রসাদের পুত্রকন্যাদের মধ্যে চতুর্থ পুত্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বৌদ্ধ প্রতিমাশাস্ত্রে শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতদের অন্যতম।[১]

হরপ্রসাদের কর্মজীবনের[২] সূত্রপাত হেআর স্কুলে ট্রান্সলেশান মাস্টার-এর পদ গ্রহণে ; ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুআরী থেকে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ২৪ জানুআরী পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর তিনি বিভিন্ন সময়ে লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজে ও কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক-পদে, সরকারী অনুবাদকের সহকারী পদে এবং বেঙ্গল লাইব্রেরির অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুআরী সরকার তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করেন এবং এই পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে হরপ্রসাদ প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতে এম. এ. ক্লাশ খোলার ব্যবস্থা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্সি কলেজে হরপ্রসাদের অন্যতম বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯০০ সালের ৮ ডিসেম্বর থেকে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে উক্ত পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সরকার তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রশাসনিক

১ বৌদ্ধ প্রতিমাতত্ত্বের দু'টি প্রধান উপাদানগ্রন্থ 'সাধনমালা' ও 'নিষ্পন্নযোগাবলী' সম্পাদনা করে তিনি এই তত্ত্ববিশেষের অধ্যয়নকে সহজ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত গবেষণা-গ্রন্থ দু'টি *An Introduction to Esoteric Buddhism* এবং *Indian Buddhist Iconography*, বৌদ্ধ মূর্তিতত্ত্ব অধ্যয়নে শেষোক্ত গ্রন্থটি এখনও অপরিহার্য।

২ বিস্তারিত তথ্যের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী' (সাহিত্যসাধক চরিতমালা, সপ্তম খণ্ড) পুস্তিকার ৯-১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কৃতিত্বের কথা বিবেচনা করে তাঁর উপর Bureau of Information for the benefit of Civil Officers in Bengal in history, religion, customs and folklore of Bengal নামীয় সংস্থার দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই কাজের জন্য তিনি ১৯০৯ সাল থেকে আমৃত্যু এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে মাসিক একশ টাকা বৃত্তি পেতেন। এ ছাড়া তাঁর কর্মজীবনের আর-একটি স্মরণীয় অধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক-পদে অধিষ্ঠান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এ পদে যোগদান করেন। ১৮ জুন ১৯২১ থেকে ১৯২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

॥ তিন ॥

গবেষণায় হরপ্রসাদের হাতে খড়ি রাজেন্দ্রলালের কাছে। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল তাঁকে গোপালতাপনী উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ করতে বলেন। এ কাজে হাত দিতে না পারলেও কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে রাজেন্দ্রলালের প্রত্যক্ষ সহকারীর ভূমিকায় নামতে হয়েছিল। এ সময় এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহভুক্ত নেপাল থেকে আনা বৌদ্ধ পুঁথিগুলির বিবরণমূলক তালিকা প্রণয়ন করছিলেন রাজেন্দ্রলাল, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে হরপ্রসাদ তাঁকে সাহায্য করতে অগ্রণী হন এবং মোট ১৬টি বড় পুঁথির বিষয়বস্তুর ইংরেজী অনুবাদ করে দেন। রাজেন্দ্রলাল- কৃত আলোচ্য বৌদ্ধ পুঁথিগুলির বিবরণ ও পর্যালোচনা ১৮৮২ সালে *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* নামে প্রকাশিত হয় এবং এই বইয়ের ভূমিকায় লেখক তরুণ হরপ্রসাদের সংস্কৃতে অধিকার এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিতির প্রশংসা করে গেছেন।[১] পরবর্তী কালে পুঁথিসংগ্রহ ও পুঁথির বর্ণনাত্মক সূচিসংকলনের কাজে হরপ্রসাদ যে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন রাজেন্দ্রলালের নির্দেশনা ও সাহচর্যে তার উৎসভূমি নিহিত। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে রাজেন্দ্রলালের দেহান্তর ঘটলে এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষ তাঁকে পুঁথি সংগ্রহকার্যের পরিচালক নিযুক্ত করেন এবং সেই থেকে প্রায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি অসংখ্য প্রাচীন পুঁথি বিস্মরণের হাত থেকে রক্ষা করে গেছেন।[২] শুধু তাই নয়, 'সৌন্দরনন্দ', 'রামচরিত',

১ গ্রন্থের সূচিপত্রে হরপ্রসাদের অনূদিত অংশগুলির পুঁথিসংখ্যার পাশে H. P. S. আদ্যক্ষর আছে।

২ রাজেন্দ্রলালের *Notices of Sanskrit Manuscripts*-এর দশম খণ্ডের প্রথম

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' প্রভৃতি পুঁথিগুলি উদ্ধার করে তিনি আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির দিগন্তকে প্রসারিত করেছেন। ভাষান্তরে, প্রাচীন সাহিত্যের সন্ধানের সূত্রে তিনি আবিষ্কার করেছেন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির একাধিক অজ্ঞাতপূর্ব অধ্যায়। গবেষক হিসাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মূল কৃতিত্ব এইখানেই। তাঁর বিশিষ্ট ও স্মরণীয় গ্রন্থগুলি প্রাচীন পুঁথির সম্পাদিত এবং / অথবা অনূদিত রূপ। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : অশ্বঘোষের 'সৌন্দরনন্দ' (১৯১০), সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' (১৯১০) 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' (১৯১৬) এবং বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা' (১৯২৫)।

পুঁথিসংগ্রহের কাজে হরপ্রসাদকে শুধু ভারতের বিভিন্ন জায়গাতেই নয়, নেপালের মতো অপেক্ষাকৃত দুর্গম প্রদেশেও যেতে হয়েছিল। নেপালের বিখ্যাত দরবার লাইব্রেরিতে তিনি প্রথম শতকের কবি ও মনীষী অশ্বঘোষের 'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্যের দ্বাদশ শতকের নেপালী বা নেওয়ারী হরফে লেখা একটি জীর্ণ তালপাতার পুঁথি আবিষ্কার করেন। পরে এশিয়াটিক সোসাইটির *Bibliotheca Indica* গ্রন্থমালায় তিনি এটি তথ্যপূর্ণ ভূমিকাসহ প্রকাশ করেন (১৯১০)।[১] ভূমিকাতে তিনি একটি অজ্ঞাতপূর্ব সংবাদ দিলেন, 'সৌন্দরনন্দ' এক সময় বাংলাদেশে জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর সম্পাদিত সংস্করণটি বেরোবার পর বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।

নেপালের দরবার লাইব্রেরিতে হরপ্রসাদের আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বাঙালী কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর সংস্কৃত কাব্য 'রামচরিত'। এ কাব্যের পুঁথিও তালপাতায় লেখা, তবে হরফ নেওয়ারী নয়, দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলা লিপি। পুঁথিতে মূল কাব্যের সঙ্গে অসম্পূর্ণ টীকাও সংযুক্ত (সম্পূর্ণ প্রথম পরিচ্ছেদের এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩৫টি শ্লোকের টীকা, শাস্ত্রীমশায় ভ্রমবশত ৩৬টি বলেছেন), টীকার লিপি সামান্য পরবর্তী কালের, আনুমানিক ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধের। চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই চরিতকাব্যের নায়ক প্রসিদ্ধ পাল নরপতি রামপাল (১০৭৭-১১৩০),

ভাগ বেরোয় ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে। ১৮৯২ সালে এই খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় হরপ্রসাদের সম্পাদনায়। তিনি *Notice*-এর দশ খণ্ডের সূচিও প্রকাশ করেছিলেন (১৮৯৫)।

১ ১৯৩৯ সালে অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী অধিকতর তথ্যসহ বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।

যদিও কবি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর রচনাটিকে স্বীয় পৃষ্ঠপোষক রামপালের পুত্র মদনপাল (১১৪৫-৬১।৬২)-এর রাজত্বকাল পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর সব উক্তি সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য না হলেও এ কথা অনস্বীকার্য একাদশ শতকের শেষার্ধ ও দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলাদেশের ইতিহাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে 'রামচরিত' অত্যন্ত মূল্যবান আকরগ্রন্থের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়া সাহিত্যিক মূল্যেও এই চরিতকাব্যটি সমৃদ্ধ। সংস্কৃত 'শ্লেষ' অলংকারের বিশিষ্ট উদাহরণ হিসাবে 'রামচরিত' পণ্ডিতমহলে সমাদৃত : এর শ্লোকগুলিতে এক পক্ষে দশরথ-পুত্র রামচন্দ্রের এবং অন্যপক্ষে গৌড়াধীশ রামপালের চরিতকথা বর্ণিত হয়েছে। 'রামচরিতে'র টীকা থেকেও পাল বংশের ইতিহাসের কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। সংক্ষেপে, 'রামচরিত' আবিষ্কার করে হরপ্রসাদ আমাদের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে একটি তথ্যভূয়িষ্ঠ ভূমিকাসহ তিনি এই মূল্যবান চরিতকাব্য এশিয়াটিক সোসাইটির *Memoirs* গ্রন্থমালায় প্রকাশ করেন।[১]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার চর্যাপদ এবং শিক্ষিত বাঙালীসমাজে প্রধানত এজন্যই তিনি প্রসিদ্ধ ও স্মরণীয়। এ আবিষ্কারের উৎসভূমিও নেপালের দরবার লাইব্রেরি। এই গ্রন্থাগার থেকে তিনি যে-চারখানা প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করে আনেন তার একটিতে বিভিন্ন পদ-কর্তার রচিত সাড়ে ছেচল্লিশটি গান পাওয়া যায়। খণ্ডিত এই পুঁথির সূচনার একটি সংস্কৃত শ্লোক থেকে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামটির আভাস পেয়ে শাস্ত্রী-মশায় পুঁথির ঐ নামকরণ করেন (মতান্তরে যথার্থ নাম 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়')। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের গূঢ় সাধন-পদ্ধতি চর্যাগীতিগুলির উপজীব্য, এ সব গানে শব্দের বাচ্যার্থের এক অর্থ, গুহ্যার্থের আর-এক অর্থ, শব্দের গুহ্যার্থের মধ্যে সাধন-পদ্ধতি অভিব্যক্ত। ফলত এদের সাহিত্যিক আকর্ষণ অযথেষ্ট, কিন্তু বাংলা ভাষার প্রাচীনতম রূপের নিদর্শন হিসাবে এদের মূল্য অসাধারণ। একাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত চর্যাগীতিগুলির সঙ্গে হরপ্রসাদের আবিষ্কৃত বাকি তিনটি পুঁথি হলো : 'সরোজবজ্রের

১ শাস্ত্রীমশায় সম্পাদিত সংস্করণে শ্লোকের অনুবাদ নেই। ১৯৩৯ সালে রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাধাগোবিন্দ বসাক এবং ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজী অনুবাদসহ 'রামচরিতে'র একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে রাধাগোবিন্দ বসাক শাস্ত্রীর ভুল-ত্রুটি সংশোধন এবং স্বীয় টীকা-টিপ্পনী ও নূতন তথ্য সংযোজন করে আর-একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন।

দোহাকোষ', 'কাহ্নপাদের দোহাকোষ' এবং 'ডাকার্ণব'। চর্যাগানগুলির পুঁথিসহ মোট এই চারখানি পুঁথি তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' (সংক্ষেপে 'বৌদ্ধ গান ও দোহা') নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। এই চারখানি পুঁথির ভাষাকেই তিনি বাংলা বলে অনুমান করেছিলেন, সাধারণভাবে এ অনুমান গ্রহণীয় হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে 'দোহাকোষ' ও 'ডাকার্ণব'-এর ভাষা অবহট্‌ঠ। যাই হোক, চর্যাগীতিনিচয় আবিষ্কার করে হরপ্রসাদ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সূচনাপর্বের (তথা আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার) ইতিহাস উদ্ধার করে তাঁর কাছে আমাদের ঋণী করে গেছেন।

বিদ্যাপতি রচিত 'কীর্ত্তিলতা'র নেওয়ারী পুঁথির আবিষ্কার ও সম্পাদনা হরপ্রসাদের আর-একটি বিশিষ্ট গবেষণা-নিদর্শন। পুঁথির প্রাপ্তিস্থান পূর্বোক্ত দরবার লাইব্রেরি।[১] অবহট্‌ঠ ও মিশ্র মৈথিলে রচিত এই কাব্যগ্রন্থখানি শাস্ত্রীমশায় বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করেছিলেন, বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদসহ।[২] ভাষাতাত্ত্বিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্যে সমৃদ্ধ 'কীর্ত্তি-লতা' কাব্যগ্রন্থের স্ব-সম্পাদিত সংস্করণের মুখবন্ধে তিনি বিদ্যাপতি সম্পর্কে কয়েকটি নূতন কথা বলেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, লোকপ্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে তাঁর অভিমত :[৩] 'বিদ্যাপতি কিন্তু সহজিয়া ছিলেন না। তিনি মিথিলা, বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের ব্রাহ্মণের ন্যায় স্মার্ত্ত ও পঞ্চোপাসক ছিলেন, অর্থাৎ স্মৃতির ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেন এবং গণেশ, সূর্য্য, শিব, বিষ্ণু ও দুর্গা এই পঞ্চদেবতার উপাসনা করিতেন।...গঙ্গার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল।...তিনি যেমন কৃষ্ণরাধার প্রেমের অনেক পদ লিখিয়া গিয়াছেন, তেমনি শিব ও গঙ্গার বিষয়ে অনেক পদ লিখিয়া গিয়াছেন।' বিদ্যাপতি সম্পর্কে হরপ্রসাদের দ্বিতীয় মূল্যবান উক্তি :[৪]

১ এই লাইব্রেরিতে তিনি বিদ্যাপতির 'কীর্ত্তিপতাকা' নামে আর-একটি কাব্যের পুঁথির সন্ধান পান। তালপাতায় টানা মৈথিল অক্ষরে লেখা প্রাচীনতর এই পুঁথিটি তিনি পড়ে উঠতে পারেন নি।

২ পরে শ্রীযুক্ত বাবুরাম সাকসেনা ও শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ সিংহের সম্পাদনায় আরও দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, যথাক্রমে ১৯২৯ ও ১৯৫৫ সালে। আচার্য সুনীতিকুমার সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে।

৩ 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী', দ্বিতীয় সম্ভার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, (কলিকাতা, ১৯৬০) পৃ. ২২০।

৪ তদেব, পৃ. ২৩৭।

'তিনি শুদ্ধ কবি ছিলেন না। ঐতিহাসিক ছিলেন, রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন এবং অন্নভোগী রাজাদিগের যে বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল, তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া সেই কার্য্যটা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। সেটি মুসলমান-বিধ্বস্ত সমাজের পুনর্গঠন ও হিন্দু ধর্ম্মের পুনঃ-প্রচার। তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গীতও তাঁহাকে সে বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের সম্প্রদায়গুলি তিনি চৌচাপটে ফের গড়িতে চাহিয়াছিলেন ; সুতরাং কৃষ্ণপ্রেম তিনি কিছুতেই ছাড়িতে পারেন নাই।'

হরপ্রসাদের আবিষ্কৃত এবং / অথবা সম্পাদিত অন্যান্য পুঁথি ও গ্রন্থগুলিতেও তাঁর অনুসন্ধানী মনের ও সম্পাদনা-কৃতিত্বের পরিচয় অল্পবিস্তর প্রকাশিত। অসংক্ষিপ্ত এই গ্রন্থতালিকার অন্তর্ভুক্ত : 'বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ' (১৮৮৮-৯৭), 'বৃহৎস্বয়ম্ভূপুরাণ' (১৮৯৪-১৯০০), আনন্দভট্টের 'বল্লালচরিত' (১৯০৪), মাণিক গাঙ্গুলি বিরচিত 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' (দীনেশচন্দ্র সেনের সহযোগিতায়, ১৩১২ বঙ্গাব্দ), 'শ্যৈনিকশাস্ত্র' (ইংরেজী অনুবাদসহ ১৯১০), রত্নকীর্তি. রত্নাকরশান্তি প্রমুখ বৌদ্ধ পণ্ডিতদের রচনাসংগ্রহ *Six Buddhist Nyaya Tracts* (১৯১০), আর্যদেবের 'চতুঃশতিকা' (১৯১৪), 'অদ্বয়-বজ্রসংগ্রহ' (১৯২৭) এবং কাশীরাম দাসের 'মহাভারত'-এর আদিপর্ব (১৯২৮)। 'চতুঃশতিকা' এবং *Six Buddhist Nyaya Tracts* বৌদ্ধ দর্শনের এবং 'অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ' বজ্রযান বৌদ্ধ ধর্মের তত্ত্বকথা, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য অপরিহার্য। 'বৃহৎস্বয়ম্ভূপুরাণ' থেকে বৌদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত তথ্য ছাড়াও নেপালের ভূগোল সম্পর্কিত কিছু কিছু সংবাদ জানা যায়। কাশীরামের মহাভারতের সংস্করণের ভূমিকাতে তিনি কিছু নূতন কথা বলেছেন।

এ সূত্রে হরপ্রসাদ-কৃত এশিয়াটিক সোসাইটির বিপুল ও মূল্যবান পুঁথিসংগ্রহের *Descriptive Catalogue* বা বিস্তৃত বিবরণী অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। সাত খণ্ডে প্রকাশিত এই বিবরণাত্মক তালিকা হরপ্রসাদের অসাধারণ কীর্তিরূপে পরিগণিত হবার যোগ্য। এই বিবরণীগুলি (তিনি

১ এই বিবরণীগুলির বিভিন্ন খণ্ডের বিষয়সূচি : প্রথম খণ্ড (১৯১৭)—বৌদ্ধ দর্শন ও সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯২৩)—বৈদিক সাহিত্য, তৃতীয় খণ্ড (১৯২৫)—স্মৃতি, চতুর্থ খণ্ড (১৯২৩)—ইতিহাস ও ভূগোল, পঞ্চম খণ্ড (১৯২৮)—পুরাণ, ষষ্ঠ খণ্ড (১৯৩১)—ব্যাকরণ, সপ্তম খণ্ড (১৯৩৪)—কাব্য, অষ্টম খণ্ড (১৯৪০)—তন্ত্র। এদের মধ্যে সপ্তম খণ্ডের প্রুফ তিনি দেখেছিলেন ; মূলত তাঁর টীকা-টিপ্পনী ও তথ্যের উপর নির্ভর করে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী তন্ত্রবিষয়ক অষ্টম খণ্ডটি প্রস্তুত করেন।

সম্পূর্ণ সংগ্রহের তালিকা শেষ করে যেতে পারেন নি) পরবর্তী গবেষকদের অসীম সাহায্য ও অনুপ্রেরণা দিয়েছে। ১৯০৭-৮ সালে তিনি যখন পুঁথিগুলির বিবরণমূলক তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন সোসাইটির পুঁথির সংখ্যা ১১, ২৬৪ এবং এগুলির মধ্যে ৩১৫৬ খানি রাজেন্দ্রলালের, বাকি ৮১০৮ খানি তাঁর একার সংগৃহীত। এখানে বলা দরকার, সংখ্যার বিচারে একক প্রচেষ্টায় দুর্লভ ও প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে হরপ্রসাদ এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর সংগৃহীত পুঁথিগুলির মধ্যে এমন কিছু নিদর্শন আছে, যেগুলির প্রাচীনত্ব নবম শতাব্দী পর্যন্ত টানা যেতে পারে। আলোচ্য বিবরণীগুলি ছাড়া তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে পুঁথিসংগ্রহ-অভিযান সংক্রান্ত যে সমস্ত Report বা প্রতিবেদন এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষকে দিয়েছিলেন সেগুলিও তথ্যমূল্যে বিশিষ্ট। নেপাল দরবার লাইব্রেরিতে তাঁর অভিজ্ঞতার ফসল দু খণ্ডে প্রকাশিত *Catalogue of Palm-leaf and Selected Paper Manuscripts belonging to the Darbar Library, Nepal* (প্রথম খণ্ড, ১৯০৫ ; দ্বিতীয় খণ্ড ১৯১৫)। প্রতিবেদনগুলি হলো : *Report on the Search of Sanskrit Manuscripts* (১৯০১, ১৯০৫, ১৯১১) ; *Preliminary Report on the Operation in Search of Manuscripts of Bardic Chronicles* (১৯১৩) ; এবং *Report on a Tour in Western India in Search of Manuscripts of Bardic Chronicles* (১৯১৩)। কলকাতার বিশপস কলেজ লাইব্রেরির সংগ্রহেরও একটি তালিকা তিনি তৈরি করেছিলেন বলে জানা যায় ; এটি *Catalogue of Manuscripts in the Bishops College Library, Calcutta* নামে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

প্রাচীন পুঁথি সন্ধানের সূত্রে প্রাচীন লেখমালাতেও হরপ্রসাদ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সংখ্যায় যথেষ্ট না হলেও তিনি কয়েকটি মূল্যবান অভিলেখের পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনা এবং / অথবা আলোচনা করেছিলেন। এগুলির মধ্যে শুশুনিয়া (বাঁকুড়া জেলা) পর্বতগাত্রের মহারাজা চন্দ্রবর্মনের লেখ,[১] মান্দাসোর (মধ্যপ্রদেশস্থ, প্রাচীন দশপুর)-এ প্রাপ্ত নরবর্মনের সময়কালীন ৪৬১ মালব সংবৎসরের (৪০৪ খ্রীস্টাব্দ) লেখ,[২] তেজপুর (আসামস্থ) শিলালেখ,[৩] খণ্ডদেউলির (উড়িষ্যা) রণভঞ্জদেবের লেখমালা,[৪] দিল্লীর

১ *Epigraphia Indica*, XIII.
২ *Ibid.*, XII.
৩ *Journal of the Bihar and Orissa Research Society*, 1917.
৪ *Ibid.*, 1918.

কাছে মেহ্‌রৌলি গ্রামের লৌহস্তম্ভে উৎকীর্ণ চন্দ্র নামীয় রাজার লেখ,[১] কলিঙ্গ ও কোশলের মহাশিবগুপ্ত ও মহাভবগুপ্তের লেখচতুষ্টয়[২] এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত সেনবংশীয় বিশ্বরূপসেনের তাম্রপট্ট[৩] উল্লেখযোগ্য। লেখচর্চার সূত্রে স্বভাবতঃই তিনি লিপিতত্ত্বে মনোযোগী হয়েছিলেন এবং 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় (১৩২৭) 'বাঙ্গালার পুরাণ অক্ষর' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

॥ চার ॥

ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই, বিশেষত বাংলাতে, হরপ্রসাদ প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে অসংখ্য গবেষণা-নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাঁর মাতৃভাষায় রচিত বহু প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত হালকা চালে লেখা, বিশেষত কিছু প্রবন্ধের শিরোনামে 'চমকদার সাংবাদিক সুলভ মনোভাব ও পদ্ধতি'র প্রকাশ ঘটেছে বলে কারো কারো অভিযোগ। ইংরেজী প্রবন্ধে সে ধরনের লঘু সুরের অনুপস্থিতি দেখে অনুমান করা যেতে পারে, অভিযুক্ত বাংলা নিবন্ধগুলি শাস্ত্রীমশায় সাধারণ শিক্ষিত পাঠকদের কথা মনে রেখেই লিখে-ছিলেন, অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁদের কৌতূহল জাগানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। যাই হোক, তাঁর ইংরেজী ও বাংলা পুস্তিকা ও প্রবন্ধগুলির হিসাব-নিকাশ নিলে দেখা যাবে প্রধানত তিনটি বিষয়ের অধ্যয়নে তিনি অধিকতর মনোযোগী ছিলেন; (১) বৌদ্ধ- ধর্ম, সাহিত্য- ও দর্শন (বিশেষত বৌদ্ধ ধর্মের বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি পরবর্তী শাখা-সম্প্রদায়গুলি সম্পর্কিত বিষয়); (২) প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং (৩) সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষভাবে কালিদাসের রচনাবলি। বৌদ্ধ পুঁথি সন্ধানের সূত্রে তিনি এই ধর্মের অন্ত্যপর্বের বহু অজ্ঞাতপূর্ব সংবাদ পেলেন এবং বৌদ্ধ পুঁথির বিবরণীর ('বিবরণী'র প্রথম খণ্ড) ভূমিকায় তিনি মন্তব্য করলেন, এই সব পুঁথি না পেলে বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি মহাযানী বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ক্রমবিকাশের স্তরে উদ্ভূত বিভিন্ন শাখাগুলি শুধুমাত্র নামেই আমাদের কাছে পরিচিত থেকে যেত। অর্থাৎ এসব শাখার তত্ত্ব-তথ্য-

১ *Indian Antiquary*, XII

২ *Journal of the Asiatic Society of Bengal*. 1902

৩ *Indian Historical Quarterly*, 1926.

ইতিহাস আমরা জেনেছি সংগৃহীত প্রাসঙ্গিক পুঁথিপত্র থেকে। বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন দিক ও নানা পর্যায়ী ইতিহাস নিয়ে তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধ লিখেছেন, ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই। ১৩২১-২৪ বঙ্গাব্দে চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক রচনাবলি (পরে ১৯৪৮ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত,) ১৩২৪ বঙ্গাব্দে 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত 'বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম', 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় যথাক্রমে ১৩৩১ ও ১৩৩৬ সালে প্রকাশিত 'হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ' এবং 'বাঙ্গালার বৌদ্ধ সমাজ' এবং *Buddhists in Bengal* (*Dacca Review*-তে প্রকাশিত) *Discovery of Living Buddhism in Bengal* (১৮৯৭) শীর্ষক নিবন্ধগুলিকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি হরপ্রসাদের অনুরাগের বিশিষ্ট দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যায়। আর্যদেবের 'চতুঃশতিকা' ও *Six Buddhist Nyaya Tracts* সম্পাদনাতেও সে অনুরাগের পরিচয় স্পষ্ট। হরপ্রসাদের যুগান্তকারী আবিষ্কার চর্যাপদগুলি যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সূচনাপর্বের ইতিহাসকে শক্ত জমির উপর দাঁড়াতে সাহায্য করেছে, এখানে পুনরুক্তির সুরে সে কথা স্মরণীয়, এবং এই আবিষ্কারের সূত্রে তাঁর মনোযোগ বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য পর্বেও বিস্তৃত হয়। এর প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করি, মাণিক গাঙ্গুলির 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' ও কাশীরাম দাসের 'মহাভারতে'র আদিপর্বের সম্পাদনা; রমাই পণ্ডিতের 'ধর্ম্মমঙ্গল' বিষয়ক আলোচনা ('সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', ১৩০৪), 'চণ্ডীদাস' ('সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', ১৩২৬ ও ১৩২৯) এবং *Calcutta Review*-তে প্রকাশিত *Diary of Govinda Das* ও *Bengali Buddhist Literature* প্রভৃতি নিবন্ধনিচয়। বাংলা সাহিত্যে তাঁর এই অনুরাগের মূল অবশ্য আরও গভীরে, তাঁর মানসিক গঠনে নিহিত, কারণ মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন সৃষ্টিশীল সৃষ্টিকামী সাহিত্যব্রতী, আজীবন বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় লালিত, ফলত চর্যাপদের আবিষ্কার তাঁর সেই মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মৌল আকর্ষণের বিবর্ধনে সহায়ক হয়েছিল মাত্র। এবং শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নন, তাঁর বহু পূর্ববর্তী মহাকবি কালিদাস হরপ্রসাদকে ছাত্রাবস্থাতেই আবিষ্ট করেছিলেন। হরপ্রসাদ ছিলেন কালিদাসের একান্তিকী ভক্ত, কালিদাস সম্পর্কে লেখার সুযোগ তিনি কখনই ছাড়তেন না এবং কালিদাস-আলোচনায় বাঙালী লেখকদের মধ্যে তাঁর স্থান প্রথম সারিতে। আর সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্ম বলে সাধারণভাবে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। সংস্কৃত-সচেতনতা যে আমাদের চিত্তের ও জাতীয় সত্তার বিকাশে বিশেষ সহায়ক

একথা তিনি বিভিন্ন সময়ে তাঁর দেশবাসীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এ সূত্রে তাঁর *The Educative Influence of Sanskrit* (১৯১৬) *Sanskrit Culture in Modern India* (১৯২৮), বা *Calcutta Review*-তে প্রকাশিত *Sanskrit Learning in India* (১৯০৩) প্রভৃতি রচনাগুলি পঠনীয়। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই, অসামান্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও তিনি কখনও তাঁর বাংলা রচনাশৈলীকে সংস্কৃত-সংকুল করেন নি ('কাঞ্চনমালা'র মতো প্রথম জীবনের দু-চারটা রচনা বাদ দিয়ে), তাঁর মতো বাংলাভাষার নিজস্ব রূপ-চারিত্র্য ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে সচেতন লেখক একালেও বিরল।

॥ পাঁচ ॥

হরপ্রসাদের মন ছিল সাহিত্যের সুরে বাঁধা, সে জন্য মাঝে মাঝে তিনি গবেষণার ধূসর পাণ্ডুলিপি ছেড়ে কল্পনার নীল আকাশে মুক্তি পেতে চাইতেন। সেই ইচ্ছারই প্রত্যক্ষ প্রকাশ তাঁর দুটি উপন্যাস 'কাঞ্চনমালা' (১২৮৯ আষাঢ়-মাঘ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত, পুস্তকাকারে প্রকাশের তারিখ ২০ ফেব্রুআরী ১৯১৬) এবং 'বেণের মেয়ে' (১৩২৫ কার্তিক— ১৩২৬ অগ্রহায়ণ 'নারায়ণে' প্রকাশিত, পুস্তকাকারে ২ ফেব্রুআরী ১৯২০ সালে প্রকাশিত)। ঐতিহাসিক উপন্যাস বা সাহিত্যকৃতি হিসাবে 'কাঞ্চনমালা' দুর্বল হলেও 'বেণের মেয়ে' নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট ও রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি। সম্রাট অশোকের পুত্র কুণাল ও তাঁর স্ত্রী কাঞ্চনমালার দুঃখসুখের কাহিনী 'কাঞ্চনমালা'র উপজীব্য; একাদশ শতকের সপ্তগ্রামে (হুগলী জেলায়) একটি বেনের মেয়েকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও বৌদ্ধদের সংঘর্ষ এবং পরিণামে হিন্দুদের জয় দ্বিতীয় উপন্যাসের বিষয়বস্তু। দু'টি উপন্যাসেই, বিশেষত 'বেণের মেয়ে'-তে, হরপ্রসাদ ইতিহাসের কঙ্কালে রক্তমাংসের সঙ্গে প্রাণের সঞ্চার করতে পেরেছেন। মাত্র দু'টি উপন্যাস লিখেই হরপ্রসাদ থেমে গিয়েছিলেন, গবেষণার চাপে হয়তো সাহিত্য-সৃষ্টি আর বিশেষ করতে পারেন নি, কিন্তু 'বেণের মেয়ে'র স্রষ্টা যে অনায়াসে কৃতী সাহিত্য-শিল্পী হতে পারতেন তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। তবে তিনি সাহিত্যকর্মে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন তাঁরই ছাত্র ও পরবর্তী কালের বিশিষ্ট গবেষক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে। গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাখালদাস অন্যূন সাতটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন। ইতিহাসের মূল কাঠামোকে যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে হরপ্রসাদ ও রাখালদাস ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার আদর্শ স্থাপন করেছিলেন এবং এক্ষেত্রে তাঁরা এ কালের শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বসূরি, যদিও

শরদিন্দু প্রাথমিকভাবে সাহিত্যিক হওয়ায় তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস অধিকতর সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি হরপ্রসাদের অকৃত্রিম অনুরাগ তাঁর উপন্যাস ছাড়া অসংখ্য সাধারণ ও গবেষণাধর্মী রচনাতেও বাঙময়। মাতৃ-ভাষায় ইতিহাসচর্চাকে তিনি অন্যতম কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন এবং এ ক্ষেত্রেও তিনি পরবর্তীদের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র তিন-চতুর্থাংশ রচনা তো বাংলা ভাষাতেই লেখা এবং মুদ্রাতত্ত্বের মতো দুরূহ বিষয় নিয়ে রাখালদাস লিখেছিলেন 'প্রাচীন মুদ্রা'। শুধু বাংলা ভাষায় লেখনী চালনা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি হরপ্রসাদ, মাতৃভাষার গঠনপ্রণালী বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছিলেন সমসাময়িক ও পরবর্তীদের। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও সধর্মীদের মতো তিনি সংস্কৃত-সংকুল বাংলা লেখার বিরোধী ছিলেন, অন্যপক্ষে ইংরেজী-পীড়িত বাংলা বাগ্‌ভঙ্গীর তিনি ছিলেন তীব্র সমালোচক।[১] কৃত্রিম বাগ্‌ভঙ্গী বা প্রকাশ-ভঙ্গী ছিল তাঁর কাছে দুঃসহ, ভাষাবিশেষের শব্দাবলির প্রতি তিনি বিরূপ ছিলেন না। তাঁর মতে 'যাহা চলিত, তাহা ইংরাজীই হউক, পারসীই হউক, সংস্কৃতই হউক—চলুক। তাহাকে বদলাইয়া শুদ্ধ সংস্কৃত করিবার দরকার নাই। 'রেলওয়ে'কে 'লৌহবর্ত্ম' করিয়া লইবার প্রয়োজন নাই।... চিত্রশালিকা বলিলে ছবির ঘর বুঝায়, সুতরাং মিউজিয়াম বুঝাইল না। এ জায়গায় 'মিউজিয়াম' শব্দ লইতে দোষ কি?' নিজে সংস্কৃতে পণ্ডিত হয়েও একবার পরিহাসের সুরে বলেছিলেন, 'বেশী সংস্কৃতওয়ালা বাঙ্গলা বই পোকাতেই কাটে!'

সর্বোপরি, হরপ্রসাদ সে যুগে—১২৮৭ বঙ্গাব্দে—বলেছিলেন, মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত। ইংরেজ আমলে প্রচলিত উচ্চশিক্ষার গলদ তিনি ধরতে পেরেছিলেন এবং আমাদের বর্তমান শিক্ষাক্রমেও সে গলদ সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নি। এ প্রসঙ্গে তিনি সে দিন যা বলেছিলেন একালের

১ ইংরেজী-পীড়িত বাংলার দৃষ্টান্ত হিসাবে হরপ্রসাদ যে-উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে তাঁর ব্যঙ্গনিপুণতার পরিচয় মেলে। প্রাসঙ্গিক এই উদ্ধৃতি: 'আমি ল্যাণ্ডো গাড়ীতে ড্রাইভ করিতে করিতে হাওড়া ষ্টেশনে পঁহুছিয়া বেনারসের জন্য বুক করিলাম। ফার্ষ্ট ক্লাসে লোয়ার বার্থ ভেকাণ্ট ছিল না, আপার বার্থে বেডিঙটা স্প্রেড করিয়া একটু সর্ট ন্যাপ দিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় হুইসিল দিয়া ট্রেণ ষ্টার্ট করিল।' একালের ক্রমবর্ধমান ইঙ্গ-বঙ্গীয় বাগ্‌ভঙ্গির সঙ্গে পরিচয় ঘটলে হরপ্রসাদ কি বলতেন ভাবতে ইচ্ছা করে।

শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কেও তা সমান প্রযোজ্য। আমাদের শিক্ষাশাস্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্যে আমি তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যের একটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দিচ্ছি :[১] 'ইংরেজী ভাষা শিক্ষা কর, ভাল করিয়াই শিক্ষা কর। ইংরেজীতে অঙ্ক কসিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান শিখিতে হইবে ইহার অর্থ কি ? বাঙ্গালা দিয়া ইংরেজী শিখ না কেন ? ... যেরূপ চলিতেছে ইহাতে জ্ঞান অল্প হয়, ইংরেজী শিক্ষা অল্প হয় আর পরিশ্রম অনন্ত করিতে হয়। আর শিক্ষিতদিগের সহিত অশিক্ষিতের মনোমিল থাকে না ; শিক্ষিতগণ যেন একটি নূতন জাতি হইয়া দাঁড়ান।...যাও বা শিখি তাহাও শিখিবার জন্য শিখি না ; জ্ঞান অর্জনের জন্য শিখি না। শিখি এক্‌জামিন পাশ করিবার জন্য। ... অতএব লেখাপড়ার যে উদ্দেশ্য—মনোবৃত্তি নিচয়ের সম্যক স্ফূর্তি—তাহা একেবারেই হয় না।'

॥ ছয় ॥

আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির গবেষণায় হরপ্রসাদের অনুসন্ধানের প্রধান ক্ষেত্র ছিল প্রাচীন সাহিত্যগ্রন্থ এবং অপ্রকাশিত পুঁথিপত্র। আগেই বলেছি, এ ব্যাপারে তিনি পথনির্দেশ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন রাজেন্দ্রলালের কাছ থেকে এবং গুরুর মাধ্যমে প্রাচীবিদ্যা-চর্চার পীঠস্থান এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার পর থেকে তাঁর গবেষণার ধারা জোয়ারের ঐশ্বর্যে প্রবাহিত হতে শুরু করে। সাহিত্য-গবেষণা ও সাহিত্য-সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর উপর সর্বাধিক প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের।[২] রাজেন্দ্রলাল ছিলেন তাঁর ইতিহাসগুরু, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যগুরু।' মানসিকতাতেও তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটতম প্রতিবেশী, বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে দুজনেরই আকর্ষণ ও অনুসন্ধিৎসা ছিল অসাধারণ। হর-

১ 'বঙ্গদর্শন', ভাদ্র ১২৮৭।

২ হরপ্রসাদের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবের একটি উদাহরণ 'কাঞ্চনমালা'। পুত্র বিনয়তোষকে তিনি একবার বলেছিলেন, বঙ্কিমবাবুর ভাষায় 'সরু মোটা খেলে', অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র একই সঙ্গে গুরুগম্ভীর সমাসবহুল সংস্কৃত শব্দাবলি এবং চলতি, সহজ ও গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত। 'কাঞ্চনমালা'য় সেই আদর্শের অনুসরণ লক্ষণীয়, স্থানে স্থানে দুর্বোধ্য ও সমাসবহুল ভাষা, আবার কোথাও কোথাও সহজ, ঘরোয়া ও অতিলৌকিক ভাষা। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি বঙ্কিমী 'সরু-মোটা'র আদর্শ পরিত্যাগ করেন এবং স্বকীয় পন্থায় সহজ স্বচ্ছন্দ খাঁটি বাংলার রচনাশৈলীর প্রবর্তন করেন।

প্রসাদের প্রসিদ্ধ উক্তি 'বাঙ্গালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি' আর বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই' ; এই উভয় উক্তির মৌল স্বর-সাদৃশ্য কি নেহাতই সমাপতন ? তৃতীয় আর-একজন যাঁর প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল তিনি তাঁর সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী শিক্ষক শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। শ্যামাচরণই হরপ্রসাদকে সংস্কৃত-বিরল খাঁটি বাংলা লিখতে শিখিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি এমন বাঙ্গলা লিখিতে শিখিলে কি করিয়া', তখন তিনি জবাবে বলেছিলেন, 'আমি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি মহাশয়ের চেলা।'

॥ সাত ॥

ফিরে আসি ঐতিহাসিক ও গবেষক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রসঙ্গে। ভারতের ইতিহাস-চর্চায় রাজেন্দ্রলালের মতো হরপ্রসাদও কি অন্যতম পথিকৃতের সম্মানের যোগ্য ? আমার উত্তর সম্মতিসূচক। তাঁর কালিদাস সম্পর্কীয় আলোচনা বাদ দিলেও অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর আবিষ্কার ও গবেষণার ঐশ্বর্য এতই প্রত্যক্ষগোচর যে তাঁকে আমাদের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ইতিহাস-রচয়িতার সম্মান দিতে হবে। প্রথমত, তাঁর অনুসন্ধান, অধ্যয়ন, প্রয়াস ও প্রযত্নের ফলে আমরা মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মের মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি পরবর্তী শাখাসম্প্রদায়গুলির ইতিবৃত্ত জানতে পেরেছি। বৌদ্ধ ধর্মের এই অন্ত্য পর্বের কাহিনী এবং ভারতবর্ষে তার শেষ আশ্রয়ভূমি বাংলাদেশ থেকে তার ক্রমাপসরণের ইতিহাস মুখ্যত হরপ্রসাদেরই রচনা। দ্বিতীয়ত, তিনিই সর্বপ্রথম ধর্মঠাকুরের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তৃতীয়ত, চর্যাপদ আবিষ্কারের মাধ্যমে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরই শুধু নয়, আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার সূচনাপর্বের ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত করেছেন। চতুর্থত, প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস রচনাতেও তাঁর দান অবিস্মরণীয়। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে'র পুঁথি আবিষ্কৃত না হলে পাল রাজত্বের অন্ত্যপর্বের ইতিহাস অজ্ঞাত থেকে যেত। সর্বোপরি, হরপ্রসাদের আবিষ্কৃত অসংখ্য নানা বিষয়ক পুঁথিগুলি দীর্ঘ দিন যাবৎ এবং এখনও ঐতিহাসিক ও গবেষকদের উপাদান সরবরাহ করেছে ও করছে।

এই মনীষীর বহু মত ও মন্তব্য অধুনা পরিত্যক্ত। হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ তাঁর সময় থেকে আমাদের গবেষণা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে গেছে, আবিষ্কৃত হয়েছে নিত্য নূতন তথ্য, পাওয়া গেছে নানা আকর্ষণীয়

সংবাদ। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, অশোকের বৌদ্ধ ধর্মে আসক্তি ও অহিংসানীতির ফলে ব্রাহ্মণদের বিক্ষোভই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ।[১] পরবর্তী কালে তাঁর এই মতের অসারতা প্রতিপন্ন হয়েছে।[২] অনুরূপভাবে, তিনি ধর্মঠাকুরের পূজাকে 'বৌদ্ধ ধর্মের শেষ' বলে ঘোষণা করেছিলেন।[৩] তাঁর এ অভিমতও পরিত্যক্ত হয়েছে, আধুনিক মতানুসারে ধর্মপূজা আদিতে ছিল একটি অনার্য অনুষ্ঠান, পরে এ পূজাতে বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবের সংক্রাম ঘটে এবং প্রকৃত পক্ষে বাংলা দেশের আদিম সংস্কৃতি এ পূজার মধ্যে সংহত হয়।[৪] শাস্ত্রীমশায় দিল্লীর লৌহ-স্তম্ভে উৎকীর্ণ অভিলেখের নৃপতি চন্দ্রকে শুশুনিয়া শিলালেখের মহারাজা চন্দ্রবর্মনের সঙ্গে অভিন্নায়িত করেছিলেন।[৫] তাঁর এই মত এখন অচল, অধিকাংশ আধুনিক পণ্ডিত দিল্লী স্তম্ভের মহারাজাধিরাজ চন্দ্রকে গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন।[৬] তাঁর সম্পাদিত লেখ বা পুঁথির পাঠও অনেক ক্ষেত্রে সংশোধিত বা পরিবর্জিত হয়েছে। সেনবংশীয় বিশ্বরূপসেনের তাম্রপট্ট একটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত।[৭] পাল নরপতি দ্বিতীয় গোপালের আমলে অনুলিখিত 'মৈত্রেয় ব্যাকরণে'র একটি পুঁথিতে তিনি অনুলিপির তারিখ পড়েছিলেন উক্ত নৃপতির ৫৭ রাজ্যবর্ষ, আসলে

১ *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1910, pp. 259 ff.

২ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর *Political History of Ancient India* (পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৫০; পৃ. ৩৫৪-৬২) গ্রন্থে শাস্ত্রীমশায়ের মত খণ্ডন করেছেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী রোমিলা থাপারের *Asoka and the Decline of the Maurya Empire* (Oxford, 1961), পৃ ১৯৮-২০০ দ্রষ্টব্য।

৩ *Discovery of Living Buddhism in Bengal* (1897) দ্রষ্টব্য।

৪ আচার্য সুনীতিকুমার ও ডঃ সুকুমার সেন শাস্ত্রীর মতের বিরোধিতা করেছেন। *B. C. Law Volume* (Calcutta, 1945) গ্রন্থে এঁদের প্রবন্ধ দু'টি দ্রষ্টব্য।

৫ *Indian Antiquary*, XII.

৬ দ্রষ্টব্য : *Select Inscriptions* (ed., D.C. Sircar), p. 283, n. 1.

৭ ননীগোপাল মজুমদার হরপ্রসাদের বহু পাঠ সংশোধন করেছিলেন; যেমন, শাস্ত্রীমশায় লক্ষ্মণসেনের মহিষীর নাম পড়েছিলেন 'তড্ডণদেবী', মজুমদারের মতে প্রকৃত নাম 'তান্দ্রাদেবী'। ননীগোপাল মজুমদারের *Inscriptions of Bengal*, III. (Rajshahi, 1929), পৃ ১৪০-৪২, ১৭৭-৮০ দ্রষ্টব্য।

তা ১৭ রাজ্যবর্ষ।[১] সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে'র বহু পাঠও পরে সংশোধিত হয়েছে।[২] প্রাচীন পুঁথি সম্পাদনার ক্ষেত্রে হরপ্রসাদ প্রয়োজনীয় প্রযত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করেন নি, তাঁর এই ত্রুটি তাঁর সার্বিক কৃতিত্ব সত্ত্বেও অনস্বীকার্য।

॥ আট ॥

হরপ্রসাদ বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসের ভিত্তিকে প্রশস্ত ও দৃঢ় করেছেন, কিন্তু তাঁর নিজস্ব ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারপদ্ধতি কি রকম ছিল? নিরপেক্ষতা যে ঐতিহাসিকের অবশ্যপালনীয় ধর্ম এ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। প্রমাণ তাঁরই উক্তি: 'যিনি যথার্থ ঐতিহাসিক, তাঁহার কোন দিকেই টান থাকিবে না, তিনি বিচারকের আসনে বসিয়া দুই দিক দেখিয়া বিচার করিবেন।'[৩] এ ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকরের সঙ্গে তাঁর মতের মিল দেখা যায়, কারণ ভাণ্ডারকরও ঐতিহাসিককে বিচারকের আসনে বসিয়েছিলেন (পৃ...৭৪, প্রাচী...২)। এতদ্‌সত্ত্বেও হরপ্রসাদ সর্বত্র ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন নি, মানবিক দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বাভাবিকভাবে তাঁর রচনায় সংক্রামিত হয়েছিল। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ ঐতিহাসিকও মানুষ এবং অতীত ঘটনার পুনর্গ্রন্থনে তাঁর কল্পনার ভূমিকা অগৌণ নয়। হরপ্রসাদের মন ছিল সাহিত্যের সুরে বাঁধা, প্রাথমিকভাবে তিনি ছিলেন সাহিত্যের ছাত্র, ফলত স্বীয় আবেগ ও কল্পনাশক্তির সাহায্যে তিনি ইতিহাসের ধূসর জগতের বাইরে যে-ভুবন সৃষ্টি করতে চাইতেন, তথ্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের কাছে তা হয়তো অনাকাঙ্ক্ষণীয়। তিনি যে মনে-প্রাণে বাঙালী ছিলেন, বাংলার অতীত, বাংলার সংস্কৃতি যে তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল, নানাভাবে তিনি তার প্রমাণ রেখে গেছেন। প্রাচীন বাংলার গৌরবকীর্তনে তিনি প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত ছিলেন

১ *Journal of Bihar and Orissa Research Society*, XIV, pp 490-91 এবং রমেশচন্দ্র মজুমদারের *History of Ancient Bengal* (Calcutta, 1971), পৃ. ১৯৫, ২৭৫ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

২ তাঁর সম্পাদকীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি রাধাগোবিন্দ বসাকের সংস্করণে সংশোধিত হয়েছে।

৩ 'হরপ্রসাদ রচনাবলী', 'দ্বিতীয় সম্ভার', পৃ, ২২৮। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি বলেছিলেন, 'যতদিন হিন্দুদের তরফ হইতে মুসলমান দিগের ইতিহাস লেখা না হয় তত দিন ঐ ইতিহাস পুরাও হইবে না, ঠিকও হইবে না।' তদেব, পৃ ৪৩১।

('প্রাচীন বাংলার গৌরব' পুস্তিকাটি দ্রষ্টব্য) যাঁরা বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির চর্চা করতেন তাঁদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন[১] এবং স্বীয় অতীত-গরিমায় উদাসীন বাঙালী জনসাধারণের উদ্দেশ্যে সক্ষোভে মন্তব্য করেছিলেন, 'বাঙ্গালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি'। ইতিহাসের সূক্ষ্ম বিচারে তাঁর এই প্রকট সাজাত্যবোধ হয়তো অনভিপ্রেত, কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সকল ঐতিহাসিকের রচনাতেই মানবিক দুর্বলতা বিদ্যমান (৮০ পৃষ্ঠার ২নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য) এবং সেই কারণেই ইতিহাস প্রাণবন্ত। হরপ্রসাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত বাংলা রচনাবলির পাঠযোগ্যতার মূল কারণ তাঁর নিখাদ দেশপ্রেমে ও স্বাজাতিকতায়, তাঁর প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষা তাঁর বক্তব্যের সোনায় সোহাগার কাজ করেছে।

॥ নয় ॥

জীবদ্দশাতেই হরপ্রসাদ তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন দেশে এবং বিদেশে। দেশবাসী এবং ইংরেজ সরকার উভয়ে তাঁকে নানাভাবে সম্মানিত করেছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আজীবন ফেলো' ও সেণ্ট্রাল টেক্সট বুক কমিটির সদস্য, Buddhist Text and Research Society-র সম্পাদক, মথুরায় অখিল ভারতীয় সংস্কৃত মহাসম্মেলনের সভাপতি, ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনে সংস্কৃত ও প্রাকৃত বিভাগের সভাপতি এবং তার পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে Honorary Member বা সম্মানিত সদস্য মনোনীত করেন। ভারত সরকার তাঁকে ১৮৯৮ সালে 'মহামহোপাধ্যায়' এবং ১৯১১ সালে সি. আই. ই. উপাধি দান করেন।

এ দেশের দুটি বিদ্বৎপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শাস্ত্রীমশায়ের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তাঁর সারস্বত জীবনের সূচনা এশিয়াটিক সোসাইটিতে এবং এই সংস্থার সঙ্গে তিনি আমৃত্যু (মৃত্যু ১৯৩১) নানাভাবে জড়িত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি

১ একটি আশীর্ব্বাদপত্রের মধ্যে হরপ্রসাদের এই দেশাত্মবোধের পরিচয় মেলে : 'যাহারা নিজের উন্নতি করিতে চায় তাহাদের আশীর্ব্বাদ করি। যাহারা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি করিতে চেষ্টা করে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করি।...যাহারা দেশের জিনিষ ব্যবহার করে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করি। যাহারা আপনার দেশকে সকলের চেয়ে বড় বলিয়া মনে করে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করি। যাহারা আপনার দেশের পুরাণ কথা লইয়া আলোচনা করে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করি।' 'ধ্রুবতারা', আশ্বিন ১৩৫৫।

সোসাইটির Joint Philological Secretary, 'আজীবন সহকারী সভাপতি' এবং সসভাপতির পদে বৃত হয়েছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির মতো বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গেও তাঁর সংযোগ ছিল। এই প্রতিষ্ঠান তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান 'বিশিষ্ট সদস্য'- (১৯০৯) এবং একাধিক বার সভাপতি- পদে নির্বাচিত করেছিলেন। পরিষৎ তাঁকে দু'বার সংবর্ধনাও জানিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বারের সংবর্ধনা-সভায় (১৯২৯) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁকে বহু পণ্ডিতের লেখা প্রবন্ধসংগ্রহ 'হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন-লেখমালা'র ১ম খণ্ড (প্রকাশিত) এবং ২য় খণ্ড (পাণ্ডুলিপি আকারে) উপহার দেন।

॥ দশ ॥

এ নিবন্ধের শুরুতে হরপ্রসাদকে রাজেন্দ্রলালের যোগ্য শিষ্য ও উত্তরাধিকারী বলে বর্ণনা করেছি। আমার এ বর্ণনা যে অযথার্থ নয়, আমার পূর্ববর্তী 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র' ও বর্তমান নিবন্ধ থেকে তা স্পষ্ট হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথও উভয়ের মাননিক ও চরিত্রগত সাদৃশ্য লক্ষ করে 'হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন লেখমালা'র ভূমিকায় বলেছিলেন: 'আমার মনে এই দুই জনের চরিত-চিত্র মিলিত হয়ে আছে। উভয়েরই অনাবিল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা একই শ্রেণীর। উভয়েরই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল পারদর্শিতা,—যে কোন বিষয়ই তাঁদের আলোচ্য ছিল, তার জটিল গ্রন্থিগুলি অনায়াসেই মোচন করে দিতেন। জ্ঞানের গভীর ব্যাপকতার সঙ্গে বিচারশক্তির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার যোগে এটা সম্ভবপর হয়েছে। তাঁদের বিদ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধন-প্রণালী সম্মিলিত হয়ে উৎকর্ষ লাভ করেছিল।' অতঃপর হরপ্রসাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার্ঘ্য: 'হরপ্রসাদ যে যুগে জ্ঞানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে যুগে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির প্রভাবে সংস্কারমুক্ত চিত্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন করে নিতে শিখেছিল। তাই স্থূল পাণ্ডিত্য নিয়ে বাঁধা মত আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে কোনোদিন সম্ভবপর ছিল না। বুদ্ধি আছে কিন্তু সাধনা নেই, এইটেই আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখতে পাই, অধিকাংশ স্থলেই আমরা কম শিক্ষায় বেশী মার্কা পাবার অভিলাষী। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সাধকের দলে, এবং তাঁর ছিল দর্শনশক্তি।'

আমাদের ইতিহাস-চর্চায় অন্যতম পথিকৃৎ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যে শুধু শ্রদ্ধা নয়, যথার্থ মূল্যায়নও উচ্চারিত হয়েছে।

বাংলার সন্ধানে,
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

'রাজা, রাজ্য, রাজধানী, যুদ্ধবিগ্রহ এবং জয়-পরাজয়—ইহার সকল কথাই ইতিহাসের কথা। তথাপি কেবল এই সকল কথা লইয়াই ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না। বাঙ্গালীর ইতিহাসের প্রধান কথা বাঙ্গালী জনসাধারণের কথা।'—আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও আগে, বাংলা ১৩১৯ সালে, রমাপ্রসাদ চন্দের 'গৌড়রাজমালা'র ভূমিকায়[১] যিনি এই কথা ক'টির মধ্যে আধুনিক ঐতিহাসিক মননের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁর সঙ্গে একালের বাঙ্গালী ইতিহাস-শিক্ষকদের পার্থক্য বিস্তর। ভিন্ন পেশার লোক হয়েও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ছিলেন যথার্থ ঐতিহাসিক, ইতিহাসের স্বরূপ তাঁর চোখে যত উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়েছিল, তৎসাময়িক বা একালীন কারো কাছে তেমনভাবে তা ধরা পড়ে নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'আধুনিক বাঙালী ইতিহাস-লেখকগণের শীর্ষস্থানীয়' বলে নন্দিত করেছিলেন।[২] আমার মতে, আজও তিনি সেই শীর্ষস্থান অধিকারীদের অন্যতম। অধীত বিষয়ের ব্যাপকতায়, চিন্তার গভীরতায়, বিষয়বিন্যাসের নৈপুণ্যে এবং সরস রচনা-শৈলীতে দীপ্যমান রচনাবলিতে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় আজও বাঙালী ঐতিহাসিকদের অগ্রপথিক, ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিশিষ্ট পুরুষ।

॥ দুই ॥

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ১লা মার্চ নদীয়া জেলার সিমলা গ্রামে অক্ষয়কুমারের জন্ম।[৩] পিতা মথুরানাথের প্রথম সন্তানের নামকরণের ইতিহাস আকর্ষণীয়। 'কাঙাল হরিনাথ' নামে সমধিক পরিচিত কুমারখালির হরিনাথ মজুমদার ছিলেন সেকালের সাহিত্য-মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের অনুরাগী। মথুরানাথের বাল্যসুহৃদ্ হরিনাথ মজুমদারই বন্ধুপুত্রের নামকরণ করেন। উদ্দেশ্য অক্ষয়কুমারের ভাষাতেই শোনা যাক: 'এই বালক বাঙ্গালা সাহিত্যের

---

১ গৌড়রাজমালা, পৃ. ৮৶।

২ রবীন্দ্র-রচনাবলী (শতবার্ষিক সংস্করণ), চতুর্দশ খণ্ড, পৃ ৪৭০।

৩ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, পঞ্চম খণ্ড), পৃ. ৫। জীবন সংক্রান্ত তথ্যাবলির জন্য এই গ্রন্থের ৫-১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যাহাতে উন্নতি করে, সেইরূপ শিক্ষাই ইহাকে দিতে হইবে, এই উদ্দেশ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের নামস্মরণে আমার নামও অক্ষয়কুমার রাখা হয়।' হরিনাথ মজুমদারের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়'-এর মতো মহাগ্রন্থের লেখক অক্ষয়কুমার দত্তের যোগ্য উত্তর-সূরিরূপে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর এক বাহু স্পর্শ করেছিল সাহিত্যকে, অন্য বাহু আলিঙ্গন দিয়েছিল ইতিহাসকে। ফলত, ইতিহাস তাঁর হাতে সাহিত্য হয়ে উঠেছিল। এবং ইতিহাস যে এক হিসাবে সাহিত্য, এ সত্য আজ ঐতিহাসিক-মহলেও স্বীকৃত।

প্রবেশিকা এবং এফ. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে অক্ষয়কুমার ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. এবং ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে রাজশাহি কলেজ থেকে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৫ থেকেই তিনি রাজশাহিতে ওকালতি করতে শুরু করেন এবং এইটিই ছিল তাঁর মূল বৃত্তি।

বৃত্তি যাই হোক, অক্ষয়কুমার ছিলেন সাহিত্যের ও ইতিহাসের একান্ত সাধক। মাতৃভাষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ আদ্যন্ত বর্তমান ছিল। বাংলা ভাষায় একাধিক গ্রন্থ এবং অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করে তিনি হরিনাথ মজুমদারের প্রত্যাশা পূর্ণ করেছিলেন। বাংলাদেশের, বলা যায় ভারতবর্ষের, বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ব-গবেষণা- কেন্দ্র, 'বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি' স্থাপন করে তিনি বাংলাদেশের ও ভারতবর্ষের ইতিহাস-চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বারোদঘাটন করেছিলেন। ১৯১০ সালে দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়ের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত এই সমিতি বাংলাদেশের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে যে মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, বাঙালী ইতিহাস-সন্ধিৎসুদের তা অজানা নয়। নয়। ইতিপূর্বে 'সাধারণতঃ ভারতবর্ষের, এবং বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, পুরাতত্ত্বের উপকরণ সংকলনের জন্য' 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালের জানুআরি মাসে। মাত্র এক বৎসর স্থায়ী হলেও 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র প্রকাশ বঙ্গমনীষার ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। অনুমান করি, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' এবং 'রহস্য-সন্দর্ভ' অক্ষয়কুমারকে 'ঐতিহাসিক চিত্র' প্রকাশে উৎসাহিত করেছিল, যদিচ ও-দুটি পত্রিকার সঙ্গে 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র কিছুটা চরিত্রগত পার্থক্য ছিল; কারণ অক্ষয়-কুমারের পত্রিকা ছিল সম্পূর্ণ ইতিহাসকেন্দ্রিক।

আদ্যন্ত ইতিহাস-সাধক ও সাহিত্যব্রতী অক্ষয়কুমার সম্মান-স্বীকৃতি

লাভ করেছিলেন একাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে।[১] রবীন্দ্রনাথের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি ছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ তাঁকে বাংলা ১৩১১ সালে অন্যতম সহকারী সভাপতি ও ১৩১৮ সালে 'বিশিষ্ট সদস্য' নির্বাচিত করে সম্মানিত করেছিলেন। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে 'কৈসর-ই-হিন্দ্ সুবর্ণপদক' এবং সি. আই. ই. উপাধি দান করে তৎকালীন গভর্নমেণ্টও তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। দেশব্যাপী শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতির মধ্যে ১০ ফেব্রুআরী ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে ৭০ বৎসর বয়সে অক্ষয়কুমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[২]

।। তিন ।।

যে- কাল এবং মানস-মণ্ডলে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র জন্ম ও জীবন বিধৃত, আমরা তা থেকে অনেক এগিয়ে এসেছি। কিন্তু মাঝে-মধ্যে সন্দেহ জাগে, পিছু হেঁটে যাইনি তো? বর্তমান প্রবন্ধের সূচনাতে আমার কিছুটা উষ্মাগন্ধী উক্তি 'তাঁর সঙ্গে এ কালের বাঙালী ইতিহাস-শিক্ষকদের পার্থক্য বিস্তর' এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আমার মনোভাবের কারণ বিশ্লেষণ করি।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বরাবরই নিছক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ইতিহাসের বিচার-বিশ্লেষণের বিরোধী ছিলেন। আমার অনুমান, এই দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও সাহচর্য অক্ষয়কুমারকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। ইতিহাস যে রাজ-রাজড়া-যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী ছাড়াও আর কিছু, ইতিহাস যে মূলত 'মানবমনের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস', রাজনীতির ধূলিসমাচ্ছন্ন দিনেও মানুষের জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখের প্রবহমান ধারাই যে ইতিহাসের মূল উপজীব্য এ কথা রবীন্দ্রনাথ 'ঐতিহাসিক চিত্র' প্রকাশের আগেই সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছিলেন। অর্থাৎ, এককথায় রবীন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমার একই ইতিহাসচেতনার শরিক। অথচ আশ্চর্য, এ কালের বাঙালী ইতিহাস-শিক্ষকের রচনাতে এই চেতনার স্বাক্ষর প্রায় বিরলদর্শন। রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় বা ঘটনা-তথ্যের শ্রমাক্ত আহরণে তাঁদের অনেকেরই নৈপুণ্য শ্রদ্ধার্হ, কিন্তু তাঁদের রচনা সমকালীন সমাজ- ও প্রতিবেশ- বিশ্লিষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত তথ্যসর্বস্ব দুষ্পাঠ্য হয়ে দাঁড়ায়। এবং

১ তদেব, পৃ. ২২।
২ তদেব, পৃ. ২২।

বিশেষত পুরাতত্ত্বের ক্ষেত্রে স্পষ্টই তাঁদের অনেকে লেখ, মুদ্রা ইত্যাদি পুরাদ্রব্য সংক্রান্ত গবেষণাকে অনৈতিহাসিকভাবেই 'ইতিহাস'-এর সঙ্গে অভিন্নায়িত করেন। এই সূত্রেই মনে আসে, অক্ষয়কুমারও বাংলাদেশের, সেকালের গৌড়ের, লেখমালা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। কিন্তু প্রাচীন লেখমালা যে 'ইতিহাস' নয়, ইতিহাসের উপকরণ মাত্র এই বোধ তাঁর ছিল। 'পাল নরপালগণের তাম্রশাসন ও তাঁহাদিগের শাসনসময়ের কতিপয় শিলালিপি'র সংগ্রহ 'গৌড়লেখমালা' (প্রকাশকাল ১৩১৯, ইংরেজী ১ সেপ্টেম্বর ১৯১২) গ্রন্থের অবতরণিকায় লেখসমূহের গুরুত্ব স্বীকার করেই তিনি বলেন :[১] 'যে দেশের লিখিত ইতিহাস বর্তমান নাই, সে দেশের পুরাতত্ত্ব সঙ্কলিত করিতে হইলে, এই শ্রেণীর পুরাতন লিপিকে প্রধান উপাদান বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।...এই শ্রেণীর লিপি 'ইতিহাস' বলিয়া কথিত হইতে পারে না, সেরূপ প্রয়োজনেও ইহা উদ্ভাবিত হয় নাই।' দ্বিতীয়ত, এ কালের অনেক ইতিহাস-শিক্ষকের মতো অক্ষয়কুমার ইতিহাসকে কখনও খণ্ডিতভাবে দেখেন নি। তাঁর কাছে ইতিহাস ছিল একটি জাতির সুখ-দুঃখের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহেরই নামান্তর।[২] এই ইতিহাস-চেতনাই বাংলাদেশের বা ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের এবং বিবিধ পুরা-প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে তাঁর পদচারণায় স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছিল। এইজন্যই তিনি যে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নৈপুণ্যে 'গৌড়লেখমালা' অনুবাদ ও সম্পাদনা করতে পারেন, বা 'শ্রীমূর্তি বিবৃতি' ('বঙ্গদর্শন', ১৩১৬ পৌষ-চৈত্র), 'ভারত-স্থাপত্য' ('সাহিত্য', ১৩২০ অগ্রহায়ণ), 'বৌদ্ধ কলাবিদ্যা' ('মানসী ও মর্মবাণী', ১৩২৪ বৈশাখ), 'সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের বিশেষত্ব' ('বঙ্গদর্শন', ১৩১৩ পৌষ) প্রভৃতি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ-আলোচনায় বিশেষজ্ঞ-সুলভ বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিতে পারেন, 'সিরাজদ্দৌলা' (১৩০৪ সাল, ইংরেজী ২১ জানুআরী ১৮৯৮), 'মীরকাসিম' (১৩১২ সাল, ২৫ ফেব্রুআরী ১৯০৬) বা 'ফিরিঙ্গি বণিক' (শ্রাবণ ১৩২৯, ২০ জুলাই ১৯২২) রচনা করে ইতিহাসের অপেক্ষাকৃত আধুনিক পর্বেও সমান অধিকারের প্রমাণ রাখেন। শেষত, অক্ষয়কুমার ছিলেন মনে-প্রাণে বাঙালী। বাংলা, বিশেষত বরেন্দ্র-বাংলা, ছিল তাঁর

১ গৌড়লেখমালা, পৃ. ৪।

২ প্রবন্ধের সূচনায় উদ্ধৃত 'গৌড়রাজমালা'র ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য : 'বাঙ্গালীর ইতিহাসের প্রধান কথা বাঙ্গালী জনসাধারণের কথা।'

সন্ধানভূমি। এই বাংলার কথা, বাঙালীর কথা তিনি আগে বাংলা ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের গবেষণার ফল বাংলার প্রতিটি ঘরে গিয়ে পেঁছাক, নিজের দেশকে নিজের চোখে দেখে বাঙালী ভালোবাসুক মাতৃভূমিকে, এই ছিল অক্ষয়কুমারের ঐকান্তিক কামনা। ইতিহাসকে মুখস্থ করে পরীক্ষা দেবার স্তর থেকে বহত্তর জনসমাজে প্রাণবন্ত বিদ্যা রূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে সঙ্গতভাবে মাতৃভাষার সাহায্য নিয়ে তিনি যথার্থ ঐতিহাসিকের দায়িত্বই পালন করেছিলেন। অথচ বাংলাভাষায় যে ইতিহাস-চর্চা আদৌ হতে পারে, অক্ষয়কুমারের দীপ্ত দৃষ্টান্তের পরও একালের বাঙালী ইতিহাস-শিক্ষকসমাজ সে সম্পর্কে গভীর সন্দিহান। মনে পড়ছে, কিছুদিন আগে জনৈক খ্যাতিমান বাঙালী অধ্যাপক-সহকর্মী বাংলায় ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনায় অপটুতার কথা আমাদের কয়েকজনের সামনে সগর্বেই ঘোষণা করেছিলেন। এবং আর-একজন অধিকতর বিশ্রুত অধ্যাপক বাংলাভাষায় রচিত তথ্যে-তত্ত্বে মূল্যবান ঐতিহাসিক নিবন্ধকেও গবেষণা প্রবন্ধের মর্যাদা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, কারণ তাঁর মতে গবেষণামূলক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ইংরেজীতেই সম্ভব।

॥ চার ॥

যে-কালে অক্ষয়কুমারের কর্মকাণ্ডের উদ্‌গম, বাঙালী তথা ভারতবাসী তখন স্বদেশ-সন্ধানে, অন্যভাবে আত্মানুসন্ধানে, রত। ইতিহাসবোধের এই উদ্বোধন-পর্বে আবির্ভূত ভারতীয় মনীষীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন: ভগবানলাল ইন্দ্রজী, ভাউ দাজী, রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশে বিশেষ করে যে-ইতিহাস-উৎসাহ উৎসারিত হয়, শতকের সমাপ্তি-পূর্বেই তা প্রায় কূলপ্লাবী হয়ে ওঠে। বুকের কথা যেহেতু মুখের ভাষাতেই যথাযথভাবে প্রকাশ পায়, সেই কারণে বাঙালী ঐতিহাসিককুল মুখ্যত বাংলা ভাষাতেই ইতিহাস-চর্চা করতেন। ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ-প্রতিম রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অধিকাংশ ঐতিহাসিক নিবন্ধ ইংরেজীতে লেখা হলেও 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র মাধ্যমে তিনি মাতৃভাষায় ইতিহাস-চর্চা অনির্বাণ রাখার চেষ্টা করেছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণারও অন্যতম বাহন ছিল বাংলা। তাঁদের অল্পবিস্তর সমকালীন অক্ষয়কুমারের রচনাবলির তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি বাংলা ভাষায় রচিত। তাঁর প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের

সংখ্যা সাত : 'সমরসিংহ' (১২৯০ বঙ্গাব্দ, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩), 'সিরাজদ্দৌলা' (১৩০৪ বঙ্গাব্দ, ২১ জানুআরী ১৮৯৮), 'সীতারাম রায়' (বৈশাখ ১৩০৫, ১০ মে ১৮৯৮), 'মীরকাসিম' (১৩১২ বঙ্গাব্দ, ২৫ ফেব্রুআরী ১৯০৬), 'ফিরিঙ্গি বণিক' (শ্রাবণ ১৩২৯, ২০ জুলাই ১৯২২), 'অজ্ঞেয়বাদ' (সমালোচনা গ্রন্থ, ১৯২৮ ?), এবং 'গৌড়লেখমালা' (১৩১৯ সাল, ১ সেপ্টেম্বর ১৯১২) । এ ছাড়া 'বঙ্গদর্শন', 'সাহিত্য', 'ভারতী', 'উৎসাহ' প্রভৃতি পত্র—পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য রচনা বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। রমাপ্রসাদ চন্দের 'গৌড়রাজমালা' এবং অক্ষয়কুমার বড়ালের গীতিকাব্য 'কনকাঞ্জলি'তে তিনি যে দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছিলেন, এ সূত্রে তা স্মরণীয়। প্রসঙ্গত, অক্ষয়কুমারের কালে ইতিহাস ও সাহিত্য যে হাত ধরাধরি করেই পথ চলত, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমারের 'কনকাঞ্জলি'র ভূমিকা বা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্য-সংক্রান্ত নিবন্ধ ও সমালোচনা (প্রাসঙ্গিক উদাহরণ : ১৩০৪ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যা 'উৎসাহ'তে প্রকাশিত 'বাঙ্গালা ভাষার লেখক', ১৩৩০ সালের ১৩ পৌষে 'সচিত্র শিশির'-এ প্রকাশিত 'কান্তকবি রজনীকান্ত') যেমন তার প্রমাণ, অন্যদিকে ইতিহাসচেতনায় ভাস্বর বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের রচনাবলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের খেদোক্তি ('বাঙ্গালার ইতিহাস নাই...ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালীর লজ্জার কথা আর কোথায় ?') ও ইতিহাস-রচনেচ্ছার ('এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব।') এবং রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নিবন্ধমালার কথা আজ আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই।

বস্তুত, ইতিহাস ও সাহিত্যের যোগ্য সহযোগেই জাতি তার আত্মপরিচয় লাভ করে। বাংলাদেশে উনিশ শতকের শেষ দু-তিনটি এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম তিনটি দশকেই ইতিহাস ও সাহিত্যের এই শুভসংযোগ ঘটেছিল। সাহিত্যের পথ থেকে ইতিহাস তারপর অনেক দূরে বেঁকে গেছে। ফলে সাহিত্যব্রতীরা শুধু-লেখকের বেশি কিছু হতে পারলেন না, ইতিহাস-অধ্যাপকরা ঐতিহাসিকের ঈপ্সিত আসন অর্জনে অসমর্থ হলেন।[১] ঐতিহাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে ইউরোপকে ইতিহাস

১ অঙ্গুলিগণ্য ব্যাতিক্রমদের কথা মনে রেখেই আমার এই উক্তি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' অভিধায় যা সৃষ্টি হচ্ছে তার অধিকাংশই ঐতিহাসিক পিটুলিগোলা ছাড়া কিছু নয়। ঐতিহাসিক উপন্যাস

শিক্ষা দিয়েছিলেন যে-ওয়াল্টার স্কট তিনি পেশাদারী ঐতিহাসিক নন, সাহিত্যস্রষ্টা মাত্র—১৯৩০ সালে উচ্চারিত ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ানের এই উক্তি[১] ট্রেভেলিয়ানের আধুনিক ধীমান বাঙালী পাঠকেরও মনন স্পর্শ করতে পারে নি বলে আমার ধারণা।

॥ পাঁচ ॥

বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মানস-মণ্ডলে এবং রাজেন্দ্রলাল-ভাণ্ডারকরের খনিত পন্থায় ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমারের যাত্রারম্ভ। 'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই' বঙ্কিমচন্দ্রের এই খেদোক্তি যে অক্ষয়কুমারের হৃদয় স্পর্শ করেছিল সাধারণত ভারতবর্ষের, এবং বিশেষত বঙ্গদেশের, পুরাতত্ত্বের উপকরণ সংকলনের' উদ্দেশ্যে প্রকাশিত 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র সম্পাদকীয়তে তার প্রমাণ সুস্পষ্ট। এবং পরবর্তী কালে মুখ্যত বাংলাদেশ যে কেন তাঁর চিত্তকে অধিকার করেছিল, তারও ইঙ্গিত তাঁর উপর বঙ্কিম-প্রভাবের মধ্যে মেলে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি রবীন্দ্রনাথের সগোত্র, রাজ-রাজড়া যুদ্ধ-বিগ্রহের নিছক বিবৃতির প্রতি তাঁর গভীর অবজ্ঞা ছিল। রাজেন্দ্রলাল যেমন সরেজমিন সন্ধানে পুরাবস্তুর নিখুঁত ও বিশদ বিবরণ সংগ্রহ ঐতিহাসিকের প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে করতেন, অক্ষয়কুমারও তেমনি প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-অনুসন্ধানের উপর জোর দিতেন। পাল-নরপতিদের রাজধানী নির্ণয়সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, কেউ কেউ ঘরে বসেই এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে মীমাংসা-সাধনের অন্য উপায় না দেখে সিদ্ধান্ত করেছেন পাল রাজারা নির্দিষ্ট কোথাও রাজধানী করেন নি, অথচ সেই পণ্ডিতরা যদি প্রত্নবিদের কোদাল হাতে গৌড়-বরেন্দ্রর মাঠে নামতেন, তবে ঐ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারতেন। দশম শতাব্দীর শেষদিকে মহীপালের রাজ্যলাভের পর থেকে পালবংশের পতন পর্যন্ত—মোটামুটি এই প্রায় দু'শ বছরের ইতিহাসের প্রকৃত মর্ম হৃদয়ঙ্গম করার জন্য অক্ষয়কুমার মৃৎগর্ভ থেকে আবিষ্কৃত স্মৃতিচিহ্ন ধরে অনুসন্ধান-কার্য চালাতে উপদেশ

রচনায় যে- গভীর ইতিহাসবোধ ও সাহিত্যিক সাধুতার প্রয়োজন অধিকাংশ ঐতিহাসিক উপন্যাস-লেখকের তা নেই।

১ G. M. Trevelyan, *Clio, A Muse*, pp. 165-66.

দিয়েছিলেন।[১] রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকরের মতো তিনিও বলেছেন, ইতিহাসের উপাদান-বিশ্লেষণে ঐতিহাসিককে বিচারপতির ভূমিকা নিতে হবে; সংস্কারমুক্ত চিত্তে সত্যের উদ্‌ঘাটনই হবে তাঁর লক্ষ্য।[২] এবং ভাণ্ডারকরের মতো অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ও জনশ্রুতি কিংবদন্তীর উপর একান্তভাবে গুরুত্ব আরোপ করতেন না।[৩] ভাণ্ডারকর এবং মৈত্রেয়র এই ঐতিহাসিক পদ্ধতি-সংক্রান্ত আদর্শে র‍্যাঙ্কের ইতিহাস-দর্শনের ছায়াপাত ঘটেছে।

১ গৌড়রাজমালা, পৃ. ৸৶ । পাহাড়পুরের মূর্তিগুলির প্রত্যক্ষ ও সযত্ন পরীক্ষার গুরুত্ব প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি : Before a cirtical study of these representations is carefully finished, it must be premature to hazard any opinion about history of the Art or of the people indicated or suggested by them. Preliminary Reports of this class will help scientific study only when they disclose a scrupulous regard to distinguish between facts and fictions, between actual observation and tentative interpretations, better suited to sensational advertisement, by which research is more hampered than facilitated. *Ancient Monuments of Varendra*, p. 11.

২ ভাণ্ডারকরের উক্তি : In dealing with all these materials (অর্থাৎ historical materials) one should proceed on such principles of evidence as are followed by a judge. One must in the first place be impartial, with no particular disposition to find in the materials before him something that will tend to the glory of his race and country, nor should he have an opposite prejudice against the country or its people. Nothing but dry truth should be his object. *Collected Works of Sir R. G. Bhandarkar* Vol. 1, p. 4. আর অক্ষয়কুমার বলেছেন : 'ন্যায়নিষ্ঠ বিচারপতির ন্যায় নিয়ত সত্যোদ্‌ঘাটনের চেষ্টাই যে ইতিহাস-লেখকের প্রধান চেষ্টা তাহা ভাল করিয়া আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না' : গৌড়রাজমালা, পৃ. ৶০।

৩ ইতিহাস রচনার সময় জনশ্রুতি–কিংবদন্তীকে অন্য উপাদানের আলোকে পরীক্ষা করে গ্রহণ করতে হয়। ভাণ্ডারকর বলতেন : None of the current legends should be considered to be historically true, but an endeavour should be made to find any germ of truth that there may be in them by evidence of another nature. *Ibid.* জনশ্রুতির প্রতি অত্যধিক আস্থাবান নগেন্দ্রনাথ বসুকে সমালোচনা করে (অবশ্য নাম অনুক্ত রেখেই) অক্ষয়কুমার বলেছেন : 'জনশ্রুতির দোহাই দিয়া এক শ্রেণীর গ্রন্থে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে যে-সকল আলোচনার সূত্রপাত হইতেছে, তাহাতে ঐতিহাসিক বিচার-প্রণালী মর্যাদা লাভ করিতেছে না'। গৌড়রাজমালা, পৃ. ।০।

আশ্চর্য নয়, কারণ সেকালে র‍্যাঙ্কের Wie es eigentlich gewesen অর্থাৎ As it actually happened-এর আদর্শ দেশে-বিদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এবং ভাণ্ডারকর বা মৈত্রেয়র পক্ষে র‍্যাঙ্কের রচনাবলির সঙ্গে পরিচিত থাকা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়।

অবশ্য র‍্যাঙ্কে-সুলভ সত্যসন্ধিৎসা ভারতবর্ষে নূতন নয়। র‍্যাঙ্কের বহু আগেই, দ্বাদশ শতাব্দীতে কল্‌হণ ইতিহাসকারকে রাগ-দ্বেষ-বিরহিত হয়ে ভূতার্থ-কথনের উপদেশ দিয়ে গেছেন।[১] এবং এই উপদেশবাণীতে প্রতিফলিত ঐতিহাসিক আদর্শে প্রাচীন কল্‌হণ আধুনিক অনেক ইতিহাসকারের চাইতে আধুনিকতর। অতীত ঘটনার যান্ত্রিক বিবৃতি নয়, ঘটনাবলির অন্তরালবর্তী ইঙ্গিত-তাৎপর্যকে আবিষ্কার করে ইতিহাসকে প্রাণবন্ত না করতে পারলে লাভ কি? নীরস নয়, সরস সত্যই ইতিহাসের প্রাণবস্তু। কল্‌হণের উক্তি উদ্ধার করে অক্ষয়কুমার, কিছুটা ক্ষোভের সুরেই বলেন:[২] 'আমাদিগের সাহিত্যে এই উপদেশ-বাক্য এখনও সম্যক মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। এখনও আমাদিগের ব্যক্তিগত জাতিগত বা সম্প্রদায়গত অনুরাগ-বিরাগ আমাদিগকে পূর্ব হইতেই অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অনুকূল বা প্রতিকূল করিয়া রাখিয়াছে। **পাল-বংশের এবং সেনবংশের নরপালগণের শাসনসময়ে দেশের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল**, তাহা যেন তুচ্ছ কথা,—তাঁহাদিগের জাতি কি ছিল, তাহাই এখনও আমাদিগের নিকট প্রধান আলোচ্য হইয়া রহিয়াছে।'

স্থূলাক্ষর-চিহ্নিত অংশে প্রতিফলিত দৃষ্টিভঙ্গী যে যথার্থ ঐতিহাসিকের এ কথা বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে কি?

পাল এবং সেনদের রাজত্বে দেশের অবস্থা কি রকম ছিল তা জানতে হলে জনশ্রুতি কিংবদন্তী নয়, অন্যবিধ উপাদানের উপর নির্ভর করতে হবে। সমকালীন লেখমালাই সেই উপাদান। শুধু পাল-সেনদের সময়কালীন ইতিহাস রচনায় কেন যে কোন দেশের প্রাচীন ইতিহাস প্রণয়নে লেখমালার স্বাভাবিক গুরুত্বের উল্লেখ করে অক্ষয়কুমার বলেন:[৩] 'এক এক যুগের বহুসংখ্যক প্রাচীনলিপি একসঙ্গে অধ্যয়ন করিতে

১ শ্লাঘ্যঃ স এব গুণবান্ রাগদ্বেষবহিষ্কৃতা।
ভূতার্থকথনে যস্য স্থেয়স্যেব সরস্বতী॥ প্রথম তরঙ্গ, ৭।

২ গৌড়রাজমালা, পৃ. ।০।

৩ গৌড়রাজমালা, পৃ. ৪।

পারিলে সেই সেই যুগের নানা বিবরণের প্রকৃত মর্ম সহজে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে।'

তারপর বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন :[১] 'সকল দেশেই দুইটি শক্তি জনসাধারণের উন্নতির এবং অবনতির গতি-নির্দেশ করিয়া থাকে। তাহা রাজশক্তি এবং প্রজাশক্তি নামে সুপরিচিত। বাংলাদেশে এই উভয় শক্তির মধ্যে পুরাকালে কিরূপ সম্বন্ধ বর্তমান ছিল, কি কারণে এই উভয় শক্তির সমন্বয় বা সংঘর্ষ সংঘটিত হইত, কোন্ প্রণালীতে শাসন-সংরক্ষণকার্য পরিচালিত হইত, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এই সকল প্রাচীন লিপিতেই পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে।'

লেখমালার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেও অক্ষয়কুমার তাদের 'ইতিহাস' বলে গ্রহণ করেন নি, ইতিহাসের মূল্যবান উপাদানের অধিক মর্যাদা দেন নি। এবং ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কোন উপাদানই একক-ভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এই ঐতিহাসিক-সুলভ ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি লেখমালা-লব্ধ তথ্যকে অন্যতর উপাদান-আহৃত তথ্যের সঙ্গে অন্বিত করতে প্রয়াসী ছিলেন। এই পদ্ধতি অবলম্বনে তিনি সিদ্ধান্ত করেন,[২] 'অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র উত্তরাপথে (মগধে ও উড়িষ্যায় তো বটেই) গৌড়ীয় পাল সাম্রাজ্যের প্রভাব বর্তমান থাকায়, সমগ্র উত্তরাপথের ভাষায়, রচনায়, শিল্পে ও লোকাচারে গৌড়ীয় প্রভাব প্রাধান্য লাভ করে।' পরবর্তী কালে অধিকতর তথ্যের দ্বারা সমর্থিত এই মূল্যবান সিদ্ধান্তের আলোকে অক্ষয়কুমার গৌড়শিল্পের অর্থাৎ তৎকালীন মগধ, উড়িষ্যা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের শিল্পকলার ইতিহাস প্রণয়নে অগ্রসর হয়েছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে, যখন পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় নি, প্রাচ্য-ভারতের এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন শিল্পকলা-সংক্রান্ত অনেক তথ্যই যখন অজ্ঞাত, সেই সময়ে অক্ষয়কুমার গৌড়শিল্পের গতি-প্রকৃতি-বিবর্তন সম্পর্কে যে-তিনটি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, তা তাঁর ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টির ফসল। ১১ বৈশাখ ১৩১৯ বঙ্গাব্দে অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে বর্তমান সিদ্ধান্ত তিনটি এই :[৩] এক, 'খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে

১ তদেব, পৃ. ৬।

২ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (সাহিত্যসাধক চরিতমালা), পৃ. ৩৮।

৩ তদেব, পৃ. ৩৮, ৪০।

আমাদিগের দেশে স্বতন্ত্র শিল্প ছিল না, নিদর্শনও অল্প ছিল, যাহা ছিল, তাহাও উৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হইতে পারে না' ; দুই, 'মহাযান-সম্প্রদায়ের অধ্যাত্মবাদের পরিণামই গৌড়ীয় শিল্পরীতিরূপে আকার গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিল। পঞ্চ পাল নরপালের সময় পর্যন্ত সেই অধ্যাত্মবাদ বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া ক্রমে অবসন্ন হয়, শিল্পও তাহার অনুগমন করে' ; এবং তিন, এই গৌড়শিল্পের জন্মস্থান বরেন্দ্রভূমি এবং বরেন্দ্রভূমি থেকে তা উড়িষ্যায়, মগধে ও দ্বীপপুঞ্জে গিয়েছিল ; 'মগধ ও গৌড় একসূত্রে গ্রথিত থাকায়, মহাযান মতের অধোগতির সঙ্গে এই দুই স্থানের শিল্প-রীতি ক্রমে অবনতি লাভ করিতে থাকে ; কিন্তু উড়িষ্যায় ও দ্বীপপুঞ্জে সেরূপ কারণ বর্তমান না থাকায় তদ্দেশে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে।' একটি মাত্র বাক্যে গৌড়শিল্পের গতি-প্রকৃতি-বিবর্তন সম্পর্কে অক্ষয়-কুমারের উক্তির সারবত্তা আজও অক্ষুণ্ণ :[১] 'বরেন্দ্রে উদ্ভব—উড়িষ্যায় শক্তিলাভ—দ্বীপপুঞ্জে পরিণতি, ইহাই গৌড়ীয় শিল্পকলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।' শিল্পের বিবর্তন-সন্ধানের পথে তথাকথিত 'অসুন্দর' নিদর্শনকেও গ্রহণ করতে হয় এই ঐতিহাসিক বোধ অক্ষয়কুমারের ছিল। তাই তাঁর স্পষ্টোক্তি :[২] 'শিল্পের হিসাবেও হয়তো অসুন্দর মূর্তির প্রয়োজন থাকে, উদ্ভবের বা অবনতির পরিচয় দিবার সময়ে তাহার দরকার হয়। ইতিহাসের হিসাবে তাহার প্রয়োজন আরও অধিক।'

॥ ছয় ॥

বর্তমান নিবন্ধের সূচনাতেই বলেছি, অক্ষয়কুমার ইতিহাসকে কখনও খণ্ডিতভাবে দেখতেন না, ইতিহাসের সামগ্রিক রূপ তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। ঐতিহাসিক উপাদানের বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতাও তাঁর ছিল প্রায় অসাধারণ। ফলত যে নৈপুণ্যে তিনি প্রাচীন ভারতের বা প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের নানা দিক নিয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছেন, সেই দক্ষতাতেই তিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক পর্বের ভারতেতিহাস আলোচনা করেছেন। অক্ষয়কুমারের সময় ইংরেজ লেখকদের (ম্যালেসনকে বাদ দিয়ে) কৃপায় সিরাজউদ্দৌলা নরাধমরূপে নিন্দিত। ম্যালেসনের রচনায় অনুপ্রেরিত অক্ষয়কুমার অধিকতর তথ্যের সাহায্যে সিরাজ-চরিত্রের

১ তদেব, পৃ. ৪০।
২ তদেব, পৃ. ৪৫।

পুনর্বিচারে প্রবৃত্ত হন। এই পুনর্বিচারের সময় তাঁকে 'অনেক স্থলে ব্যথিত হৃদয়ে অপ্রিয় সত্য উদ্‌ঘাটন করে' কালপ্রচলিত সিরাজ-কলঙ্ক অপনোদন করতে হয়েছে।[১] সিরাজউদ্দৌলা দোষ-ত্রুটির ঊর্দ্ধে ছিলেন না, কিন্তু ইংরেজ লেখকদের সেই দোষ-ত্রুটিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বড়ো করে দেখাবার অপচেষ্টার পাল্টা জবাবে অক্ষয়কুমার সিরাজউদ্দৌলাকে কোথাও যদি অজ্ঞাতসারে প্রশংসার ভাগ কিছু বেশি দিয়ে ফেলে থাকেন, তবে তাকে অপ্রত্যাশিত বলা যায় না। সিরাজউদ্দৌলার মতো মীরকাসিমও ইংরেজ ইতিহাসকারদের হাতে অমর্যাদা ছাড়া কিছু পান নি। এবং মীরকাসিমের যথার্থ চরিত্র-উদ্‌ঘাটন করে ইংরেজ লেখক-দের যোগ্য উত্তরদান অক্ষয়কুমার কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। সিরাজের মতো মীরকাসিমও দোষরহিত ছিলেন না, কিন্তু অক্ষয়কুমারের মতে[২] তাঁর 'গুণাবলীরও অভাব ছিল না। স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্য রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর না হইলে মীরকাসিমের সর্বনাশ হইত না।' 'দস্যুদলপতি বিদ্রোহী' রূপে ইংরেজদের বর্ণিত বিস্মৃতপ্রায় বাঙালী বীর সন্তান সীতারাম রায়কেও অক্ষয়কুমার তাঁর প্রাপ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়ে বলেছেন :[৩] 'সীতারামের ইতিহাস যে আমাদেরই গৌরবের ইতিহাস সে কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি ; বাঙ্গালী বলিয়াই সীতারামের ইতিহাসের সমাদর হয় নাই।'

সিরাজউদ্দৌলা বা মীরকাসিমের মতো ব্যক্তি-জীবনের ইতিহাসে যেমন, তেমনি একটি সম্প্রদায়ের উত্থানপতনের আনুপূর্বিক ইতিহাস রচনাতেও অক্ষয়কুমারের পারদর্শিতা তাঁর 'ফিরিঙ্গি বণিক' গ্রন্থে সপ্রমাণ। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসে ফিরিঙ্গি বণিক সমাজের কর্মকৃতি নানাভাবেই আকর্ষণীয় এবং এই কর্মকৃতির সুবিন্যস্ত বিবরণের মাধ্যমে অক্ষয়কুমার তিনটি মূল্যবান সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন :[৪] এক,

---

১ 'সিরাজদ্দৌলার কলঙ্ককাহিনীতে স্বদেশ-বিদেশ সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কলঙ্কের ইতিহাস সর্ব্বজন পরিচিত, কলঙ্কসৃষ্টির ইতিহাস সেরূপ নহে। তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে গিয়া স্বদেশ-বিদেশের অনেক প্রতিভাশালী সাহিত্যসেবকের সুললিত বর্ণনার সমালোচনা করিতে হইয়াছে।....ইতিহাস সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত সুতরাং ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষার জন্য অনেক স্থলে ব্যথিত হৃদয়ে অপ্রিয় সত্য-উদ্‌ঘাটন করিতে হইয়াছে।' সিরাজদ্দৌলা, প. ।০।

২ মীরকাসিম, পৃ. ২।

৩ সীতারাম রায়, পৃ. ৭।

৪ ফিরিঙ্গি বণিক, পৃ. ১৮৮।

অল্পসংখ্যক ফিরিঙ্গিসেনার আক্রমণে বহু সংখ্যক ভারতবাসী পরাভূত হইত, তাহাতে বাহুবলের অভাব সূচিত হইত, বাহুবলের একান্ত অভাব সূচিত হইত না। কারণ সেই ভারতবাসী যখন ফিরিঙ্গি সেনাদলে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া বাহুবলের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন তাহারা অল্পায়াসেই ফিরিঙ্গি সেনার সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল।...নিজস্ব পরিতৃপ্ত প্রাচ্য সভ্যতা পরার্থ-লোলুপ প্রতীচ্য সভ্যতার সহিত প্রথম সংঘর্ষেই পরাভূত হইয়া গিয়াছিল। ইহাই ফিরিঙ্গি-বণিকের অভ্যুদয় লাভের মূল তথ্য।' দুই, 'যে নীতিতে ফিরিঙ্গি-বণিকের অভ্যুদয়, সেই নীতিতেই তাহার অধঃপতন। তাহা সাম্যবাদ নহে, সুবিধাবাদ;—ন্যায়বল নহে, বাহুবল। তাহা পরিণামে যোগ্যতমকেই বিজয়দান করিয়াছে।' এবং তিন, 'ভারতবর্ষ না থাকিলে—ভারত-বাণিজ্যে অর্থোপার্জনের সম্ভাবনা না থাকিলে আধুনিক ইউরোপের পক্ষে নবজীবন লাভ করিতে বিলম্ব ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল।' শেষোক্ত সিদ্ধান্তকে একটু সম্প্রসারিত করে তিনি অন্যত্র মন্তব্য করেছেন:[১] 'এসিয়া ইউরোপকে নবজীবন দান করিয়াছে; ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় এসিয়ার শেষ নিঃশ্বাস অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এসিয়া না থাকিলে ইউরোপ এত বড় হইয়া উঠিত না; ইউরোপ না থাকিলে, এসিয়া এত ছোট হইয়া পড়িত না।'

॥ সাত ॥

অক্ষয়কুমারের লেখনী সাহিত্যিকের, লেখনীয় ঐতিহাসিকের। ফলে তাঁর রচনাবলি কখনও দুষ্পাঠ্য হয়ে ওঠে নি। যে-'উজ্জ্বল ও সরস ভাষা'র উপস্থিতি রবীন্দ্রনাথ 'সিরাজদ্দৌলা'য় প্রত্যক্ষ করেছেন, সাধারণ-ভাবে বলতে গেলে, সেই ভাষাই তাঁর উল্লেখ্যসংখ্যক ঐতিহাসিক নিবন্ধকে সাহিত্যকৃতির স্তরে উন্নীত করেছে। নিজেকে 'শুষ্ক ঐতিহাসিক'[২] রূপে বর্ণনা করলেও অক্ষয়কুমার তাঁর সাহিত্যলগ্নতাকে লুকোতে পারেন নি। অক্ষয়কুমারের লেখকজীবনের সূত্রপাত কাব্য-রচনায়, ইতিহাসের রুক্ষ প্রান্তরেও তাই কখনও কখনও কবিতার স্নিগ্ধচ্ছায়া এসে পড়েছে। নস্ট্যালজিয়ার টানে লেখক কখনও কখনও ইতিহাসের ডাঙা ছেড়ে ভাবের সমুদ্রে গিয়ে পড়েছেন। সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকালীন বাংলাদেশের

১ তদেব, পৃ. ১৮৫।
২ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (সাহিত্যসাধক চরিতমালা), প, ৪১।

চিত্রাঙ্কনকালে অক্ষয়কুমার বেদনার্ত :[১] 'সে দিন আর নাই। এখন আমরা সভ্য হইয়াছি। বালকেরা দন্তোদ্‌গমের পূর্বেই ক, খ ধরিয়া পাঁচ ঘণ্টা স্কুলের কঠিন কাষ্ঠাসনে কখন দাঁড়াইয়া, কখন বা বসিয়া, বৈকালে গৃহশিক্ষকের তীব্র তাড়না সহ্য করিয়া, আহার না করিতেই ঘুমাইয়া পড়ে, যুবারা হা অন্ন, হা অন্ন করিয়া চাকরীর আশায়, উমেদারীর আশায়, কখন বা শুধু একখানি প্রশংসাপত্র পাইবার আশায়, দেশে ছুটাছুটি করিয়া অল্পদিনেই অধ্যয়নক্লিষ্ট দুর্বলদেহে নিতান্ত অসময়েই স্থবিরত্ব লাভ করে ; বৃদ্ধেরা অনাবশ্যক উৎসাহে সেকালের জীর্ণ খুঁটার সঙ্গে উড্ডীয়মান জাতীয় জীবনকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় দলাদলির বৈঠক করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি করেন ; আর সমাজের যাঁহারা লক্ষ্মীরূপিণী সেই অর্দ্ধাঙ্গিনীগণ অর্ধ অবগুণ্ঠনে স্বামীপুত্রের সঙ্গে দেশে দেশে ফিরিয়া কেবল অনাবশ্যক রূপে চিকিৎসকের এবং স্বর্ণকারের ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। এ সকল যদি একালের সুখের চিত্র বলিয়া গর্ব করিতে পারি, তবে সেকালে দেশের লোকের সুখশান্তির একেবারেই অভাব ছিল বলিয়া উপহাস করা শোভা পায় না।'

।। আট ।।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র রচনাবলি এবং ঐতিহাসিক বিচার-প্রণালী আলোচনার পর একটি বিশেষ ও একটি সাধারণ প্রশ্নের মুখোমুখী হতে হয়। প্রথম প্রশ্ন স্বয়ং অক্ষয়কুমার সংক্রান্ত : 'ন্যায়নিষ্ঠ বিচারপতি'র আসন গ্রহণে অভিলাষী অক্ষয়কুমার কি কোন কোন ক্ষেত্রে বিচারপতির মঞ্চ থেকে নেমে কৌঁসিলীর ভূমিকা নেন নি? দ্বিতীয় প্রশ্ন : র‍্যাঙ্কের পদ্ধতিতে শুধুমাত্র শুকনো তথ্যের সমাবেশে সত্যোদ্‌ঘাটন সম্ভব? এবং সত্য কি সম্পূর্ণভাবে দেশ-কাল-ব্যক্তিমন-নিরপেক্ষ হতে পারে? দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে, নেমিয়ার সাহেবের মতো আমারও প্রতীতি,[২] যেহেতু

---

১ সিরাজদ্দৌলা, পৃ. ৭-৮।

২ History is...necessarily subjective and individual conditioned by the interest and vision of the historian. L. B. Namier's *Avenues of History*, p. 6. অন্য একজন লেখকের উক্তি : History is once more consciously, almost self-consciously, allying itself with the literature. Clio has prevailed over Ranke and we are no longer ashamed of the personal angle or the purple patch. V. H. Galbraith's *An Introduction to the Study of History*, pp. 75-76.

ইতিহাস-রচনায় কালি-কলমের সঙ্গে মনও কাজ করে, ইতিহাস তাই কখনোই একান্তভাবে তন্ময় রচনা হতে পারে না ; ঐতিহাসিকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যক্তি বা বিষয়বিশেষে উৎসাহ আগ্রহ ইত্যাদি ইতিহাস-রচনার ভঙ্গী-পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করবেই। ইতিহাস-সংক্রান্ত এই সারাৎ-সারের আলোকে প্রথম প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট হয়ে আসে : অক্ষয়কুমার একাধিক ক্ষেত্রে, হয়তো অজ্ঞাতসারেই, কৌঁসিলীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।[১] বোধ করি এর দীপ্ত দৃষ্টান্ত 'সিরাজদ্দৌলা', যে-দৃষ্টান্ত অক্ষয়কুমারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রবীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি।[২] সমগ্র 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থে সিরাজের প্রতি লেখকের পক্ষপাত ও দুর্বলতা সোচ্চার না হলেও তা মৃদুভাবে স্থায়ী সুরের মতো বেজে গেছে। সিরাজউদ্দৌলার কাহিনী প্রসঙ্গে লেখক যখন বলেন,[৩] 'সে ইতিহাস কেবল সিরাজদ্দৌলার মর্ম্মবেদনার ইতিহাস নহে, তাহা আমাদিগের পূজনীয় পিতৃপিতামহের ইতিহাস', তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না লেখক অজ্ঞাতসারে সিরাজউদ্দৌলাকে পূজনীয়ের আসনে বসিয়েই সেই কাহিনী-বয়নে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। অনুরূপভাবে, অতীত-বাংলায় কৃষকসাধারণ নিরবচ্ছিন্ন সুখে কালাতিপাত করত এমন অতিশয়োক্তিও অক্ষয়কুমারের কাছে থেকে শোনা যায়। তিনি যখন বলেন,[৪] সেকালে দেশে শত অরাজকতা সত্ত্বেও 'কৃষককুটীরে তাহার ছায়াস্পর্শ হইত না। কৃষক যথাকালে হলচালনা করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া যথাসম্ভব নিরুদ্বেগেই কালযাপন করিত,' তখন মনে হয় অক্ষয়কুমার যুক্তির শক্ত মাটি ছেড়ে কল্পনার দূর আকাশে বিচরণ করছেন।

১ সমান্তরাল উদাহরণস্বরূপ কাশীপ্রসাদ জয়শওয়ালের (১৮৮১-১৯৩৭) কথা মনে পড়ছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে 'গণতন্ত্র' ছিল এবং 'প্রাচীন ভারতীয় রাজা ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা'—এই তত্ত্ব প্রমাণে জয়শওয়াল তাঁর বিখ্যাত *Hindu Polity* গ্রন্থে যে ভূমিকা নিয়েছেন, তা বিচারকের নয়, বিদগ্ধ ব্যারিস্টারের।

২ 'গ্রন্থকার যদিচ সিরাজ-চরিত্রের কোন দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করেন নাই, তথাপি কিঞ্চিৎ উদ্যম সহকারে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন' : রবীন্দ্র রচনাবলী (শতবার্ষিক সংস্করণ), চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৪৭৪।

৩ সিরাজদ্দৌলা, পৃ. ৪।

৪ তদেব, পৃ. ৫।

॥ নয় ॥

এই মানবিক ত্রুটির জন্যই হয়তো অক্ষয়কুমারের রচনা[১] ধূসর পাণ্ডিত্যের পরিবর্তে সপ্রাণ বৈদগ্ধ্যে স্পন্দিত ও দীপ্যমান। তাঁর বর্ণনা বিবর্ণ নয়, এবং সেই কারণে আজও 'সিরাজদ্দৌলা', বা 'ফিরিঙ্গি বণিক' উপন্যাসের মতোই সুখপাঠ্য। 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র প্রবর্তনায় তিনি দুঃসাহসী গবেষক, 'সিরাজদ্দৌলা' 'মীরকাসিমে' তিনি মুক্তমনন ঐতিহাসিক ও স্বদেশপ্রেমী লেখক এবং মাতৃভাষায় রচিত সাতটি গ্রন্থে এবং অসংখ্য প্রবন্ধে তিনি বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক। তাঁর রচনায় যে ত্রুটি-ভ্রান্তি চোখে পড়ে, মনে রাখতে হবে, তা ঐতিহাসিক বিচার-প্রণালীজনিত নয়, তথ্যের অপ্রতুলতাপ্রসূত। তৎকাললভ্য ঐতিহাসিক উপাদানের ব্যবহারে অক্ষয়কুমার বরং অনেক লেখকের চাইতে অধিকতর বিশ্লেষণী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুত, তিনি ছিলেন আজীবন ঐতিহাসিক সত্যের পূজারী। একবার কোন পুস্তক-প্রকাশক এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে কারও স্বার্থ রক্ষা করে একটি স্কুলপাঠ্য ভারত-ইতিহাস প্রণয়নের অনুরোধ জানালে দরিদ্র অক্ষয়কুমার ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।[২]

যে-বাঙালী মনীষীর নাম স্মরণে তাঁর নামকরণ হয়েছিল, সেই অক্ষয়কুমার দত্তের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়ে তিনি একবার বলেছিলেন : 'তিনি যেরূপ স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত অনুশাসন-পদ্ধতির অবতারণা করিয়াছিলেন—বাঙ্গালী না হইলে অথবা উপেক্ষিত বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা না করিলে,—তাহাতেই তাঁহার নাম পাশ্চাত্ত্য সমাজে চিরস্মরণীয় হইত।'

স্বীয় সাহিত্যগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা উচ্চারণের সময় তিনি অজান্তে তাঁর প্রতি আমাদের মনোভাবকেই ব্যক্ত করে গেছেন, ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

১ অক্ষয়কুমারের বাংলা রচনাবলিই বর্তমান প্রবন্ধের উপজীব্য। তাঁর ইংরেজী রচনার একটি তালিকা *Modern Review* 1952 March-এ প্রকাশিত হয়েছে।

২ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (সাহিত্যসাধক চরিতমালা), পৃ. ২৩।

বহুমুখী স্বদেশ-সন্ধিৎসা, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে। তিনি ছিলেন পিতা মতিলাল ও মাতা কালীমতীর একমাত্র পুত্র। অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত ঢাকা জেলার সাগরদী গ্রামে আদি বাসস্থান হলেও মতিলালের পূর্বপুরুষেরা পরবর্তী কালে মুর্শিদকুলি খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় লালবাগের (সম্প্রতি দহপাড়া নামে পরিচিত) অপরদিকে বসতি স্থাপন করেন। পলাশির যুদ্ধের সময় তাঁরা নবাব সিরাজউদ্দৌলার পক্ষে ছিলেন, ক্লাইভের হাতে তাঁর পরাজয়ের ফলে তাঁদের লালবাগ ছেড়ে চলে যেতে হয়। এই কারণে সম্ভবত মতিলাল ইংরেজপন্থী হতে পারেন নি। বহরমপুরের স্বনামধন্য আইনজীবী মতিলালের ছিল গভীর আত্মমর্যাদাবোধ, যা তাঁর বিখ্যাত পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। কথিত আছে, জনৈক ইংরেজ বিচারক মফঃস্বলের আইনজীবী সম্প্রদায়কে 'অর্ধশিক্ষিত' বলে মন্তব্য করলে মতিলাল সতেজ প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, 'এক-চতুর্থাংশ শিক্ষিত' বিচারকমণ্ডলী এর চেয়ে ভালো কিছু প্রত্যাশা করতে পারেন না।[১]

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পর রাখালদাস প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে স্নাতক হন। তারপর তাঁর পড়াশোনায় কিছু বাধাবিঘ্ন দেখা দেয়, অবশেষে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইতিহাসে স্নাতকোত্তর উপাধি পান। প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো বিখ্যাত পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন, যার ফলে তিনি পরবর্তী কালে ঐ ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও শরৎচন্দ্র বসুর মতো পরবর্তী কালের খ্যাতনামা জাতীয়তাবাদী নেতারা তাঁর সহপাঠী ছিলেন, এবং সম্ভবত তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তাঁর সহজাত আত্মমর্যাদাবোধ তথা জাতীয়তাবোধের বিবর্ধনে সাহায্য করেছিল।

১ *Reminiscences, Speeches and Writings of Gurudas Banerjee*, *U. C. Banerjee* কর্তৃক সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৯২৭) পৃ. ৩৭।

১৯০৫ সাল নাগাদ হুগলি জেলার উত্তরপাড়া নিবাসী বিখ্যাত জমিদার নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কাঞ্চনমালার সঙ্গে রাখালদাসের বিবাহ হয়। তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অসীমের অকালে মৃত্যু হয়। কনিষ্ঠ অদ্রীশ এখনো জীবিত ও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণে ভারততত্ত্বে পণ্ডিত হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছাড়া দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, থিয়োডোর ব্লক এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও রাখালদাসকে প্রভাবিত করেছিলেন। তাঁরা এই তরুণ স্বদেশ-সন্ধিৎসুর মনে ভারতবর্ষের গৌরবময় প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে অনুরাগ সঞ্চার করেন। একদিকে যেমন তাঁর প্রত্নবস্তুর আলোকচিত্র-সংগ্রহ ভাণ্ডারকরের প্রশংসা পেয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি থিয়োডোর ব্লকের মাধ্যমে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন ঐতিহাসিক, বিশেষত প্রত্ন-তাত্ত্বিক গবেষণার পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতির সঙ্গে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও প্রত্নতত্ত্ব ও শিল্পকলায় তাঁর আগ্রহকে বৃদ্ধি করেছিলেন এবং ত্রিবেদী মহাশয়ের নির্দেশেই তিনি ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্য পুরাবস্তু সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। এইভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশের মানস-প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষ হওয়ার আগেই লক্ষ্ণৌ যাদুঘরে রক্ষিত প্রত্নবস্তুগুলির তালিকা প্রণয়নের কাজে অংশগ্রহণ করে তিনি প্রাচীন নিদর্শনাদির প্রতি অনুরাগের ও গবেষক-সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দেন।

॥ দুই ॥

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার প্রতি রাখালদাসের আকর্ষণ খুব বেশি দিন অলক্ষিত থাকে নি। স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ১৯১০ সালে ভারতীয় যাদুঘরে Archaeological Assistant-এর পদে বৃত হন; এখানেই তিনি থিয়োডোর ব্লকের সংস্পর্শে আসেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯১১ সালে তিনি Archaeological Survey of India-তে সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদে উন্নীত হন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অবৈতনিক অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৭ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত তিনি Archaeological Survey of India-র পশ্চিম ভারতীয় শাখার এবং ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত পূর্ব ভারতীয় শাখার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।[১] ১৯২৮ সালে তিনি সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে বেনারস

১ অসুস্থতার জন্য তিনি নতুন কার্যভার গ্রহণে কিছু সময় নিয়েছিলেন।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান-রূপে মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অধ্যাপকপদে যোগ দেন।[১] ১৯৩০ সালে অকালে মৃত্যুবরণের আগে পর্যন্ত তিনি সেই পদ অলঙ্কৃত করেছেন।

ধনী পিতার পুত্র ও বিত্তশালী জমিদারের জামাতা রাখালদাস আড়ম্বর-পূর্ণ জীবন কাটাতে ভালোবাসতেন। অতিথিসেবায় তিনি ছিলেন উদার ও দানশীল। উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত ও নিজের অর্জিত সমস্ত সম্পত্তি তিনি অকাতরে ব্যয় করতেন। এর ফলে জীবনের শেষ দিকে তাঁকে আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং কিছুটা কষ্টের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়।[২]

রাখালদাসের স্বল্পপরিসর জীবন নানা প্রত্নতাত্ত্বিক কাজকর্ম ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ লেখায় প্রদীপ্ত। মূলত তিনি ছিলেন একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এবং তাঁর প্রধান কৃতিত্ব ১৯২২-২৩ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কার। যুগান্তকারী এই আবিষ্কারে প্রমাণিত হলো যে, ভারতীয় সভ্যতা প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম অন্যান্য সভ্যতাগুলির সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিল। মহেঞ্জোদাড়োয় একটি বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ খনন করার সময় রাখালদাস চিত্রলিপিতে উৎকীর্ণ এমন কিছু সীলমোহর পেয়েছিলেন, যার সঙ্গে কিছুকাল পূর্বে পাঞ্জাবের হড়প্পায় পাওয়া সীলমোহরের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই এই আবিষ্কারের তাৎপর্য বুঝতে পারলেন এবং তাঁরই পরামর্শে স্যার জন মার্শাল স্থানটিতে খননকার্য শুরু করেন। রাখালদাসের আবিষ্কারের সম্পূর্ণ গুরুত্ব বোঝা গেল, যখন মহেঞ্জোদাড়ো ও হড়প্পা থেকে পাওয়া বস্তুগুলির তুলনামূলক বিচার থেকে মার্শাল এমন এক প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সন্ধান পেলেন যা তখন পর্যন্ত জানা যে-কোন সভ্যতা থেকে অনেক বেশি প্রাচীন। তা ছাড়া এটাও প্রমাণিত হলো যে, মহেঞ্জোদাড়োয়

১ অদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বলেছেন, তাঁর পিতা প্রশাসনিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন। মহেঞ্জোদাড়োর 'নেটিভ' আবিষ্কর্তা স্যার জন মার্শালের উত্তরাধিকারী হিস্যবে Archaeological Survey of India-র ডিরেক্টর-জেনারেল হয়ে যেতে পারেন, এই আশঙ্কায় কতিপয় ইউরোপীয় অফিসার তাঁর বিরুদ্ধে এক চক্রান্ত করেন। বলা বাহুল্য, এতে কিছু ভারতীয়ও যোগ দিয়েছিলেন।

২ অদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে আরও বলেছেন, বেশ কিছু সংখ্যক লোক বিভিন্ন সময়ে তাঁর পিতার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন। অপরিশোধিত সেই ঋণের পরিমাণ নাকি এক লক্ষ টাকার কাছাকাছি।

এক উন্নত নাগরিক জীবন গড়ে উঠেছিল এবং শহরের অধিবাসীদের সমাজ-ব্যবস্থা ছিল সমসাময়িক সুমেরবাসীদের, সমকক্ষ এবং ব্যাবিলোনিয়া ও মিশরবাসীদের চেয়ে অনেক ভালো। এই আবিষ্কারের ফলে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব উৎসাহের সঞ্চার হয় এবং দেশের বিভিন্ন অংশে অনুসন্ধান ও খননকার্য চালাবার জন্য সরকার আরো উদারভাবে অর্থ মঞ্জুর করেন। এরপর ১৯২৫-২৬ সালে উত্তরবঙ্গের রাজশাহি জেলার পাহাড়পুরে খননকার্য শুরু হয়। এর ফলে মধ্যযুগীয় বাংলার প্রথম পর্বে সোমপুরে নির্মিত বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহারের সাধারণ রূপ, ভূমি-নকশা ও মন্দিরের অলঙ্করণের বৈচিত্র্য রাখালদাস সর্বপ্রথম দেখাতে সমর্থ হন।

॥ তিন ॥

ক্ষেত্রীয় প্রত্নতত্ত্ব ছাড়া লেখতত্ত্ব, প্রাচীন লিপিতত্ত্ব, মুদ্রাবিদ্যা, প্রাচীন মূর্তি ও শিল্পতত্ত্ববিচার প্রভৃতি ইতিহাসের অন্যান্য শাখাতেও রাখালদাস নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। বাস্তবিকই তিনি ছিলেন এ সব বিষয়ে একজন উঁচুদরের বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক উপাদান বিশ্লেষণে সুদক্ষ ব্যক্তি। লেখতত্ত্ব-বিশারদ হিসেবে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৯০৯ সালে *Journal of the Asiatic Society of Bengal* পত্রিকায় লক্ষ্মণ-সেনের মাধাইনগর তাম্রশাসন সম্পাদনার মাধ্যমে। পরবর্তী কালে তিনি আরো অনেক অভিলেখ সম্পাদনা করেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : লক্ষ্মণ-সেনের তর্পণদীঘি তাম্রশাসন, বল্লালসেনের নৈহাটী তাম্রশাসন, বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসন, ভোজবর্মনের বেলবা তাম্রশাসন এবং মালয় থেকে প্রাপ্ত মহানাবিক বুধগুপ্তের শীলমোহর-লিপি। লেখতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান লিপিতত্ত্বে গভীর ব্যুৎপত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর সম্পাদিত লেখ-গুলির লিপিতত্ত্ব সম্বন্ধে টীকা ও ক্ষুদ্র রচনা ছাড়াও তিনি এ বিষয়ে দুটো স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন : (১) Origin of the Bengali Script (১৯১৯) এবং (২) Palaeography of the Hathigumpha and Nanaghat Inscriptions (১৯২৯)। লিপিতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর অধিকাংশ রচনাতে সংশ্লিষ্ট প্রাচীন অক্ষরগুলি সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ও প্রাজ্ঞ আলোচনা রয়েছে এবং বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি ব্যুহলার ও কীলহর্নের মতো অগ্রগণ্য পণ্ডিতদের সঙ্গে মতৈক্য পোষণ না করে স্বাধীন চিন্তাশক্তির পরিচয় রেখেছেন।

মুদ্রাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও রাখালদাসের কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্পষ্ট। তাঁর মুদ্রা বিষয়ক সর্বপ্রথম প্রবন্ধ Notes on Indo-Scythian Coinage শিরোনামে প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে *Journal of the Asiatic Society of Bengal*-এর Numismatic Supplement শোধপত্রে। এর পরে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়: যেমন, Punch-marked Coins from Afghanistan (*Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Numismatic Supplement, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৯১০) এবং A New Type of Audumbara Coinage (তদেব, ১৯১৪, Numismatic Supplement, দশম সংখ্যা)। শেষের প্রবন্ধটিতে প্রাচীন ভারতীয় জনগোষ্ঠী ঔদুম্বরদের সম্বন্ধে এক বিস্তৃত বিবরণ স্থান পেয়েছে। পাঞ্জাবের কাঙড়া জেলার ইড়িপ্পালে এদের বহুসংখ্যক তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ার আগে এই জনগোষ্ঠীর স্বল্পসংখ্যক মুদ্রার কথা জানা ছিল। এই প্রবন্ধে রাখালদাস ঔদুম্বরদের ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্বের ইতিহাসে এক দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।[১] মুদ্রা সম্পর্কীয় কিছু বিক্ষিপ্ত রচনা ছাড়াও ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'প্রাচীন মুদ্রা' নামে মাতৃভাষায় এক সুপাঠ্য গবেষণা-গ্রন্থ লেখেন। প্রাচীনতম কাল থেকে মুসলমানদের আবির্ভাব পর্যন্ত ভারতীয় মুদ্রার এক প্রাঞ্জল অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় এই গ্রন্থ সমৃদ্ধ।

॥ চার ॥

শিল্পকলা ও মূর্তিতত্ত্বের উপাদানসমূহের ব্যবহারেও তিনি কম সিদ্ধহস্ত ছিলেন না। তিনি এসব বিচার করেছেন তাঁর স্বভাবজ অধ্যবসায়, পুঙ্খানুপুঙ্খতা ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। মধ্যপ্রদেশের ভূমারা, উড়িষ্যার গন্ধারদি প্রভৃতি জায়গার মন্দিরগুলির মতো গুরুত্বপূর্ণ বহু স্মৃতিসৌধ বা স্তম্ভ সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতা তিনি সরজমিনে লাভ করেন। মধ্যপ্রদেশের ত্রিপুরী

১ এই জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য আমার *The Audumbaras* (কলিকাতা, ১৯৬৫) এবং *A Tribal History of Ancient India* (কলিকাতা, ১৯৭৪)-র চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সেই রাখালদাস পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কাছ থেকে 'ভারতীয় লেখতত্ত্ব ও মুদ্রাতত্ত্বের ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিচিত গবেষকদের অন্যতম' হিসাবে অভিনন্দন ও প্রশংসা পেয়েছিলেন। বিশেষ করে তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন তাঁর 'নিরপেক্ষ মানসিকতা এবং নির্ভুল পদ্ধতি ও নির্ভরযোগ্য উপাদান ব্যবহারে'র জন্য। দ্রষ্টব্য *Journal of the Royal Asiatic Society*, ১৯১৭, পৃ. ৮৫৩-৫৪।

অঞ্চলে হৈহয় রাজাদের আমলে নির্মিত স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন সম্পর্কে তাঁর গভীর ও বিস্তৃত অধ্যয়নের ফসল *Haihayas of Tripuri and their Monuments* (১৯২২ সালে লিখিত, কিন্তু মৃত্যুর পরে ১৯৩১-এ প্রকাশিত)। তাঁর *Temple of Bhumara* (১৯১৯)-তে রাখালদাস কিভাবে একটি পুরা মন্দিরকে সমস্ত আঙ্গিক থেকে বিচার করা যায় তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। *Bas Reliefs of Badami* (১৯২৮)-তে পাওয়া যায় মহারাষ্ট্রের বাদামী অঞ্চলের গুহাগুলির সমৃদ্ধ ভাস্কর্য-নিদর্শনের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা। রাখালদাসের পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের সর্বোত্তম উদাহরণ বোধ হয় তাঁর *Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture* নামীয় মহাগ্রন্থ (তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত)। প্রধানত বাংলা ও বিহারে পাল-সেন রাজাদের আমলের সংখ্যাবহুল এবং মনোজ্ঞ ভাস্কর্যকর্ম এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, এই গ্রন্থে আলোচিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় নিদর্শন লেখকের নিজের আবিষ্কার।

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য বিশ্লেষণ ছাড়াও রাখালদাস বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজে সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে রচিত (কিন্তু মৃত্যুর পরে ১৯৩১ সালে প্রকাশিত) তাঁর *Age of the Imperial Guptas* ও দু খণ্ডে সম্পূর্ণ *History of Orissa* (১৯৩০-৩১) এই মন্তব্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ছ'টি অধ্যায়ে বিভক্ত *Age of the Imperial Guptas* গুপ্তরাজাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের সুলিখিত ইতিবৃত্তই শুধু নয়, এতে সমসাময়িক শিল্পকলা, স্থাপত্য, ধর্ম, সাহিত্য ও মুদ্রা প্রভৃতি বিষয় নিয়েও আলোচনা রয়েছে। তথ্য সঙ্কলনের কথা বাদ দিলেও বইটিতে তৎকালীন যুগচেতনার ও জাতীয় আত্মবিকাশের বহুমুখী প্রকাশের অনুপম পরিচয় আছে। বস্তুত, একটি রাজবংশকে কেন্দ্র করে লেখা এ ধরনের বই এই প্রথম! প্রকৃতপক্ষে, কিছুদিন আগে পর্যন্তও এটা ছিল গুপ্তযুগের উপর সবচেয়ে ভালো বই এবং আমার মতে নতুন আবিষ্কার ও গবেষণার আলোকে এ বই পুনঃপ্রকাশের যোগ্য। *History of Orissa* সম্পর্কেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। ত্রিশটি অধ্যায় ও বেশ কয়েকটি পরিশিষ্ট নিয়ে গঠিত এই ব্যাপক ও বিরাট গ্রন্থ কেবলমাত্র বিভিন্ন উপাদান থেকে সংগৃহীত তথ্যের প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ নয়, তাদের উপস্থাপন ও ব্যাখ্যার দিক দিয়েও অনন্য। মাতৃভাষায় লেখা দু খণ্ডে সম্পূর্ণ 'বাঙ্গালার ইতিহাস'ও (১৯১৫, ১৯১৭) একই রীতি ও রচনা-পদ্ধতির দৃষ্টান্ত। এতে প্রাচীনতম কাল থেকে ১৫৫২-৫৩ সালে শেরশাহের

পুত্র ইসলাম শাহের মৃত্যু পর্য্যন্ত ইতিহাস বিবৃত রয়েছে। বাঙালী হয়েও রাখালদাস মাতৃভূমির কাহিনী রচনার সময়ে প্রায় কখনোই কোন প্রকার সঙ্কীর্ণতা বা পক্ষপাতের দ্বারা চালিত হন নি। পুস্তকটির ভূমিকায় যথোচিত বিনয় সহকারে তিনি বলেছেন যে, প্রায় দশ বছরের পরিশ্রমে সংগৃহীত উপাদানের ভিত্তিতে প্রথম খণ্ড লিখতে গিয়েও তিনি শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের কাঠামোটুকু ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেন নি। কিন্তু লেখকের বিনয় সত্ত্বেও বলা যায়, গ্রন্থটি কেবলমাত্র কাঠামোই নয়, বরং রমেশচন্দ্র মজুমদার ও যদুনাথ সরকারের তত্ত্বাবধানে ও অন্যান্য কয়েকজন লেখকের সহযোগিতায় রচিত *History of Bengal* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৪৩ ও ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত) প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত এটা ছিল বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। রাখালদাসের অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে *Palas of Bengal* (১৯১৫) এবং *Pre-historic Ancient and Hindu India* (মৃত্যুর পরে ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত)। এদের মধ্যে প্রথমটিতে দেওয়া হয়েছে প্রধানত পাল যুগের লেখমালার ওপর ভিত্তি করে বাংলার পাল নরপতিদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, আর দ্বিতীয়টিতে রয়েছে প্রাচীনতম কাল থেকে মুসলমান বিজয় পর্যন্ত ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস। মূলত ছাত্র ও সাধারণ পাঠকদের জন্য লিখিত হলেও গ্রন্থটির উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রত্যেক স্বতন্ত্র যুগের জন্য পাঠ্য গ্রন্থপঞ্জির সংযোজনে, যা সেই বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণায় ইচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে সহায়ক। ভারতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্বলিত *A Junior History of India* (১৯৩০) পাঠ্যপুস্তক রচনার একটি বিনীত ও প্রাথমিক প্রচেষ্টা।

॥ পাঁচ ॥

রাখালদাস মূলত ছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক এবং এই প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যক্তিত্ব তাঁর সামগ্রিক ঐতিহাসিক মানসিকতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। অর্থাৎ তাঁর মতে এমন কোন কিছুই প্রকৃত ইতিহাস নয়, যা লেখ, মুদ্রা, স্মৃতি-সৌধ বা স্তম্ভ প্রভৃতি প্রত্নবস্তুর প্রমাণ দ্বারা অসমর্থিত। তাই যুক্তিসঙ্গত-ভাবেই ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে সাহিত্যের গুরুত্বকে তিনি গৌণ মনে করতেন। এবং এই কারণে 'কুলজী' বা বংশচরিত সম্পর্কিত সাহিত্যে বর্ণিত কৌলীন্য[১] প্রথার তাৎপর্যকে না মেনে তিনি বন্ধু নগেন্দ্রনাথ বসুর বিরোধিতা

১ কৌলীন্য প্রথার অর্থ নির্দিষ্ট কিছু গুণ ও ধর্মের ভিত্তিতে সামাজিক শ্রেণী—

করেছিলেন। কুলীনতাকে অসার উদ্ভট কল্পনা বলে আখ্যা দিয়ে তিনি প্রকৃতই বল্লালসেন এর প্রতিষ্ঠাতা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কারণ বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন ও অন্যান্যদের বিভিন্ন বিবরণীতে কৌলীন্য প্রথার কোন উল্লেখ নেই।[১] আধুনিক কালের কোন কোন ঐতিহাসিকের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন, ইতিহাস একেবারে গোড়া থেকে লেখা উচিত; আর তাই 'বাঙ্গালার ইতিহাস', *History of Orissa* প্রভৃতি তাঁর অঞ্চলভিত্তিক লেখাগুলি ভারতীয় ইতিহাসের সাধারণ রূপ ও বৈশিষ্ট্যকে আরো ভালোভাবে বোঝার পক্ষে সহায়ক। এই আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার সময় তিনি ভুলে যান নি যে, ভারতের যে- কোন স্থানের ইতিবৃত্ত দেশের সামগ্রিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই 'বাঙ্গালার ইতিহাস'-এর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, বাংলাদেশের ইতিহাস-রচয়িতাকে এমনভাবে লিখতে হবে যেন ভারতের অন্যান্য যুগের ইতিহাসের সঙ্গে তার মূল সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হয়। 'ভারতীয় ইতিহাসের যে- সব অতি প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রভাব বাংলাদেশের ইতিহাসের উপর রয়েছে, সেগুলিকে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণনা করে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে তাদের সংক্ষিপ্তসার দিয়ে তিনি তাঁর ভাবধারাকে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে একজন নীরস ঐতিহাসিকের মতো মনে হলেও রাখালদাস শুধুমাত্র তথ্যের দ্বারা ভারাক্রান্ত হন নি; বরং বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের কলাকৌশল সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন, যা ইতিহাসকে সার্থক ও প্রাণবন্ত করে তোলে। এ ছাড়া, বিষয়বস্তুকে সুপাঠ্য ও আকর্ষণীয় করার জন্য তিনি রচনাসৌকর্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেম। এভাবে ইতিহাসকে তিনি সরকারী গেজেটিয়ারের চরিত্র থেকে আলাদা রাখতে চেয়েছিলেন এবং সে কারণে তিনি বাংলায় লেখা যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বিক্রমপুরের ইতিহাস'কে সাধারণ গেজেটিয়ারের বেশি মূল্য দিতে চান নি। ভারতবর্ষের অতীতকে বর্ণনা করতে গিয়ে (যেমন, *Pre-historic Ancient and Hindu India*-তে) অথবা কোন বিশেষ অঞ্চলের ইতিহাসকে পরিস্ফুট করার কাজে (যেমন *History of Orissa* এবং 'বাঙ্গালার ইতিহাস'-এ), রাখালদাস তাঁর লেখাকে অর্থ-পূর্ণ ও জীবন্ত করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন, যদিও মাঝে মাঝে তিনি তাঁর ধূসর গবেষক-সত্তাকে একেবারে এড়াতে পারেন নি। পরিশেষে,

১ 'বাঙ্গালার ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ, ১৯৭১, পৃ, ২৫২।

একটি ব্যাপারে সমসাময়িক অনেকের তুলনায় তিনি অগ্রগামী ছিলেন ঃ ইতিহাসের নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা *Pre-historic Ancient aud Hindu India*-তে সপ্রমাণ। এই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সমস্তটা জুড়েই রয়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি ও তাদের ভাষার আলোচনা। সম্ভবত, পাঠকদের এটা দেখানোই উদ্দেশ্য যে, ভারতের ইতিহাসকে বুঝতে হবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে—রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, জাতিগত এবং সাংস্কৃতিক। আর্য ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফলে হিন্দু ধর্ম বা হিন্দু সংস্কৃতির উদ্ভব, রাখালদাসের এই উক্তিও ঐতিহাসিকভাবে যথাযথ। তা ছাড়া মুসলমান অনুপ্রবেশের আগে দক্ষিণ ভারতে যে সব সমৃদ্ধ ও উন্নতিশীল আর্য-দ্রাবিড় সম্প্রদায় বাস করত তারা শুধু উত্তরেই নয়; ভারতের বাইরে ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ এবং মালয়েও প্রভাব বিস্তার করেছিল।[১]

ঐতিহাসিক রাখালদাসের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী, আমার মনে হয়, পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হিসাবে তিনি পুরাকীর্তিগুলির বিশ্লেষণলব্ধ তথ্যাদির প্রতি তাঁর দৃঢ় আনুগত্য বজায় রেখেছেন। বস্তুত ইতিহাসের অন্যতম উপাদান রূপে সাহিত্যের উপর খুব বেশি নির্ভর করা যায় না—এই ধারণার বশবর্তী হয়েই যে তিনি কুলজী-সাহিত্যে বর্ণিত কৌলীন্য প্রথাকে সরাসরি অগ্রাহ্য করেছিলেন, ইতিপূর্বে এ কথা বলা হয়েছে। রাখালদাস তথ্যের স্তূপ থেকে নিখাদ ও নীরস সত্যকে আবিষ্কার করার প্রয়াসী এবং তাই ঐতিহাসিক র‍্যাঙ্কে প্রবর্তিত Wie es eigentlich gewesen, অর্থাৎ 'ঠিক যেমনটি ঘটেছিল' আদর্শের অনুগামী। এবং বলতে গেলে এ ব্যাপারে তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামকৃষ্ণ-গোপাল ভাণ্ডারকর এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-র মতো পণ্ডিতদের চিন্তাদর্শের শরিক ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এঁরা সবাই ঐতিহাসিক উপাদানের ব্যবহারে সাবধানতা, সংযম ও যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিতার পরিচয় দিয়েছেন। রাজেন্দ্রলাল ও ভাণ্ডারকরের অনুসরণে রাখালদাসও নিজেকে সর্বদা অত্যুগ্র দেশপ্রেম, সঙ্কীর্ণতা ইত্যাদি সব রকমের অনৈতিহাসিকসুলভ দোষত্রুটির উর্ধ্বে রাখার চেষ্টা করতেন। ফলত তিনি তাঁর শিক্ষাগুরু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকেও সমালোচনা করতে ছাড়েন নি, কারণ শাস্ত্রীমশায় অনেক সময় দেশাত্ম-বোধকে ঐতিহাসিকসুলভ নিরপেক্ষতার উপরে স্থান দিতেন। তা ছাড়া

১ *Pre-historic Ancient and Hindu India*, পৃ. ৩০ ইত্যাদি।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় যখন সিরাজউদ্দৌলাকে সুশাসক হিসাবে বর্ণনা করে তাঁর দোষ খণ্ডন করার প্রয়াসী হন, তখনও তিনি তাঁর বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেছিলেন।

এতদ্‌সত্ত্বেও রাখালদাসের রচনার মধ্যে স্বকীয় চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন যে ঘটে নি, এমন নয়; এটা বোধহয় স্বাভাবিক ও অনিবার্য ছিল। ন্যায়নিষ্ঠ এই ঐতিহাসিক একজন সাহিত্যসেবীও ছিলেন, লিখেছিলেন আটখানি উপন্যাস, যার মধ্যে সাতখানি ইতিহাসাশ্রিত। সাহিত্য-শিল্পীর স্বভাবগত আবেগ ও কল্পনা থেকে সব সময় গুরুগম্ভীর ইতিহাস রচনা আত্মরক্ষা করতে পারে নি। তাছাড়া, জাতীয়তাবাদী রাখালদাস যখন কয়েকটি বই লিখছিলেন, ভারতবর্ষে তখন দেশপ্রেমের প্রচণ্ড জোয়ার। সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থার এই প্রতিফলন তাঁর রচনায় দুর্লক্ষ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর *Age of the Imperial Guptas* গ্রন্থে ভারত-আক্রমণকারী শক ও কুষাণদের বিজেতা হিসাবে গুপ্ত রাজাদের তিনি যেভাবে বন্দনা করেছেন, তার মধ্যে যেন ব্রিটিশ-বিরোধী সুর অনুরণিত। স্কন্দগুপ্তের প্রতি তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সমসাময়িক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধাই যেন বাঙ্ময় হয়েছে :[১] ,তিনি (স্কন্দগুপ্ত) ছিলেন মগধের শেষ শ্রেষ্ঠ বীর, যিনি শেষ রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ভারতবর্ষের দ্বার রক্ষা করাকে তাঁর কর্তব্য বলে উপলব্ধি করেছিলেন। এই মহান ব্রত উদ্‌যাপনে তিনি সমস্ত জীবন ব্যয় করেছিলেন এবং পরিশেষে এই পবিত্র দায়িত্ব পালনে সানন্দে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।' তাঁর এই মন্তব্যের অন্তর্গত 'শেষ রক্তবিন্দু', 'মহান ব্রত', 'পবিত্র দায়িত্ব' প্রভৃতি শব্দবন্ধগুলিতে এমন একজন ঐতিহাসিকের মন প্রকাশ পেয়েছে, যিনি তাঁর দেশকে ভালোবাসতেন চিন্তায় এবং গভীরতায়।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনে অশোকের দায়িত্ব সম্পর্কে রাখালদাসের বক্তব্যও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। যদিও একজন শ্রেষ্ঠ রাজা ও শাসক হিসাবে

১ *Age of the Imperial Guptas*, পৃ. ৪২। কৌতূহলের বিষয় এই, রাখালদাস তাঁর এক মন্তব্যে স্কন্দগুপ্তকে 'দেশপ্রেমিক' আখ্যা দিয়ে বলেছেন : 'এক যথার্থ দেশপ্রেমিকের মতো তিনি (স্কন্দগুপ্ত) দেশের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার জন্য সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।' *Pre-historic Ancient and Hindu India*, পৃ. ১৭৫।

অশোকের সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল, তথাপি তিনি মন্তব্য না করে পারেন নি যে, মৌর্য সম্রাটের কঠোরভাবে অনুসৃত অহিংসা নীতি সাম্রাজ্যের জীবনীশক্তিকে হরণ করে তার পতনের পথ প্রশস্ত করেছিল। তাঁর ভাষায় :[১] 'তাঁর (অশোকের) আদর্শ ও ধর্মীয় উন্মাদনা সেনাবাহিনীর মানসিকতাকে যথেষ্ট পরিমাণে নষ্ট করে দিয়েছিল। তিনি যখন 'ধর্ম'কেই প্রকৃত বিজয় বলে মত প্রচার করেছিলেন এবং প্রজাদের বলেছিলেন যে, তাঁর আমলেই 'ভেরীঘোষ' 'ধর্মঘোষ'-এ পরিণত হয়েছে, তখনই মৌর্য সাম্রাজ্যের মৃত্যু-সঙ্কেত বেজে উঠেছিল।'

যদি উপরের অংশটিতে রাখালদাসের মানসতা নির্ভুলভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে, তবে বলা যেতে পারে, তাঁর মধ্যেও ছিল সমসাময়িক উগ্রপন্থী ও সন্ত্রাসবাদীদের মনোভাব, যাঁরা গান্ধীজী-প্রবর্তিত অহিংসা আন্দোলনের কার্যকারিতায় বিশ্বাস করতে পারেন নি।

রাখালদাসের দেশাত্মবোধ আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসগুলিতে, বিশেষ করে 'করুণা'য়, যেখানে স্কন্দগুপ্ত নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ। 'করুণা'র অন্যতম বিশিষ্ট চরিত্র অগ্নিগুপ্ত হূণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাঁর আদর্শের জন্য, যা ছিল—'মাতৃভূমির রক্ষার্থে রণক্ষেত্রে জয়লাভ অথবা মৃত্যুবরণ।' সুতরাং কোন পার্থক্য ছিল না তাঁর সঙ্গে আমাদের সেই দেশপ্রেমিকদের আদর্শের, যাঁদের অধিকাংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন।

শুধু স্কন্দগুপ্ত বা অগ্নিগুপ্তই নন, যিনিই দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন, তিনি কোন ব্যক্তিই হোন বা কোন জাতিই হোন, তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছে এই ঐতিহাসিকের সহানুভূতি ও সমবেদনা। দক্ষিণ ভারতীয়দের প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা, কারণ তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে মুসলমান আক্রমণকারীদের দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করেছেন। পক্ষান্তরে, উত্তর ভারতের হিন্দুদের সমালোচনায় তিনি বলেছেন—'উত্তর ভারতের হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য ও সংঘবদ্ধতার অভাব তাদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। তাদের মধ্যে বিজয়নগরের কৃষ্ণদেবরায় বা হরিহরের মতো দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড়ী হিন্দুদের গুণাবলির অভাব ঘটেছিল।'[২]

প্রসঙ্গত স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, রাখালদাসের রচনার মধ্যে হিন্দু

১ *Pre-historic Ancient and Hindu India*, পৃ. ১০৩।

২ তদেব, পৃ. ৩০৫।

জাতীয়তাবাদের সুর অনুচ্চারিত নয়। তাঁর গ্রন্থ *Pre-historic Ancient and Hindu India* নামের মধ্যে 'হিন্দু' শব্দটির উপর স্পষ্ট জোর এর প্রমাণ দেয়। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, মুসলমান আক্রমণকারীদের কাছে হিন্দুদের নতিস্বীকার তাঁকে আপাতদৃষ্টিতে ব্যথিত করেছিল। শুধু ইসলামই নয়, একইভাবে বৌদ্ধ ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতেও তিনি ছিলেন নৈষ্ঠিক হিন্দু। তাই একজন মহান রাজা ও শাসক হিসাবে শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তিনি অশোকের ধর্মীয় নীতিকে সমর্থন করতে পারেন নি, কারণ তাঁর মতে, এ নীতি ছিল প্রচণ্ডভাবে বৌদ্ধ ধর্ম-প্রভাবান্বিত। এমন কি অশোককে তিনি একজন অন্ধ ও গোঁড়া বৌদ্ধ বলতেও ছাড়েন নি এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির দিক থেকে তাঁকে এক সময় আওরঙ্গজেবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে[১] 'যে রকম আওরঙ্গজেবের গোঁড়ামি রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়েছিল এবং পরবর্তী কালে মুঘলদের পঙ্গু করে দিয়েছিল, ঠিক অনুরূপভাবে অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ এবং সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের রীতিনীতির প্রতি অসহিষ্ণুতা নিশ্চিতভাবেই সমগ্র সাম্রাজ্য জুড়ে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল।'

বাঙালী হিন্দু রাজা শশাঙ্কের ক্ষেত্রেও এই ঐতিহাসিকের বৌদ্ধ ধর্ম-বিরোধী মনোভাব আরো বেশি স্পষ্ট হয়েছে। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে য়ুয়ান চোয়াঙ-এর সমালোচনাকে তিনি এই বলে খারিজ করেছেন যে, সেগুলো মূলত একজন হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর অভিযোগ। সেই সঙ্গে তাঁর 'শশাঙ্ক' উপন্যাসে তিনি হিন্দু-বৌদ্ধ সংঘর্ষকে কিছুটা চড়া রঙে এঁকেছেন।

এই সূত্রে উল্লেখ্য রাখালদাসের আর-একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : বাংলা ও বাঙালী সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। শশাঙ্ক ও ধর্মপালের মতো বাঙালী রাজারা ছিলেন তাঁর সেই সেই নামের উপন্যাস দু'টির নায়ক। সম্ভবত তাঁর ধারণা ছিল, শশাঙ্কের হাতে থানেশ্বরের বর্ধনবংশীয় রাজা রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের পরাজয়ের ফলেই বাণভট্ট ও য়ুয়ান চোয়াঙের মতো হীন স্তাবকেরা তাঁদের লেখায় বাংলার রাজার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন। তাই রাখালদাস বাণভট্ট ও য়ুয়ান চোয়াঙকে থানেশ্বরের রাজাদের প্রশস্তিকারধর্মী লেখক বলে অভিহিত করেছেন এবং শশাঙ্কের বিরুদ্ধে তাঁদের মন্তব্যগুলিকে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্য- প্রণোদিত বলে গ্রহণ করেন নি। বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ একটু সূক্ষভাবে

১ তদেব, পৃ, ৯২।

প্রকাশ পেয়েছে এই মন্তব্যে :[১] 'অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে উত্তর ভারতের পূর্বস্থ প্রদেশসমূহে শিল্পকৃতি চমৎকারিত্ব, উৎকর্ষ ও ব্যাপ্তির বিচারে এমন এক স্তরে উঠেছিল, যার কাছাকাছি উত্তর ও দক্ষিণের অন্যান্য প্রদেশগুলি পৌঁছতে পারে নি। এ ব্যাপারে পাল- ও সেন- বংশীয় রাজারা অন্য সবাইকে শ্রেষ্ঠতায় অতিক্রম করেছিল। এমন-কি কনৌজের গর্বিত গুর্জর-প্রতিহার, ত্রিপুরীর হৈহয়, শাকম্ভরীর যুদ্ধপ্রিয় চাহমান, উজ্জয়িনী ও ধারার পরমার, এবং অনহিলপাটকের দর্পিত চৌলুক্য—এই প্রত্যেক রাজবংশই পাল ও সেনদের প্রথম স্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। মহারাষ্ট্র, গুজরাত, রাজপুতানা এবং অন্তর্বেদীতে কম বেশি যথেষ্ট মধ্যযুগীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু কোথাও তাদের সমগ্র সংখ্যা বাংলা ও বিহারে প্রাপ্ত যে- কোন এক শতাব্দীর মোট উৎপাদনের সঙ্গে তুলনীয় নয়।'

সুতরাং ইচ্ছা বা চেষ্টা সত্ত্বেও সবসময় তিনি কঠোর ও ঐতিহাসিক-সুলভ শান্ত নিস্পৃহতা দেখাতে পারেন নি। কখনো কখনো তাঁর সহানুভূতি ইতিহাসের উপর কল্পনার প্রলেপ দেবার প্রয়াস পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, শশাঙ্কের ক্ষেত্রে, তাঁর ভূমিকা সমর্থক আইনজীবীর, নিরপেক্ষ বিচারকের নয়।[২] একইভাবে তিনি সুবিচার করতে পারেন নি অশোকের প্রতি, যাঁকে গোঁড়া বৌদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন আর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে সরাসরি তুলনা করেছেন আওরঙ্গজেবের সঙ্গে। অবশ্য এ সূত্রে স্মরণীয়, রাখালদাস ছাড়া আরও অনেকে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অশোককে দায়ী করেছেন। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ থেকে প্রমাণিত হবে যে, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতো একজন অনেক বেশি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকও একই মত পোষণ করতেন :[৩] 'উত্তর-পশ্চিম দিগন্তে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছিল। যবনদের সৃষ্ট ভয়াবহ বিপদ থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ভারতবর্ষের প্রয়োজন ছিল চন্দ্রগুপ্ত এবং পুরুর মতো শক্তিমান বীরপুরুষদের। কিন্তু সে পেল একজন স্বপ্নদর্শী কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তিকে। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর মগধ ধীরে ধীরে তার শক্তি এমন এক বিপ্লব ঘটানোর প্রয়াসে অপচয় করে ফেলল, যা মিশর করেছিল ইখ্‌নাতান-এর নেতৃত্বে। রাজনৈতিক দিক থেকে

১ *Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture*, পৃ. ৫।

২ 'বাংলার ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ, ১৯৭১, পৃ. ৭৮ ইত্যাদি।

৩ *Political History of Ancient India* (পঞ্চম সংস্করণ), পৃ. ৩৪৭-৪৮।

এর ফল হলো বিপর্যয়কর ..যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটানোতে অশোকের প্রয়াসও প্রেসিডেণ্ট উইলসনের চেষ্টার মতো একই ধরনের পরিণতি লাভ করলো।'

আর-একজন প্রখ্যাত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও এই বিতর্কে অশোকের সমালোচনায় কম মুখর হন নি। তাঁর মতে,[১] অশোকের সুস্পষ্ট বৌদ্ধ ধর্ম-ঘেঁষা রাষ্ট্রনীতির ফলে ব্রাহ্মণদের প্রতিক্রিয়া পরিণামে সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে গিয়েছিল এবং শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথের হত্যাকাণ্ডের মধ্যে বিদ্রোহী ব্রাহ্মণদের হাত পরিষ্কারভাবে দেখতে পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে রাখালদাসের বক্তব্যে রায়চৌধুরী ও শাস্ত্রী উভয়েরই মতবাদের কিছু কিছু উপাদান চোখে পড়ে। রায়চৌধুরীর মতো তিনিও অশোকের শান্তিবাদী নীতিকে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান কারণ বলে ঘোষণা করেছেন, অন্যদিকে তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গেও একমত যে, অশোকের বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ফলে জনসাধারণের এক বৃহদংশের তীব্র অসন্তোষ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করেছিল।

রাখালদাসের বৌদ্ধ ধর্ম- বিরোধী মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর 'শশাঙ্ক' উপন্যাসের ভূমিকায় কেউ কেউ কিছুটা মুসলমান-বিরোধী প্রবণতারও পরিচয় খুঁজে পেতে পারেন। সংশ্লিষ্ট অংশগুলি সতর্কভাবে পড়লে অবশ্য দেখা যাবে, লেখকের প্রধান বক্তব্য হলো, মুসলমান আক্রমণের ফলে বাঙালীদের অবস্থার যথেষ্ট অবনতি হয়েছিল এবং দীর্ঘকাল ধরে তাদের সংস্কৃতি অচল হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং 'শশাঙ্কের' যা মূল সুর, তা ধর্মীয় নয়, বরং নিখাদ দেশপ্রেমের। অন্যদিকে তিনি দেশের উন্নতি ও সংহতির জন্য হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে সচেতন ছিলেন 'ময়ূখ' ও 'লুৎফাউল্লা' নামে তাঁর উপন্যাস দু'টি তার সাক্ষ্য বহন করে।

অতএব যদিও রাখালদাস অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক হিসাবে প্রশংসনীয় নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন সময়বিশেষে তিনি ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছেন। অন্যভাবে তাঁর রচনায় ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ বা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের স্বাক্ষর প্রত্যাশিতভাবে দেখা যায়; এবং নেমিয়ার-এর বিশ্বাসমতো, ইতিহাস যদি সত্যিই হয় অনিবার্যরূপে আত্মবাদী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক, এবং ঐতিহাসিকের আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভরশীল, তাহলে বোধহয় রাখালদাসকে পক্ষপাতিত্ব বা আবেগপ্রবণতার অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে।

১ *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, ১৯১০, পৃ. ২৫৯ ইত্যাদি।

॥ ছয় ॥

রাখালদাসের পরবর্তী কালে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কিত গবেষণা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে, সেই আলোকে তাঁর কোন কোন মতবাদ পরিত্যাগ বা পরিমার্জন করতে হয়েছে। যেমন, ৪১-তম বর্ষাঙ্কের (অর্থাৎ ১১৯ খ্রীস্টাব্দ) আরা শিলালেখ তৎকালে জীবিত (প্রথম) কণিষ্কের উল্লেখ করেছে এবং কণিষ্কের দুই পুত্র বাসিষ্ক ও হুবিষ্ক ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি ছিলেন—রাখালদাসের এই ধারণা[১] এখন আর সমর্থনযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে, একটি বড়ো হর্ম্যের মধ্যে অবস্থিত ভূমারা মন্দিরের গর্ভগৃহের চারপাশে আছে একটি ঢাকা প্রদক্ষিণ-পথ এবং নাচনাকুঠার মন্দিরের মতো এই হর্ম্যের প্রাচীরও ভিত্তিমূলের ধার ঘেঁষে উপর দিকে উঠে মূল ছাদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে—রাখালদাসের এই অভিমত অযথার্থ বলে মনে হয়। সাম্প্রতিক কালের সম্যক পরীক্ষায় দেখা গেছে, প্রথমত এ রকম কোন ঢাকা প্রদক্ষিণ-পথ নেই; দ্বিতীয়ত, উঁচু প্রাচীর ছাদের সঙ্গে সংযোগস্থলে বর্তুলাকৃতি ধারণ করেছে। কারণ এরকম বর্তুলাকৃতি প্রাচীরের প্রচুর ভগ্নাবশেষ মন্দির-সমীক্ষার সময় রাখালদাস নিজেও পেয়েছিলেন এবং সংশ্লিষ্ট জায়গায় সেগুলি ছড়িয়েও রয়েছে। উঁচু প্রাচীরের শিরোদেশ বর্তুলাকৃতি হওয়ায় এর উপরে অন্য কোন প্রাচীর থাকার সম্ভাবনাও বাতিল হয়ে যায়। গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেবের ফরিদপুর তাম্রশাসনগুলির বিশুদ্ধতা নিয়ে রাখালদাসের সন্দেহ[২] অমূলক হয়ে পড়েছে, মহারাজ গোপচন্দ্রের মল্লসারুল ও জয়রামপুর লেখ এবং সমাচারদেবের কিছু স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ার পর।[৩] তা ছাড়া, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের সামাজিক বা অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রতিও তিনি বেশি সময় বা মনোযোগ দিতে পারেন নি, এবং এ ব্যাপারে তাঁর দান প্রায় উপেক্ষণীয়। অবশ্য তাঁর এই ত্রুটি সংশোধনের প্রয়াস লক্ষ করা যায় তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে, যেখানে পাণ্ডিত্য, কল্পনা ও

১ *Indian Antiquary*, ৩৭-তম খণ্ড, পৃ. ৫৮ ইত্যাদি।

২ *Artibus Asiae*, ৩২-তম খণ্ড, পৃ. ১৪১-৪৪।

৩ *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, ১৯১৪, পৃ. ৪২৬।

৪ রমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য: 'এদের (অর্থাৎ এই লেখগুলির) সত্যবত্তা নিয়ে আর কোন পণ্ডিতের সন্দেহ নেই।' *History of Bengal* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫১, পাদটীকা ২।

সাহিত্যিক কৃতিত্বের সংমিশ্রণে সমসাময়িক সমাজের এক জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে। এ বিষয়ে তিনি নিজেকে প্রখ্যাত মিশরতত্ত্ববিদ্ ম্যাস্পেরোর অনুগামী বলতেন যাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্মের মর্যাদা পেয়েছে।[১] 'শশাঙ্ক' ও 'ধর্মপাল' উপন্যাসে বাঙালী জাতির জীবন ও অবস্থার উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কনে রাখালদাসের সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে রাখালদাসের সাহিত্য-প্রতিভার কথা বলতে হয়। পেশাগতভাবে ঐতিহাসিক হলেও ক্ষমতার বিচারে তিনি অনুপেক্ষণীয় লেখক ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে, অতীতের প্রাণবন্ত ও বর্ণময় বর্ণনার বৈভবে তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি তাঁকে একজন সুযোগ্য কথাশিল্পীর প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। 'পাষাণের কথা'য় রাখালদাস একজন অভিজ্ঞ গল্প-বলিয়ের মতো পুরোনো দিনের কথা শুনিয়েছেন, আর এই গ্রন্থকে 'ইতিহাসের ছায়া অবলম্বনে লিখিত আখ্যায়িকা' বলে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি একজন তথ্যসর্বস্ব নীরস ঐতিহাসিক ছিলেন না, বরং সাহিত্যানুরাগের সাহায্যে ইতিহাসের পবিত্র অথচ শীতল নিরুত্তাপ আলোর জায়গায় তিনি সাহিত্যের রঙিন কাঁচের উজ্জ্বল বর্ণের সমাবেশ ঘটাতে চেয়েছেন। নিঃসন্দেহে, তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং আরো কিছু পূর্ব দিনের রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতো সেই স্বল্পসংখ্যক ঐতিহাসিকদের অন্যতম, যাঁদের সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁদের মতো তিনিও বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে নিজের শ্রম ও মনন নিয়োজিত করেছিলেন এবং স্বীয় গবেষণার ফলাফল মাতৃভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। আরো উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের প্রথম পর্বের মুদ্রাতাত্ত্বিক ইতিহাস সম্পর্কে রাখালদাসই প্রথম বাংলা ভাষায় গ্রন্থরচনায় সাহসী হন। 'প্রাচীন মুদ্রা' নামে তাঁর এই বই বাংলা ভাষায় এখনও মুদ্রাতত্ত্ব বিষয়ে অনন্য ও অদ্বিতীয়। পরবর্তী কালে দুরূহ গবেষণার বিষয় তাঁর মতো স্বচ্ছন্দভাবে মাতৃভাষায় প্রকাশ করতে বিশেষ কাউকে দেখা যায় নি।

তথ্যের প্রতি অটল নিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা, এবং তীক্ষ্ম বিচারবোধ—সংক্ষেপে এই হলো রাখালদাসের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্যভাবে বলতে গেলে, বৈজ্ঞানিকসুলভ দৃষ্টিকোণ থেকে অতীত-বিশ্লেষণে তাঁর অপূর্ব দক্ষতা ছিল। যদিও বিভিন্ন সময়ে তাঁকে দেশপ্রেমিক বা জাতীয়তাবাদী হিসাবে দেখা গেছে, তা সত্ত্বেও তিনি প্রমাণ করেছেন যে,

১ আনন্দবাজার পত্রিকা (শারদীয়া সংখ্যা), ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০-১১।

তথ্যের তালিকার বাইরে গেলে ইতিহাস হয়ে পড়ে আত্মবাদী, ঐতিহাসিকের ব্যক্তিগত অভিরুচি- ও দৃষ্টিকোণ- নির্ভর ; এবং যখন সেটা সচেতনভাবে, বা প্রায় আত্মসচেতনভাবে, সাহিত্যের সঙ্গে মিশে যায়, তখন তা হয়ে ওঠে প্রকৃত ইতিহাস। তাঁর পেশার একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে রাখালদাস সম্ভাব্য সমস্ত রকম উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহে চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের পর তিনি তাদের নির্বাচন ও শ্রেণীবিভাগ করতেন এবং পরে সে সব তথ্য থেকে অনুমান ও সাধারণ সূত্রাদি বার করতেন। পরিশেষে তিনি তথ্যসমূহ ও নিজের অভিমতকে যতদূর সম্ভব সুপাঠ্যভাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করতেন। সাধারণত, রাখালদাস প্রাদেশিক, ধর্মীয় প্রভৃতি ইতিহাস-বহিঃপাতী চিন্তাধারার প্রভাবের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতেন এবং তথ্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তাঁর অভিমত ও সত্যকে তুলে ধরার প্রয়াস পেতেন। তাঁর মৃত্যুর পর ঐতিহাসিক গবেষণা যথেষ্ট অগ্রগামী হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও তথ্যবৈভবে ও রচনা-সৌকর্যে তাঁর *Age of the Imperial Guptas* এবং *History of Orissa* সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এখনো নন্দনীয়। এদের মধ্যে প্রথমটিকে, বিখ্যাত ঐতিহাসিক অনন্তসদাশিব আলটেকার 'একজন দক্ষ বিশেষজ্ঞের সৃষ্টি' হিসাবে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন, এতে রয়েছে গুপ্ত যুগের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের অনেক বিতর্কমূলক সমস্যার নূতন ও আকর্ষণীয় সমাধান ; এবং ঐ যুগের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও মূর্তিকলা বিষয়ে চমৎকার আলোচনা। ১৯১৭ সালে প্রকাশিত 'বাংলার ইতিহাস'-এর দ্বিতীয় খণ্ড সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকারের মতো মধ্যযুগীয় ইতিহাসের প্রমাণপুরুষ মন্তব্য করেছিলেন[১], স্টুআর্টের পরবর্তী কালে আমাদের ঐতিহাসিক জ্ঞানের ক্রমবিকাশের পথে এই গ্রন্থ এক দিকচিহ্নস্বরূপ। তাঁর মতে, ১৯১৫ সাল পর্যন্ত জ্ঞাত সমস্ত বঙ্গীয় লেখ, মুদ্রা, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, বংশপঞ্জি ও বিভিন্ন উপাদান থেকে গৃহীত সংক্ষিপ্তসারের যে পূর্ণাঙ্গ তালিকা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, সেখানে তার প্রকৃত মূল্য নিহিত।

বস্তুত, পাণ্ডিত্যের যে কোন মানদণ্ডের বিচারে রাখালদাস আমাদের দেশের প্রথম সারির ঐতিহাসিকদের অন্যতম। যুগান্তকারী মহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কার তাঁর খ্যাতির মূল কারণ হলেও তাঁর স্বদেশ-সন্ধিৎসা ছিল বহুমুখী। ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ঔৎসুক্য ছিল সদাজাগ্রত।

১ *History of Bengal* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৪৮), দ্বিতীয় খণ্ড, যদুনাথ সরকার সম্পাদিত, পৃ, ৫০২।

এই স্বনামধন্য ঐতিহাসিকের শ্রম ও মনীষার পরিচয় ছড়িয়ে আছে নানা প্রবন্ধে ও গ্রন্থরাজিতে। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *Age of the Imperial Guptas*, *History of Orissa*, *Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture* এবং 'বাঙ্গালার ইতিহাস'। রাখালদাসের মিতায়ু জীবনের তুলনায় তাঁর বিপুল সৃষ্টি বোধ হয় ট্রেভেলিয়ানের মন্তব্যেরই যৌক্তিকতা প্রমাণ করে :[১] 'জীবন হ্রস্ব, শিল্প দীর্ঘ, কিন্তু ইতিহাস দীর্ঘতম, কারণ শিল্পের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের যোগফলের আর-এক নামই তো ইতিহাস।'

১ *Clio, A Muse* পৃ ৬৪।

ভারত-সংস্কৃতি, মূর্তিতত্ত্বে

হিমবৎসেতু পর্যন্ত সহস্র যোজন-বিস্তৃত এই বিশাল ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যেমন অগণিত, তার অধিবাসীদের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-সংস্কার, ভাব-কল্পনার বৈচিত্র্যও তেমনই অসাধারণ। বলা বাহুল্য, এই আকর্ষণীয় বৈচিত্র্য একদিনেই দেখা দেয় নি, শতাব্দীর পর শতাব্দী নানা জাতির নানা রক্তধারার মিলন-মিশ্রণের ফলে এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকে আর্যরা আসার আগেও এদেশে পর্যাপ্ত জনবসতি ছিল, সেই সব মানুষ নিজেদের ধ্যান-ধারণা বিশ্বাস অনুযায়ী আচার-অনুষ্ঠানে নিরত হতেন। আর্যদের পরে যবন-শক-পহলব-কুষাণ প্রভৃতি আরও বহু বিদেশী জাতি এদেশে এসেছেন এবং এক সময় তাঁদেরই মতো এদেশের জনপ্রবাহের সঙ্গে মিশে গেছেন। এইভাবে বহু শতকের নানা সাংস্কৃতিক উপাদানের মিলন-বিরোধ-সমন্বয়ের ফলে গড়ে উঠেছে ভারতজনের মানস-জীবন, আদিমতম ট্রাইব বা জনগোষ্ঠীদের বৃক্ষপূজা জন্তুপূজা থেকে বর্তমান কালের ব্রাহ্ম-গোষ্ঠীর নিরাকার ঈশ্বরসাধনা পর্যন্ত যার বিস্তার। এবং এই মানস-জীবনের অন্যতম বিশিষ্ট ও সুস্পষ্ট প্রকাশ দেব-দেবীর মূর্তিপূজায়। সাধারণ মানুষ তাঁর অলৌকিক বা দৈবী শক্তিতে বিশ্বাসকে নানা দেব-দেবীর রূপ-কল্পনায় প্রকাশ করেন, সেই সমস্ত রূপ-কল্পনার প্রত্যক্ষগোচর রূপ মূর্তি, প্রতিমা বা প্রতিকৃতি। সুতরাং প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে-সব দেব-দেবীর মূর্তি নির্মিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে সেই সকল ধর্মের নানা পর্যায়ী ইতিহাসই শুধু বিধৃত তা নয়, তাদের মাধ্যমে সামগ্রিক ভারতীয় চিন্তাজীবনের একটি বিশিষ্ট অংশও বিবৃত হয়েছে। এইখানেই মূর্তিবিদ্যা (iconography) ও মূর্তিতত্ত্ব (iconology) নামীয় বিদ্যার গুরুত্ব, যদিচ ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনার ক্ষেত্রে মূর্তিবিদ্যা ও মূর্তিতত্ত্ব পণ্ডিতমহলের দৃষ্টি এখনও তেমন আকর্ষণ করে নি।

যা মূর্ত, প্রকাশিত, তা-ই মূর্তি। সুতরাং প্রত্যেক মূর্তি একটি বিশেষ ভাবের কিংবা সমন্বিতভাবে একাধিক ভাবের রূপ-প্রতীক। দেব-দেবীর, দেবকল্প দেবতাদের এবং সাধু-সন্তদের মূর্তি বা প্রতিকৃতির সর্বাঙ্গীণ পরিচিতি দান মূর্তিবিদ্যার লক্ষ্য। কোন্ দেবতা কি ভাবে প্রদর্শিত হন তাঁর লক্ষণবৈশিষ্ট্য, তাঁর হাতের মুদ্রা বা লাঞ্ছন ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রচনা মূর্তি-

বিদ্যাবিশারদের কর্তব্য। মূর্তিতত্ত্বের ক্ষেত্র গভীর ও প্রসারিত : মূর্তি-বিশেষের অর্থ ও তাৎপর্য সন্ধান মূর্তিতত্ত্বের উপজীব্য। নৃত্যপর শিবের হাতের সংখ্যা, তাঁর হাতের মুদ্রা বা লাঞ্ছন, অঙ্গভূষণ ইত্যাদির বিবরণ-মূলক বর্ণনা মূর্তিবিদ্যার অন্তর্গত, নটরাজ শিবের নৃত্যভঙ্গিমা, মুদ্রা ও হস্ত-গত লাঞ্ছনের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সংক্রান্ত আলোচনা মূর্তিতত্ত্বের বিষয়ী-ভূত। স্বভাবতঃই মূর্তিবিদ্যা ও মূর্তিতত্ত্ব পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। এবং উভয় বিদ্যাতে পারদর্শিতা অর্জন সাহিত্যগত উপাদানের সঙ্গে সম্যক পরিচিতি-সাপেক্ষ। বেদ-মহাকাব্য-পুরাণ-শিল্পশাস্ত্রাদি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট বিভিন্ন দেব-দেবীর ধ্যান বা সাধনের সঙ্গে মূর্তি-নিদর্শনের বর্ণনা মেলাতে হবে, অন্যথায় কোন্ মূর্তি কোন্ দেবতার তা বলা দুরূহ, বস্তুত অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আমরা মূর্তি বলতে সাধারণত কোন জীবের আকৃতিতে নির্মিত রূপ-প্রতীক বুঝে থাকি ; অর্থাৎ পশু-পাখি কিংবা মানুষের প্রতিকৃতিই সাধারণত আমাদের কাছে মূর্তি বলে পরিচিত। ব্যাপক অর্থে অবশ্য প্রকাশিত প্রত্যক্ষগোচর অর্থবহ বস্তুমাত্রেই মূর্তি এবং সেদিক দিয়ে যে-কোন রূপ-প্রতীকই মূর্তি বলে গণ্য হবার যোগ্য। একনিষ্ঠ বৈষ্ণব ও শৈব ভক্তের কাছে বিষ্ণু ও শিবের মানুষী মূর্তির চাইতে শালগ্রামশিলা ও শিবলিঙ্গের আবেদন কোন অংশে কম নয়। অথচ লোকায়ত অর্থে এগুলি মূর্তি নয়, বিষ্ণু ও শিবের অমূর্ত প্রতীক। এই লোকায়ত অর্থকে গ্রহণ করে আমরা দেব-দেবীর ধ্যান-কল্পনার প্রকাশকে দু'টি ব্যাপক ভাগে বিভক্ত করতে পারি : অমূর্ত প্রতীক ও মূর্ত প্রতীক ; মূর্ত প্রতীক আবার তিন ভাগে বিভাজনীয় : পশু-রূপ, পশু ও মানুষের মিশ্ররূপ এবং মানুষী প্রতি-কৃতি। পূর্বোক্ত শিবলিঙ্গ মহাদেবের অমূর্ত প্রতীক (সারত, প্রজননশক্তির প্রতীক), বৃষ মহাদেবের পশু-রূপ, বরাহমুখ মানবদেহী বিষ্ণুর বরাহাবতার-মূর্তিতে পশু ও মানুষের মিশ্র রূপ চিত্রায়িত এবং কৃষ্ণ-বলরাম প্রভৃতি বিষ্ণুর মানবোচিত প্রতিমূর্তি। গণেশাদি কয়েকজন দেবতার ধ্যানে ও মূর্তিতে আদ্যন্ত পশু ও মানুষের মিশ্র রূপের সাক্ষাৎ মেলে, দেবতাকল্প গরুড়ের ক্ষেত্রে পাখি ও মানুষের রূপের সংমিশ্রণ ঘটেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও দৈবী শক্তি বা দেবতাগণ প্রথমে অমূর্ত প্রতীকের মাধ্যমে পূজিত হতেন, তাঁদের মানবীয় মূর্তির উদ্ভব অল্পবিস্তর পরবর্তী কালের। উদাহরণস্বরূপ, বৌদ্ধগণ ভগবান তথাগতের পরিনির্বাণের (আ. ৪৮৬ কিংবা ৪৮৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) পরে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁকে মনুষ্যাকৃতিতে পূজা করতেন না ; খ্রীস্টীয় প্রথম

শতাব্দীতে বিখ্যাত কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রায় নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুদ্ধদেবের প্রথম মানুষী মূর্তির সাক্ষাৎ মেলে। স্মরণ রাখতে হবে, দেব-দেবীর মানুষী প্রতিকৃতির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তাঁদের প্রতীকী রূপের বিলুপ্তি ঘটে নি। আজও যে-কোন শিবমন্দিরে প্রবেশ করলে এই উক্তির যাথার্থ্য সপ্রমাণ হবে : মন্দিরের গর্ভগৃহে যার উপর ভক্তের অর্ঘ্য নিবেদিত হয়, সেটি দেবতার লিঙ্গ-প্রতীক, মানুষী মূর্তি নয়।

ভারতবর্ষে মূর্তিপূজার ইতিহাস দূরবিস্তৃত। সিন্ধু সভ্যতার (২৩০০-১৭৫০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) পূর্ববর্তী পুরা নিদর্শনের মধ্যে মূর্তিপ্রমাণ পাওয়া গেছে। বেলুচিস্তানের ঝোব ও কুল্লি অঞ্চলের সিন্ধুপূর্ব গ্রামীণ সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলিতে (আ. ৩০০০-২৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) আবিষ্কৃত মৃন্ময় মাতৃকা-মূর্তিগুলি মূর্তিপূজার প্রমাণরূপে উল্লেখনীয়। মহেঞ্জোদাড়ো, হড়প্পা, লোথাল, রূপাড় প্রভৃতি সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রেও অনুরূপ পোড়ামাটির মূর্তি পাওয়া গেছে। এই সমস্ত স্থানে এমন আরও প্রত্ননিদর্শনের সাক্ষাৎ মেলে, যেগুলি নিঃসন্দেহেই মূর্তিপূজার সাক্ষ্য হিসাবে মূল্যবান। মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত একটি চতুষ্কোণ সীল (seal) বা ফলকের দৃষ্টান্ত এ সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য সীলটিতে একটি পুরুষ মূর্তি দেখা যায় ; পুরুষপ্রবর যোগাসনে উপবিষ্ট, তাঁর তিন মুখ, দু'টি শৃঙ্গ (শৃঙ্গদ্বয় শিরোভূষণের বৈশিষ্ট্যও হতে পারে), তাঁর দু পাশে হাতি, বাঘ গণ্ডার ও মহিষ, তাঁর আসনের নিচে দু'টি হরিণ ও পুস্তকাধারজাতীয় বস্তু ; বিচিত্র এই যোগী পুরুষ আর কেউই নন, পরবর্তী কালের যোগীশ্বর মহাদেব, উৎকীর্ণ প্রতিকৃতিতে তাঁর পশুপতি-রূপ চিত্রিত হয়েছে ; অর্থাৎ আলোচ্য মূর্তিটিতে পশুপতি-শিবের আদি রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ; মহেঞ্জোদাড়োতে (এবং অন্যত্রও) প্রাপ্ত অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে আছে দৈবী শক্তির অমূর্ত প্রতীক : শিবলিঙ্গ-সদৃশ কয়েকটি শিলাময় কিংবা মৃন্ময় বস্তু এবং কিছু বৃত্তাকার প্রস্তরখণ্ড, যাদের প্রত্যেকটির কেন্দ্রভাগ ছিদ্রবিশিষ্ট ; এই দুই শ্রেণীর পুরাদ্রব্যকে একত্রে বিচার করে সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায়, সিন্ধু সভ্যতার ধারক-বাহকগণ আদিতম পুরুষ ও স্ত্রীশক্তিকে যথাক্রমে শিশ্নপ্রতীক ও যোনিপ্রতীকের মাধ্যমে পূজা করতেন। অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের মধ্যে দৈবী শক্তি অমূর্ত ও মূর্ত উভয়বিধ প্রতীকের মাধ্যমে পূজিত হতো। সিন্ধু সভ্যতা থেকে স্বতন্ত্র ও পরবর্তী বৈদিক সংস্কৃতির আর্য ঋষিরা মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন, ঋগ্বেদে শিশ্নদেব ও মূরদেব অর্থাৎ লিঙ্গপূজক ও নিষ্প্রাণ পদার্থের উপাসক

বলে যাঁদের নিন্দা করা হয়েছে, তাঁরা কি মহেঞ্জোদাড়ো-হড়প্পার অনার্য অধিবাসী ? মহেঞ্জোদাড়োতে আবিষ্কৃত শিশ্নপ্রতীক, যোনিপ্রতীক, পশুপতি-শিবের প্রতিকৃতি, মাতৃকা-মূর্তি ইত্যাদির আবিষ্কারের পর এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায় ?

বৈদিক আর্যগণ মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন, পূর্বোক্ত শিশ্নদেব ও মূরদেব শব্দের নিন্দাত্মক ব্যবহারে সেই বিরোধিতার পরিচয় সুস্পষ্ট। বৈদিক ধর্মে দেবতার (দেবতার তুলনায় দেবী গৌণ) মূর্ত প্রতীকের স্থান ছিল না ; বৈদিক ধর্মের ক্রিয়া-কাণ্ডে যাগ-যজ্ঞ ছিল প্রধান এবং সাধারণত যজ্ঞকালে ইন্দ্র-বরুণ প্রমুখ দেবতাগণ প্রার্থনার মাধ্যমে আহূত হতেন। বৈদিক আর্যদের শত বিরোধিতা সত্ত্বেও কিন্তু পূর্বতন মূর্তিপূজার ধারা ব্যাহত হয় নি, বরং কালক্রমে আর্যদের একটি বড় অংশ প্রতিমা-পূজক অনার্যদের প্রভাবের আওতায় এসে পড়েন। প্রাগার্য ও অবৈদিক ভারতবর্ষের প্রতিমাপূজার প্রাচীন ধারা যে কোনদিন ব্যাহত হয় নি, বরং উত্তরোত্তর জোয়ারের ঐশ্বর্যে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, তার অসংখ্য প্রত্ন-তাত্ত্বিক ও সাহিত্যগত নিদর্শন বিদ্যমান। ভারতী সংস্কৃতির বেদোত্তর পর্বের (খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক ও তার পরে) কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখই যথেষ্ট হবে : খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পাণিনি-রচিত 'অষ্টাধ্যায়ী', খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র' (গ্রন্থটির বর্তমান রূপ খ্রীস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকের হলেও মূলাংশ এই সময়ে প্রণীত বলে অনুমান), খ্রীস্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকের অশোকের শিলালেখ, খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর বেসনগরে (মধ্যপ্রদেশের ভিলসার কাছে) প্রাপ্ত গরুড়শীর্ষ স্তম্ভে উৎকীর্ণ জনৈক যবন (অর্থাৎ গ্রীক) হেলিওডোরাসের অভিলেখ এবং সমকালীন পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য,' খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতকের ঘোসুণ্ডিতে (চিতোরের কাছে) আবিষ্কৃত শিলালেখ এবং খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতাব্দীর অসংখ্য মুদ্রায় উৎকীর্ণ বহু ব্রাহ্মণ্য ও লোকায়ত দেব-দেবীর প্রতিকৃতি এবং তাঁদের অমূর্ত ও মূর্ত প্রতীকসম্বলিত সমকালীন নানা ভাস্কর্য-নিদর্শন। এই সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যগত উপাদানের ভিত্তিতে সঙ্গতভাবে সিদ্ধান্ত করতে হয়, আনুমানিক ৩০০০-২৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে যে মূর্তিপূজার উদ্ভব, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রবহমান তার নিরবচ্ছিন্ন স্রোতোধারা ভারত-বর্ষের চিত্তভূমিকে রসসিক্ত করে রেখেছে।

ভারতী সংস্কৃতির নানাস্তর সৌধের সর্বতোভদ্র পরিচয় পেতে হলে মূর্তিবিদ্যা ও মূর্তিতত্ত্বের অধ্যয়ন অপরিহার্য। বহু মত ও পথের সমাবেশ

আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ; হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলি ছাড়া লোকায়ত ধর্মমত ও বিশ্বাস-সংস্কারের সংখ্যাও কম নয়, স্বভাবতঃই আমাদের দেব-দেবীর অমূর্ত ও মূর্ত প্রতীকের সংখ্যা অগণিত, তাদের রূপবৈচিত্র্যও অসাধারণ। আমাদের সুদীর্ঘকালের নানা পর্যায়ী সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপকরণ এই সব অসংখ্য মূর্তির (অমূর্ত প্রতীকের কথা ছেড়েই দিলাম) মধ্যে ছড়ানো রয়েছে। চোখের দেখা নয়, দেখার চোখ দিয়ে মূর্তিগুলির অধ্যয়নে কত বিচিত্র তথ্য, কত আকর্ষণীয় সংবাদ জানা যায়, তার ইয়ত্তা নেই। বৌদ্ধ, জৈন ও লোকায়ত দেব-দেবীর প্রতিমা-প্রসঙ্গ ছেড়ে আপাতত হিন্দু মূর্তিবিদ্যা ('বিদ্যা'র ব্যাপক অর্থে 'মূর্তিতত্ত্ব'কেও অন্তর্ভুক্ত করছি) থেকে অল্প কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আলোচনায় মূর্তিবিদ্যার গুরুত্ব প্রমাণের প্রয়াস পাওয়া যেতে পারে।

বর্তমানে যে হিন্দু ধর্ম ভারতবর্ষের প্রধানতম ধর্ম, তার নাম পৌরাণিক হিন্দুধর্ম, আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিলন-মিশ্রণ-সমন্বয়ের ফলে তার উদ্ভব ও বিবর্ধন। প্রধানত পাঁচটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হিন্দুদের মুখ্য দেবতার সংখ্যাও পাঁচ, বস্তুত এই দেবতাপঞ্চকের প্রত্যেকে এক-একটি সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতা। অর্থাৎ এক-একটি দেবতাকে কেন্দ্র করে এক-একটি সাম্প্রদায়িক উপাসকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। দেবতাপঞ্চক হলেন বিষ্ণু, শিব, সূর্য, দেবী (আদি স্ত্রী-শক্তির দৈবী রূপ) ও গণপতি এবং তাঁদের একভক্ত পূজক-গণ যথাক্রমে বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, শাক্ত ও গাণপত্য নামে পরিচিত। বর্তমানে সৌর ও গাণপত্যদের সংখ্যা খুবই কম, নেই বললেই চলে। এর অর্থ এই নয় যে, বর্তমান হিন্দুগণ সূর্য এবং গণপতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন, সূর্য ও গণপতির একান্তিকী উপাসক আজকাল বিশেষ দেখা যায় না, এইটিই বক্তব্য। 'একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—তিনি এক, বিপ্র অর্থাৎ মহাত্মাগণ তাঁকে বহু নামে অভিহিত করেন—ঋগ্বেদের সময় থেকে একেশ্বরবাদের যে-সুর ভারতীয় চিত্তে বেজে আসছে, তাই শেষ পর্যন্ত যথার্থ হিন্দুকে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে চিরন্তন সত্যের আনন্দলোকে অধিষ্ঠিত করেছে। এবং সেই কারণে ভক্ত শৈব তাঁর ইষ্টদেবতার সঙ্গে বিষ্ণু, সূর্য, দুর্গা, গণেশ প্রমুখ অন্যান্য দেবতাদেরও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন, পরম বৈষ্ণব চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তির পাশে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে শিব, কালী বা গণেশের মূর্তি স্থাপনা করেন। শুধু কি এই পঞ্চ দেবতা ? ব্রহ্মা, কার্তিক, রবি-সোম-মঙ্গল প্রভৃতি নবগ্রহ, ইন্দ্র-বরুণাদি অষ্ট দিক্‌পাল, এমন কি নাগ-যক্ষ-গন্ধর্ব-কিন্নর প্রমুখ দেবতাকল্পদের প্রতিও হিন্দুদের শ্রদ্ধা স্বতোৎসারিত। শ্রাদ্ধে ও

তর্পণকালে দেব-যক্ষ-নাগ প্রমুখদের উদ্দেশে যে-অর্ঘ্য উচ্চারিত হয়, সেই মন্ত্রাংশ (দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্বাপ্সরসোঽসুরাঃ। ক্রূরাঃ সর্পাঃসুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ। বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।) তো ভক্তিমার্গে বসুধৈব কুটুম্বকম্ আদর্শেরই বাণীরূপ।

॥ দুই ॥

সদ্যোক্ত নাগ-যক্ষ-কিন্নরাদি দেবতাকল্পদের দিয়েই বক্তব্য শুরু করা যাক। অভিজাত ব্রাহ্মণ্য দেবতামণ্ডলীতে তাঁদের স্থান গৌণ, বিষ্ণু-মহাদেবাদি প্রধান দেবতাদের প্রতিমাতে তাঁদের কেউ কেউ (গন্ধর্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর প্রমুখ) রূপায়িত হন। আজ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মে তাঁদের মান-মর্যাদা যাই হোক না কেন, দূর অতীতের কোন সময় তাঁরা যে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। হিন্দু মূর্তিশিল্পে তাঁদের উপস্থিতি তার অন্যতম প্রমাণ। শুধু কি হিন্দু ? 'বৌদ্ধ এবং জৈনরাও মূর্তিকলায় নাগ-যক্ষ-গন্ধর্বদের সশ্রদ্ধ আসন দিয়েছেন। জৈন ধর্মসাহিত্যে তাঁদের নাম ব্যন্তর দেবতা (intermediate divinities), মানুষ ও দেবতাদের ব্যন্তরে বা মধ্যবর্তী অংশে তাঁদের অধিষ্ঠান। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতকের ভারহুত, সাঁচী, বুদ্ধগয়া, অমরাবতী প্রভৃতির বৌদ্ধ শিল্পকলায় তাঁদের উপস্থিতি আকর্ষণযোগ্য, সমকালীন নাগ-নাগিনী এবং যক্ষ-যক্ষিণীর স্বতন্ত্র মূর্তিও বেশ কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে। সাহিত্যগত উপাদানেও নাগ-যক্ষ-গন্ধর্বাদির প্রাচীনত্ব ও জনপ্রিয়তা সপ্রমাণ। সাহিত্যের সাক্ষ্য এবং মূর্তিপ্রমাণে মনে হয়, আমাদের ইতিহাসের আদিপর্বে নাগ-যক্ষ-গন্ধর্ব প্রভৃতি ছিলেন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপাস্য দেবতা, কালক্রমে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সূত্রে তাঁরা ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের দেবতামণ্ডলীর অন্তর্ভ ত হন বটে, কিন্তু সেখানে তাঁদের স্থান গৌণ হয়ে রইল।

তবে মানুষের ক্ষেত্রে যেমন, দেবতাদের ক্ষেত্রেও তেমনই জাত্যন্তর ঘটে থাকে, কিছু দেবতা সাধারণ স্তর থেকে অভিজাত শ্রেণীতে উঠে যান, অপর কেউ কেউ পূর্ব মর্যাদা হারিয়ে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর দেবতায় পরিণত হন। অধুনা অভিজাত দেবতাপঞ্চকের অন্যতম শিব যে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত 'লৌকিক' বা অনভিজাত দেবতা বলে পরিগণিত হতেন, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে তার ইঙ্গিত বিদ্যমান। অপর প্রধান দেবতা গণপতি বা গণেশও আদিতে ছিলেন জনগোষ্ঠী-সমাজের দেবতা (পূর্বোক্ত ব্যন্তর দেবতাবিশেষ), ইতিহাসের কোন এক পর্বে

আদিম জাতিদের পূজিত হস্তি-দেবতা বিবর্তনের সূত্রে মানব-রূপের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে কালক্রমে গজমুণ্ডবিশিষ্ট মানবাকৃতি দেবতায় পরিণতি লাভ করেছেন ; তাঁর হস্তি-মুণ্ড যেমন হস্তি-দেবতার স্মারক, তাঁর 'তুন্দিল' বা লম্বোদর তেমনই প্রাচীন যক্ষদেবতার রূপ-বৈশিষ্ট্যকে স্মরণ করিয়ে দেয় ('নিদ্দেস' নামীয় প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট দেবঅবলির তালিকায় হস্তি- ও যক্ষ- দেবতার উল্লেখ এ সূত্রে স্মরণীয়) ।

যে- লক্ষ্মী ও সরস্বতী আজ হিন্দু মাত্রেরই আদরণীয়া, তাঁরাও এক সময়ে অব্রাহ্মণ্য 'ব্যন্তর' দেবতা ছিলেন, হিন্দু ধর্মে তাঁদের স্বীকৃতিলাভ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের ঘটনা । শিব এবং গণপতি (ব্যন্তর গণপতিকে একদা লৌকিক দেবতা শিবের পুত্ররূপে কল্পনার মধ্যেও উভয় দেবতার সগোত্রতার ইঙ্গিত নিহিত) যেমন জনগোষ্ঠী-স্তর থেকে অভিজাত শ্রেণীতে উন্নয়নের দৃষ্টান্ত, ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের মতো প্রধান বৈদিক দেবতার প্রাধান্য-লোপ তেমনই তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের ইঙ্গিতবহ । যাই হোক, এই ধরনের নানা দেব-দেবীর রূপ-কল্পনা ও প্রত্যক্ষগোচর প্রতিমার মধ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানের মিলন-মিশ্রণ সমন্বয়ের পরিচয় প্রদীপ্ত বলেই সংস্কৃতি-গবেষকদের কাছে মূর্তিবিদ্যা মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ।

দেশভেদে ও কালভেদে একই দেবতার রূপভেদ হয়ে থাকে । অর্থাৎ একই দেবতার রূপ-কল্পনায় আঞ্চলিক সংস্কৃতি-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিবর্তমান ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন ঘটে । ভারতবর্ষের কোন অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংবাদ জানবার পক্ষে সেই অঞ্চলের দেব-দেবীর মূর্তি বিশেষ সহায়ক । শিবের সৌম্য মূর্তিগুলির অন্যতম কল্যাণসুন্দর বা বৈবাহিক মূর্তি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখযোগ্য । এলোরা, এলিফ্যাণ্টা প্রভৃতির বিখ্যাত ভাস্কর্যশিল্পে শিব এবং পার্বতীর পরিণয়-দৃশ্যে বর ও বধূ পাশাপাশি দণ্ডায়মান, বধূর হাত বরের হাতে ন্যস্ত (এইটিই হিন্দু বিবাহের পাণিগ্রহণ) ; কিন্তু একই দৃশ্য বাংলাদেশের ভাস্কর্যশিল্পে ভিন্নরূপে চিত্রিত, সেখানে বরকে কনের পিছনে কড়ি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় ; বলা বাহুল্য, দেবদম্পতির এই ভঙ্গিমায় বাংলাদেশের বিবাহপদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য মানব-দম্পতির সপ্তপদী গমনের প্রথার অভিব্যক্তি ঘটেছে । নৃত্যপর শিবের প্রতিমা বাংলাদেশে বিরল নয়, কিন্তু এই সকল শিল্পকৃতিতে সুপরিচিত দক্ষিণ ভারতীয় নটরাজ-মূর্তির একাধিক বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত : দক্ষিণ ভারতীয় মূর্তিতে দেবতার বামপদ অপস্মার পুরুষ নামক কুৎসিত বামনের পৃষ্ঠোপরি স্থাপিত, বাংলাদেশের প্রতিমাতে নটরাজ তাঁর বাহন নন্দীর উপর

নৃত্যপর (কোন কোন ক্ষেত্রে নন্দীও নৃত্যপর ভঙ্গীতে চিত্রিত): দক্ষিণ ভারতীয় নটরাজ চতুর্ভুজ, বাংলার ভাস্কর্যে নৃত্যনিপুণ দেবতার হাতের সংখ্যা দশ কিংবা বারো, তাঁর হস্তধৃত লক্ষণ ও লাঞ্ছন পৃথক, সেগুলির সন্নিবেশও ভিন্ন প্রকারের; বাংলাদেশের নটরাজ শিবের ধ্যান-কল্পনায় ও প্রতিমা-নিদর্শনে বাঙালী শিল্পীর নিজস্বতার, অন্যভাবে বাঙালী সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য, সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। একই দেবতার রূপ-কল্পনার প্রত্যক্ষগোচর প্রকাশনেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হতে দেখা যায়: মহাদেবের কোন বিগ্রহে পরশু ও মৃগলাঞ্ছন দেখলে বুঝতে হবে, মূর্তিটি দক্ষিণ ভারতের; অর্থাৎ পরশু ও মৃগ দক্ষিণ ভারতীয় শিব-দেবতার অবিচ্ছেদ্য লাঞ্ছন। প্রাচীনকালে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে নির্মিত সূর্যবিগ্রহের রূপগত বৈষম্য আর-একটি উদাহরণ হিসাবে উল্লেখনীয়: গুপ্ত ও গুপ্ত-পরবর্তী যুগের—পঞ্চম-সপ্তম শতাব্দীর—উত্তর ভারতীয় প্রতিমাগুলিতে সূর্যদেব স্কন্ধদেশ থেকে আজানুলম্বিত গাত্রাবরণে ভূষিত, তাঁর পায়ে বুট-জুতা-সদৃশ মোটা ও লম্বা জুতা, কটিদেশে বিয়ঙ্গ বা অব্যঙ্গ নামক মেখলা, সব কয়টিতেই বিদেশী বেশবৈশিষ্ট্য; অন্যপক্ষে, সমকালীন দক্ষিণ ভারতের ভাস্কর্যে দেবতার গাত্র নিরাবরণ, তাঁর কটিদেশে অব্যঙ্গ কিংবা পায়ে বুট-জুতাও অনুপস্থিত। আপাতত দৃষ্টান্ত না বাড়িয়ে বলতে হয় দেব-দেবীর মূর্তির মধ্যে একটি অঞ্চলের সমাজ-মানসের প্রকাশ ঘটে। নিপুণ মূর্তিবিদ্ সেই সামাজিক চিত্রটিকে জনসমক্ষে মেলে ধরেন।

কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয়। দেববিগ্রহে সেই পরিবর্তমান রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন দেখা যায়। পূর্বোক্ত পঞ্চম-সপ্তম শতাব্দীর উত্তর ভারতীয় সূর্যপ্রতিমাতে যে বিদেশী বেশভূষার সাক্ষাৎ মেলে, কালক্রমে তা প্রচ্ছন্ন কিংবা অন্তর্হিত হয়; অর্থাৎ সূর্যদেবতার রূপকল্পনার প্রত্যক্ষগোচর প্রকাশে বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব আস্তে আস্তে কমে আসে। গুপ্ত-পূর্ব যুগের কিছু নিদর্শনে সূর্যের রথের অশ্বসংখ্যা চার, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর কালে তাঁর রথের সংখ্যা সাতে দাঁড়িয়েছিল। মূর্তি-শিল্পে কালের প্রভাবের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর বিভিন্ন দেবতার রূপভেদের বহুলতায়; তাঁদের হাতের, কখনও কখনও মুখের, সংখ্যা বৃদ্ধিতে। হিন্দুধর্মের ক্রমবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী-সমাজের দেব-দেবীদের ব্রাহ্মণ্য দেবমণ্ডলে স্থানলাভের জন্যই মূলত এই রূপভেদের বাহুল্য—হাতের ও মুখের সংখ্যার বৃদ্ধিও ধর্মীয় দিগন্তবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন। প্রথম যুগে দেব-দেবীর হাতের সংখ্যা কম, যেমন কুষাণ

ও গুপ্ত যুগের বিষ্ণু ও দুর্গার মূর্তি সাধারণত দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ। পরবর্তী কালে অষ্টভুজ বিষ্ণুপ্রতিমার প্রচলন দেখা গিয়েছে, যদিও আদর্শ বিষ্ণুমূর্তি চতুর্ভুজ। দেবী দুর্গার ক্ষেত্রে হাতের সংখ্যা আশ্চর্যরূপে বেড়ে যায়, বত্রিশ হাত-যুক্ত দেবী-প্রতিমার নিদর্শন বিরল নয়, আর পরবর্তী কালে যে- ধ্যান-কল্পনা ও মূর্তিকে কেন্দ্র করে সর্বজনীন উৎসবের সৃষ্টি, সেখানে তো দেবী অনিবার্যভাবেই দশভুজা। দেব-দেবীকে স্ব স্ব বাহনের সঙ্গে (অনেক সময় বাহনের পৃষ্ঠোপরি) দেখানোর প্রথা পরবর্তী কালের সৃষ্টি। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন যুগের প্রতিমাতে দেব-দেবীরা সাধারণত বাহন-বিরহিত। শুধু কি মূর্ত প্রতীকে কালের ছাপ পড়ে? অমূর্ত প্রতীকেও পরিবর্তমান রুচির স্বাক্ষর স্পষ্ট। শিবদেবতার প্রাচীনতর অমূর্ত প্রতীকগুলি আকারে-প্রকারে মানবীয় প্রজননচিহ্ন, লোকরুচির পরিবর্তনের সঙ্গে শিবলিঙ্গের বাহ্যিক স্থূলতা প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

বলেছি, দেশভেদে ও কালভেদে দেব-দেবীর রূপভেদ হয়ে থাকে। কিন্তু একই কালে একই দেশে দেবতাবিশেষের যে- সকল রূপভেদ দেখা যায়, তার সংখ্যা কিংবা বৈচিত্র্যও কি কম? কথাই তো আছে, হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবতা। এই প্রবাদের মধ্যে মুখ্যত রূপভেদের অগণ্যতার প্রতি ইঙ্গিত বিদ্যমান। কিন্তু সাধারণ একজন পরম বৈষ্ণব বা ভক্ত শৈব তাঁদের স্ব স্ব দেবতার রূপ-কল্পনার বৈচিত্র্য সম্পর্কে কতখানি সংবাদ রাখেন? এইজন্যও মূর্তিবিদ্যার ব্যাপক আলোচনা ও সম্প্রসারের প্রয়োজন। বিষ্ণুর একমুখবিশিষ্ট শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী রূপ সুবিদিত, কিন্তু তাঁর চতুর্মুখের ধ্যান-কল্পনা সাধারণ্যে অজ্ঞাত বললেই চলে; চতুর্ব্যূহ বা চতর্মূর্তি (বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের একত্রিক রূপ) নামে পরিচিত এই জাতীয় বিগ্রহের মধ্যের বা সামনের মুখটি সৌম্য মানুষের (বাসুদেবের রূপ), দক্ষিণানন সিংহের (সংকর্ষণের রূপ), বাম দিকের মুখটি বরাহের (প্রদ্যুম্নের রূপ) এবং পশ্চাতের মুখ রাক্ষসের (অনিরুদ্ধের রূপ) এবং এই ধরনের প্রতিমা মধ্যযুগের কাশ্মীর থেকে আশানুরূপ সংখ্যক পাওয়া গিয়েছে। কালক্রমে এই চতুর্ব্যূহ চতুর্বিংশতি ব্যূহে পরিণত হলে একই দেবতা কেশব, নারায়ণ, মাধব প্রভৃতি চতুর্বিংশতি ব্যূহ নামে পরিচিত হন এবং শঙ্খ-চক্রাদি লাঞ্ছন চারিটির বিন্যাসের সামান্য তারতম্য করে বিষ্ণুপ্রতিমা (সাধারণত 'স্থানক' অর্থাৎ দণ্ডায়মান) নির্মিত হয়। এ সূত্রে অপর মুখ্য দেবতা শিবের রৌদ্র বা উগ্র রূপের প্রকাশক প্রতিমার সংখ্যা-বাহুল্যের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয়। ত্রিপুরান্তক, কালান্তক,

কামদহন প্রভৃতি সংহারমূর্তি ছাড়া ভৈরব অভিধায় চিহ্নিত মূর্তির সংখ্যা ন্যূনপক্ষে চৌষট্টি। ইঁদুরবাহন একমুখ গণেশের রূপই সুপরিচিত, কিন্তু সিংহারূঢ় পঞ্চমুখ হেরম্ব-গণপতির খোঁজ ক'জন রাখেন? দেবী সরস্বতীর বাহনরূপে হাঁস আমাদের আবাল্য পরিচিত, কিন্তু রাজশাহি মিউজিয়ামে দেবীপ্রতিমাতে হাঁসের স্থান যে মেষ কেড়ে নিয়েছে, এ তো মূর্তিবিদ্যা পড়তে গিয়েই জেনেছি। আর একটি দৃষ্টান্ত: বাঙালীর মনে কার্তিক চিরকুমার, কিন্তু দক্ষিণীরা কার্তিককে অবিবাহিত রাখতে চান নি, তা-ও আবার একটি নয়, বল্লী ও দেবসেনা নামে দু-দু'টি স্ত্রী তাঁর জন্য সংগ্রহ করেছেন। দক্ষিণ ভারতীয় কলাকৃতি না দেখলে এই তথ্য জানা যায় না, কিন্তু ক'জন সংস্কৃতি-সন্ধানী একথা অবগত আছেন?

আপাতদৃষ্টিতে বহু দেবতার উপাসক হলেও যথার্থ হিন্দু বরাবরই একেশ্বরবাদের অনুরাগী, সেই ঋগ্বেদের সময় থেকেই (পূর্বোদ্ধৃত 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' মন্ত্রাংশ স্মরণীয়)। সুতরাং মাঝে মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত এক সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বলেছেন, তোমার ও আমার দেবতা মূলত অভিন্ন। এই সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার খবরও মূর্তিকলা থেকে পাওয়া যায়। সাম্প্রদায়িক বিরোধের অন্যতম দৃষ্টান্ত বিষ্ণুর নৃসিংহ ও শিবের শরভেশ রূপ এবং বৌদ্ধ দেবতা হরি-হরি-হরি-বাহনোদ্ভব লোকেশ্বর; শিবানুরাগী হিরণ্যকশিপুকে শাস্তিদানের এবং স্বীয় ভক্ত প্রহ্লাদকে পিতার অত্যাচার থেকে রক্ষা করবার জন্য বৈষ্ণবগণ নৃসিংহের রূপ-কল্পনা করেন এবং শৈবরা তারই পাল্টা জবাব দেন নৃসিংহের হন্তারক রূপে শিবের শরভেশ মূর্তি-কল্পনার মাধ্যমে। অপর মূর্তিটি বিষ্ণুভক্ত ও বৌদ্ধদের বিরোধের দ্যোতক, সিংহের (হরির) পৃষ্ঠোপরি গরুড় (হরি), গরুড়ের পৃষ্ঠোপরি বিষ্ণু (হরি) এবং বিষ্ণুর পৃষ্ঠোপরি লোকেশ্বর (বুদ্ধের রূপবিশেষ)-কে স্থাপনা করে বৈষ্ণবধর্মের তুলনায় শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের চেষ্টা হয়েছে। এই ধরনের কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক রূপ-প্রমূর্তির সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও তুলনামূলকভাবে সমন্বয়াত্মক দেব-প্রতিমার সংখ্যাই বিস্তর, এবং বলা বাহুল্য, আলোচ্য প্রতিমাগুলিতে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহনশীলতার পরিচয় চমৎকারভাবে মূর্ত হয়েছে। হরিহর বা শঙ্কর-নারায়ণ, অর্ধ-নারীশ্বর, মার্তণ্ড-ভৈরব, বিষ্ণু-লোকেশ্বর, শিব-লোকেশ্বর প্রভৃতি মিশ্র প্রকৃতির প্রতিমাগুলিতে যথাক্রমে বিষ্ণু ও শিবের, পার্বতী ও শিবের, সূর্য ও শিবের,

বিষ্ণু ও বুদ্ধের এবং শিব ও বুদ্ধের সমন্বয়ের বা একাত্মীভবনের আদর্শ অভিব্যক্ত হয়েছে। হরিহর মূর্তির অর্ধাংশ হরির, অর্ধাংশ হরের : অংশ দু'টিতে দেবতাদ্বয়ের রূপ-কল্পনাগত বৈশিষ্ট্য বর্তমান; অর্ধনারীশ্বরেরও তাই—দু'টি অংশে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যসহ শিব ও পার্বতী একাত্মীভূত; মার্তণ্ড-ভৈরবের মূর্তিতে একাংশ সূর্যের, অপরাংশ ভৈরবের অর্থাৎ শিবের; বিষ্ণু-লোকেশ্বর ও শিব-লোকেশ্বরের প্রতিমাগুলিতে যথাক্রমে বিষ্ণু ও শিবের শিরোভূষণে ধ্যানী বুদ্ধের প্রতিকৃতি স্থাপন করে শিল্পী বিষ্ণু ও শিবের সঙ্গে ভগবান বুদ্ধের ঐক্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিষ্ণু-লোকেশ্বর ও শিব-লোকেশ্বর যেমন হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের ঐক্যবোধের দ্যোতক, জৈনদের উপাস্য অম্বিকা বা কুষ্মাণ্ডিনী ও পদ্মাবতী যথাক্রমে হিন্দু দুর্গা ও মনসার প্রতিরূপ হিসাবে হিন্দু ও জৈনধর্মের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতার পরিচায়ক। প্রসঙ্গত, শুধু মূর্ত প্রতীক নয়, অমূর্ত প্রতীকের মাধ্যমেও যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হয়েছিল, তারও কিছু বাস্তব প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে সংরক্ষিত চতুষ্পার্শ্বে গণেশ, বিষ্ণু, পার্বতী ও সূর্যের মূর্তিবহ শিবলিঙ্গটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখযোগ্য; বলা বাহুল্য এই লিঙ্গ-প্রতীকটি অপর দেবতা-চতুষ্টয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল শিবভক্ত কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল। আজমীঢ় মিউজিয়ামের একটি শিবলিঙ্গের ঊর্ধ্বাংশে চারদিকে চারটি শিবমুখ, শিবমুখের নিচে যথাক্রমে উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে মুখ করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং সূর্যের স্থানক মূর্তিচতুষ্টয় সংস্থাপিত। সাম্প্রদায়িক ঐক্যবোধের পরিচয়বাহী মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের পঞ্চায়তন মন্দিরগুলিও (মন্দির-মণ্ডলের মধ্যভাগে শিব, বিষ্ণু, দেবী বা সূর্য—এঁদের একজনের মূল মন্দির, মন্দির-চত্বরের চতুষ্কোণে বাকি চারটি দেবতার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্দির অবস্থিত) এ সূত্রে স্মরণীয়।

॥ তিন ॥

ভারতীয় মূর্তিবিদ্যা অনন্তপার, ব্যাপকতায় ও গভীরতায় এতই দূর-প্রসারী যে, কোন সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তার সর্বতোভদ্র পরিচয় দেওয়া প্রায় অসম্ভব, বড় জোর রূপ-রেখার আভাস দেওয়া যেতে পারে। উপরের আলোচনায় আমি সেই চেষ্টাই করেছি কতদূর সফল হয়েছি তা পাঠকের বিচার্য। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির সার্থক গবেষণা যে মূর্তিবিদ্যার অনুশীলন ছাড়া অসম্ভব, তা বোধ হয় আমার এই বিনীত আলোচনায় পরিস্ফুট হয়েছে। গবেষণার অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, মূর্তিবিদ্যার ক্ষেত্রেও

তেমনই আমরা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের কাছে ঋণী। ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে আনন্দ কেণ্টিশ কুমারস্বামী, টি. এ. গোপীনাথ রাও[১], এইচ, কৃষ্ণশাস্ত্রী, বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য, আমার আচার্যদেব জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ মনীষিগণ ভারতীয় মূর্তিবিদ্যার (ব্রাহ্মণ্য, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম-সংক্রান্ত) গবেষণার ক্ষেত্রকে প্রশস্ততর করেছেন। কিন্তু গবেষণার অবকাশ এখনও পর্যাপ্ত, এবং সুখের বিষয় সাম্প্রতিক গবেষকদের দৃষ্টি মূর্তিবিদ্যার প্রতি ক্রমশ আকৃষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এই সমস্ত গবেষণার ফলাফল ইংরেজীতে প্রকাশিত এবং সাধারণের পক্ষে সর্বদা সহজলভ্য নয়। অথচ সংস্কৃতি-সচেতন যে কোন ভারতীয়ের (যে-কোন ধর্মাবলম্বী কিংবা মূর্তিপূজার বিরোধী কিংবা নাস্তিক্য বুদ্ধিসম্পন্ন হলেও) পক্ষে ভারতীয় মূর্তিবিদ্যার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সে ধরনের বই কোথায়? সম্প্রতি হিন্দিতে মূর্তিবিদ্যা বিষয়ক ছোট-বড় কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘকাল আগে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচিত লক্ষ্মী ও সরস্বতী সম্পর্কিত গ্রন্থিকাতে বাংলা ভাষায় মূর্তিবিদ্যা আলোচনার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। এক দশক আগে জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'পঞ্চোপাসনা' (কলিকাতা, ১৯৬৬) গ্রন্থের প্রকাশ বাঙালী গবেষণার ক্ষেত্রে ঘটনা হিসাবে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য; এতে বিষ্ণু-শিবাদি ব্রাহ্মণ্য দেবতা-পঞ্চকের মূর্তিকলা ও মূর্তিতত্ত্ব সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা আছে। কিন্তু বাংলাতে এমন একটি গ্রন্থও নেই যাতে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন এবং লোকায়ত সকল ধর্মের বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি সম্পর্কিত আলোচনা আছে। জানি, এই ধরনের গ্রন্থ রচনা প্রচুর সময়-, পরিশ্রম- ও গবেষণা- সাপেক্ষ এবং সম্প্রতিকালে আমাদের দেশে সেই ধরনের তন্নিষ্ঠ পরিশ্রমী গবেষক কোটিকে গোটিক। ধর্মের দেশ ভারতবর্ষে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অভাব নেই, কিন্তু তাঁদের মধ্যেও কেউ এই দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপনে এগিয়ে আসেন নি, নিঃসন্দেহে এ ঘটনা খেদজনক।

১ তাঁর কীর্তিস্তম্ভ-সদৃশ *Elements of Hindu Iconography* (Madras, Vol. I, 1914, Vol. II, 1916) সম্প্রতি আমার সম্পাদনায় Indological Book House (Delhi and Varanasi) থেকে দীর্ঘদিন বাদে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে।

মূর্তিশিল্পে হিন্দু দেব-দেবী, কয়েকটি দৃষ্টান্ত

স্মার্ত হিন্দুর প্রধান পাঁচ উপাস্য দেবতা হলেন বিষ্ণু, শিব, সূর্য, দেবী (আদি স্ত্রী-শক্তির দৈবী রূপ) এবং গণপতি। প্রাচীন ভারতবর্ষে এই দেবতাপঞ্চকের এক একজনকে কেন্দ্র করে এক একটি ধর্মসম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। সম্প্রদায়গুলি যথাক্রমে বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, শাক্ত এবং গাণপত্য নামে পরিচিত। বর্তমানে সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সৌর এবং গাণপত্যের অস্তিত্ব বিশেষ নেই বললেই চলে। এবং হিন্দুরা তাঁদের বিশেষ বিশেষ ইষ্টদেবতার (বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর, শৈবরা শিবের) মুখ্য উপাসক হলেও বাকি চার দেবতার প্রতি ভক্তিমান এবং পূজার্চনার সময় পাঁচ দেবতাকেই স্মরণ করেন ('গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ')। হিন্দু স্থাপত্যের পঞ্চায়তন মন্দিরের কল্পনা ও নির্মাণেও এই পঞ্চোপাসনার (পঞ্চ দেবতার উপাসনা) পরিচয় প্রমূর্ত। পাঁচটি মন্দিরের সমবায়ে নির্মিত পঞ্চায়তন মন্দিরপ্রকল্পের কেন্দ্রীয় বা মধ্যস্থ মন্দিরটি নির্মাণকারী ভক্ত বা ভক্তদের ইষ্টদেবতার মন্দির, চার কোণে অবস্থিত বাকি চারটি মন্দিরে দেবতা-চতুষ্টয়ের বিগ্রহ অবস্থিত। অর্থাৎ মূল মন্দিরটি বিষ্ণুর হলে বাকি চারটি মন্দিরে শিব, সূর্য, দুর্গা বা পার্বতী (দেবীর গণবোধক রূপ ও নাম) এবং গণেশের প্রতিমা বিরাজিত হবে। বাহ্যত বহু দেবতার উপাসক হিন্দুরা যে মূলত একেশ্বরবাদী এই পঞ্চোপাসনার মধ্যেও তার পরিচয় বিদ্যমান এবং এই একেশ্বরবাদের সুর দূরবিসারী, ঋগ্বেদের 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' মন্ত্রাংশে তা প্রথম শ্রুত হয়।

সদ্যোক্ত দেবতাপঞ্চক ছাড়া আরও বহু দেব-দেবী হিন্দুদের শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন। ব্রহ্মা, স্কন্দ-কার্তিক, নবগ্রহ, অষ্ট দিক্‌পাল এমন কি একাধিক লৌকিক দেব-দেবীকেও হিন্দুরা ভক্তি নিবেদন করে থাকেন। সাংস্কৃতিক মিলন-মিশ্রণ সমন্বয়ের ফলে দূর অতীতের সীমাবদ্ধ দেবমণ্ডলী যে কালক্রমে বৃদ্ধি ও পুষ্টিলাভ করেছে এবং এরই ফলে দেব-দেবীদের মূল রূপ-কল্পনাতেও যে অনেক পরিবর্ধন ও পরিমার্জন ঘটেছে তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। হিন্দু দেব-দেবীদের মূর্তি সংখ্যাতে যেমন, বৈচিত্র্যেও তেমনই অসাধারণ, ফলত সে-সব মূর্তির ব্যাখ্যা এবং

বর্ণনা স্বতন্ত্র ও বৃহৎকলেবর গ্রন্থের বিষয়ীভূত।[১] বর্তমান আলোচনায় কয়েকটি দৃষ্টান্তের বর্ণনায় হিন্দু দেবপ্রতিমা-শিল্পের আভাসমাত্র দেওয়া হলো।

পরমভাগবত গুপ্তবংশীয় সম্রাটদের আমল (খ্রীস্টীয় চতুর্থ-ষষ্ঠ শতক) থেকেই বিষ্ণুমূর্তির বৈচিত্র্য ও প্রাধান্য বাড়তে থাকে। গুপ্তপূর্ব যুগের প্রতিকৃতিগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন নিদর্শনের সাক্ষাৎ মেলে উত্তর আফগানিস্তানের আইখানুম-এ প্রাপ্ত ইন্দো-গ্রীক নৃপতি অ্যাগাথোক্লিস (খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) -এর ব্রোঞ্জমুদ্রায় ; এর এক পিঠে চক্রধারী বাসুদেব-বিষ্ণু, অন্য দিকে হল ও মুষলধারী বলরাম। এ ছাড়া খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতকের বিষ্ণুমিত্রের তাম্রমুদ্রায় উৎকীর্ণ অস্পষ্ট বিষ্ণুমূর্তিটিও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পৌরাণিক বিষ্ণুর অর্থাৎ আদিত্য-বিষ্ণু, নারায়ণ ও বাসুদেব কৃষ্ণের সমন্বয়ে সঞ্জাত দেবতার রূপ-কল্পনা সার্থক, বিচিত্রতর ও বহুবিধ মূর্তির মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে।

বিষ্ণুর বিভিন্ন প্রতিমাকে 'ধ্রুববের' (অর্থাৎ ধ্রুবমূর্তি), 'ব্যূহমূর্তি' এবং 'বিভব' বা 'অবতার'মূর্তি, এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এই তিন শ্রেণীর মূর্তি যথাক্রমে বিষ্ণুর 'পর', 'ব্যূহ' এবং 'বিভব' রূপের প্রকাশক। খ্রীস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে দক্ষিণ ভারতে রচিত 'বৈখানসাগম' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ, কামনা-বাসনার চরিতার্থতা, শৌর্যবীর্যলাভ এবং শত্রুর ক্ষতিসাধন — ভক্তগণের এই চতুর্বিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যথাক্রমে 'যোগ', 'ভোগ', 'বীর' এবং 'অভিচারিক' এই চার শ্রেণীর ধ্রুবমূর্তির সৃষ্টি। এদের প্রত্যেকটি আবার 'স্থানক', 'আসন' ও 'শয়ন' এই তিনভাগে বিভক্ত। আলোচ্য দ্বাদশটি উপবিভাগের প্রত্যেকটি আবার 'উত্তম', 'মধ্যম' ও 'অধম' এই তিন শ্রেণী-পর্যায়ে বিভক্ত। বাস্তবে অবশ্য ছত্রিশ রকমের ধ্রুবমূর্তির সাক্ষাৎ মেলে না। বীরশ্রেণীর কোনও বিষ্ণুমূর্তি অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি। অভিচারিক শ্রেণীর একটি স্থানক বা দণ্ডায়মান প্রস্তরমূর্তি বর্ধমানের চৈতনপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে। আনুমানিক

---

১ হিন্দু মূর্তিতত্ত্বের সর্বশেষ প্রামাণিক গ্রন্থ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত *Development of Hindu Iconography*; ১৯৫৬ সালে এই গ্রন্থের প্রকাশের পর (সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত) আবিষ্কৃত আরও অনেক আকর্ষক প্রতিমা-নিদর্শনের কয়েকটি প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লিখিত হয়েছে।

সপ্তম শতাব্দীর এই চার হাতবিশিষ্ট কুদর্শন মূর্তির নিচের দক্ষিণ ও বাম হস্ত যথাক্রমে গদাদেবী ও চক্রপুরুষের মস্তকোপরি ন্যস্ত, উপরের দক্ষিণ ও বাম হস্তে যথাক্রমে পদ্ম ও শঙ্খ ধৃত রয়েছে। বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত যোগমূর্তি-গুলির মধ্যে মহাবলীপুরমের যোগস্থানক ও যোগশয়ন এবং মথুরার যোগাসন মূর্তিগুলির উল্লেখ করা যায়। বিষ্ণুর ভোগমূর্তির সংখ্যা স্বভাবতই বেশি এবং ভারতের সর্বত্রই এ ধরনের মূর্তি পাওয়া গেছে। দুই হাত-, চার হাত-, আট- হাতবিশিষ্ট মূর্তির মধ্যে চতুর্ভুজ প্রতিমার সংখ্যা সর্বাধিক : এই শ্রেণীর মূর্তিতে দেবতার দু দিকে তাঁর দুই পত্নী লক্ষ্মী ও সরস্বতী (কখনও বা দেবী বসুমতী) দণ্ডায়মানা। উত্তর প্রদেশের ফতেপুর সিক্রির কাছে রূপবাস গ্রামে প্রাপ্ত শঙ্খ- ও চক্র- ধারী মূর্তিটি দ্বিভুজ, বাদামী গুহাগাত্রে ক্ষোদিত মূর্তিটি অষ্টভুজ ; শেষোক্ত ভাস্কর্যে দেবতার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ হস্তে চক্র, শর, গদা ও খড়্গ এবং বাম দিকের তিন হাতে শঙ্খ, খেটক ও ধনু, অপরটি কটিহস্ত ভঙ্গীতে বিন্যস্ত। দেবতার চতুর্ভুজ মূর্তি- শ্রেণীর প্রাচীন নিদর্শন মথুরার রাধাকৃষ্ণ সংগ্রহালয়ে এবং মধ্যপ্রদেশের উদয়গিরি গুহাগাত্রে দেখা যায়। প্রথম মূর্তির পিছনের দু হাতে গদা ও চক্র, সামনের দু হাতের দক্ষিণটি অভয়মুদ্রায় বিন্যস্ত ; বামটিতে কমণ্ডলুসদৃশ দীর্ঘগ্রীব জলপাত্র। দ্বিতীয় মূর্তির পিছনের হাত দু'টি চক্রপুরুষের ও গদা-দেবীর মস্তকোপরি ন্যস্ত, সামনের বাম হাতে শঙ্খ, ডান হাত ভেঙে গেছে ; উদয়গিরির মূর্তির বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্নের অন্যতম প্রাচীন নিদর্শনের সাক্ষাৎ মেলে।

বিষ্ণুর ভোগাসন মূর্তির দু'টি উপবিভাগ : এক শ্রেণীর মূর্তিতে দেবতা আদিশেষের কুণ্ডলীনির্মিত আসনে সমাসীন, অন্যটিতে তিনি স্বীয় বাহন গরুড়ের পৃষ্ঠে বসে থাকেন। এই দুই শ্রেণীর আসনমূর্তির দু'টি উদা-হরণ যথাক্রমে উত্তর প্রদেশের দেওগড়ের দশাবতার মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ মূর্তি এবং বাখরগঞ্জে প্রাপ্ত একটি প্রতিমা। দেওগড়ের মন্দিরগাত্রে দেবতার ভোগশয়ন মূর্তির যে-দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে, তা শিল্পকলার নিদর্শন হিসাবে অনুপম ও সুপ্রসিদ্ধ।

বিষ্ণুর ব্যূহমূর্তিগুলির দু'টি রূপ : 'চতুর্ব্যূহ' ও 'চতুর্বিংশতি ব্যূহ'। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের মূর্তিসমন্বিত রূপ 'চতুর্ব্যূহ' বা 'চতুর্মূর্তি' নামে পরিচিত। একাধারে সন্নিবেশিত এই চারটি মুখের সামনের সৌম্য মুখটি ব্যূহ বাসুদেবের, দক্ষিণের মুখটি সিংহাস্য সঙ্কর্ষণের, বামের মুখটি বরাহবদন প্রদ্যুম্নের এবং পিছনের রাক্ষসমূর্তিটি অনিরুদ্ধের।

মনে হয় কাশ্মীরে বিষ্ণুর চতুর্ব্যূহ যখন 'চতুর্বিংশতি ব্যূহে' রূপান্তরিত হলো, তখন ভিন্ন এবং সহজতর উপায়ে দেবতা রূপায়িত হলেন : বিষ্ণুর চারটি হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এই চারটি লাঞ্ছনের ভিন্নরূপ অবস্থানের দ্বারা বিষ্ণুর চতুর্বিংশতি রূপ পাওয়া গেল এবং প্রত্যেকটি রূপের একটি করে নামও স্থিরীকৃত হলো। এই চব্বিশটি মূর্তির প্রত্যেকটিতে দেবতা একবক্ত্র ও দণ্ডায়মান।

বিষ্ণুর বিভব- বা অবতার- মূর্তির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক, এবং এদের প্রাচীনত্বও দূরপ্রসারী। বিভিন্ন পুরাণে অবতার-রূপের যে-সকল তালিকা আছে, তার একটিতে আছে বিষ্ণুর অবতার-সংখ্যা উনচল্লিশ। কিন্তু বিষ্ণুর দশাবতারের ঐতিহ্যই সুপ্রচলিত। মৎস্য-, কূর্ম- ও বরাহ-অবতারের রূপ পূর্ণত বা অংশত পশুরূপে শিল্পিত হতো, নরসিংহ স্বভাবতই সিংহাস্য ও মনুষ্যদেহী ; বামন অবতারের দুই রূপ : (১) বামনাকৃতি ব্রাহ্মণ বালক ও (২) ঊর্ধ্বে পদোৎক্ষেপকারী দেবতার বিরাট রূপ। বাকি অবতার-মূর্তির সবগুলিতেই বিষ্ণু নররূপ এবং প্রধানত দ্বিভুজ। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার-রূপের প্রতিমা পাওয়া গেছে। এই সকল রূপের মধ্যে প্রধানত বরাহ, নরসিংহ এবং বামন-ত্রিবিক্রম, এই তিন অবতারের স্বতন্ত্র প্রতিমার সংখ্যা সমধিক। অনেক ক্ষেত্রে বিষ্ণুমূর্তির পৃষ্ঠ-ফলকে এক সঙ্গে দশাবতারের দেবতার প্রতিকৃতি ক্ষোদিত হতো। বিষ্ণুপট্ট নামে এক শ্রেণীর প্রস্তর ও ধাতব পট্টের উপর উৎকীর্ণ বিষ্ণুর দশাবতার মূর্তি বাংলাদেশের নানা স্থান থেকে পাওয়া গেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত অবতার-মূর্তিগুলির মধ্যে এলাহাবাদের নিকটস্থ গাড়ওয়া গ্রামের মৎস্য- ও কূর্ম- মূর্তি ; মহাবলীপুরম, উদয়গিরি, বাদামী ও এরানের বরাহমূর্তি (এরানের মূর্তিতে দেবতা পুরোপুরি পশুরূপেই রূপায়িত, বাদামীর মূর্তিতে পৃথিবী-দেবী বরাহ-বিষ্ণুর বাম হস্তের উপর দণ্ডায়মানা ; এলোরা, দাদিক্কোম্বু (মাদ্রাজের দিন্দিগুল-এর কাছে) গাড়ওয়া, পাইকোড় (বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ) প্রভৃতি স্থানের নরসিংহ- মূর্তি ; মহাবলীপুরম, বাদামী, এলোরা প্রভৃতির বামন-ত্রিবিক্রম মূর্তি উল্লেখযোগ্য। পরশুরাম, রাঘব-রাম এবং বলরামের (বলরামের প্রাচীনতম প্রতিকৃতি পূর্বোক্ত অ্যাগাথোক্লিস-এর মুদ্রায় দৃশ্যমান) প্রাচীন স্বতন্ত্র প্রতিমা বিরল এবং তাঁদের প্রত্যেকে সাধারণত দ্বিভুজ রূপে চিত্রিত হন। দক্ষিণ ভারতে কৃষ্ণের সত্যভামা ও রুক্মিণী এই দুই পত্নীসহ রূপটি সমধিক প্রচলিত। শ্রীচৈতন্যের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে বালগোপাল (নাড়ুগোপাল),

বেণুগোপাল, গোবর্ধনধারী, কালীয়দমন, মদনমোহন, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি কৃষ্ণের নানাবিধ প্রতীকী লীলামূর্তি সংশ্লিষ্ট এবং এইসব মূর্তি মধ্য ও বর্তমান যুগের বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষ্ণু-মন্দিরে পূজিত হয়। কল্কির স্বতন্ত্র মূর্তি পাওয়া যায় না ; দশাবতার ফলকেই তিনি অশ্বারোহী ও অসিধারী রূপে চিত্রিত হন।

বিষ্ণুর পূর্বোল্লিখিত উনচল্লিশ অবতার রূপের মধ্যে শান্তাত্মন্ বুদ্ধের সঙ্গে অভিন্ন, ঋষভনাথ জৈনধর্মের প্রবর্তক ঋষভনাথ বা আদিনাথ। অন্যান্য অবতারের মধ্যে নর-নারায়ণ, মান্ধাতা, করীবরদ, দত্তাত্রেয়, বিশ্বরূপ প্রভৃতির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মূর্তি পাওয়া গেছে। দেওগড়ের দশাবতার-মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ নর-নারায়ণের যুগ্ম মূর্তি, অমরাবতীতে প্রাপ্ত মান্ধাতার মূর্তি, করীবরদ বা গজেন্দ্রমোক্ষ রূপের প্রতিকৃতি, দত্তাত্রেয় অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের সমন্বয়াত্মক বা সমবেত মূর্তি, রাজশাহি মিউজিয়ামে বিদ্যমান বিংশতি-হস্ত সমপদস্থানক বিষ্ণুর বিশ্বরূপ-মূর্তি, অশ্বমুখবিশিষ্ট বিষ্ণুর হয়গ্রীব মূর্তি (নুগেগহাল্লীর অষ্টভুজ মূর্তি) প্রভৃতি বিষ্ণুর অন্যান্য অবতাররূপের প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত। দক্ষিণ ভারতের একাধিক স্থানে আবিষ্কৃত 'ত্রিমূর্তি' শ্রেণীর মূর্তিগুলিতে মধ্যবর্তী প্রধান স্থানটি বিষ্ণুর, পার্শ্ববর্তী মূর্তিদ্বয় শিবের ও ব্রহ্মার ; এখানে বিষ্ণুকে অপর দুই দেবতার চাইতে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করবার প্রয়াস সুপ্রকট। অন্যপক্ষে, হরিহর, বাসুদেব-লক্ষ্মী, সূর্যনারায়ণ, পূর্বোক্ত দত্তাত্রেয় (বা হরি-হর-পিতামহ) মূর্তিগুলিতে বিষ্ণু-ভক্তদের ধর্মীয় ঔদার্য ও সমন্বয়াত্মক মনোভাবের পরিচয় প্রতিফলিত। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্মের সমন্বয়াত্মক প্রচেষ্টা বিষ্ণু-লোকেশ্বর শ্রেণীর প্রতিমা-গুলিতে প্রমূর্ত।

বিষ্ণু-মূর্তির সূত্রে বিষ্ণুর লাঞ্ছনগুলির মানবিক রূপ-কল্পনার উল্লেখ করতে হয়। চক্রপুরুষ ও গদাদেবী ছাড়া অন্য দুই লাঞ্ছনের মানবিক রূপ হলো পদ্মপুরুষ ও শঙ্খপুরুষ। আয়ুধপুরুষ নামে কথিত এই চারটি লাঞ্ছনের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মূর্তি নেই, বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁরা রূপায়িত হন। বিষ্ণুর বাহন গরুড় কখনও কখনও স্তম্ভ বা ধ্বজের উপরও দৃষ্টিগোচর হন। এখানে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর বেসনগরের (মধ্যপ্রদেশের ভিলসার কাছে) বিখ্যাত গরুড়ধ্বজ স্মরণীয়। গরুড় এক হিসাবে বিষ্ণুর বাহন, অন্যভাবে তাঁর পশুপ্রতীক-রূপ।

শিব

বিষ্ণুর মতো হিন্দুদের আর-একজন প্রধান দেবতা শিব বা মহাদেব। তাঁরও একাধিক রূপ : অমূর্ত বা প্রতীকী লিঙ্গ-রূপ, পশু-রূপ ও মানুষী রূপ। অন্যান্য দেবতার মানুষী রূপ জনপ্রিয়, কিন্তু প্রতীকী রূপ শিব-লিঙ্গের মাধ্যমে মহাদেবের পূজার্চনা সমধিক প্রচলিত। বস্তুত, ভারতের প্রত্যেক শিবমন্দিরের গর্ভগৃহের আরাধ্য বস্তু শিবলিঙ্গ, দেবতার পশু-রূপ (তাঁর বাহন বৃষ, নাম নন্দী) ও মানুষী রূপগুলি মন্দিরের অন্যত্র মূর্তিতে। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকের কিছু লেখবিহীন মুদ্রায় (কিছু cast বা ঢালাই, কিছু ছাঁচে তৈরী) শিবলিঙ্গের সাক্ষাৎ মেলে। শিবলিঙ্গের জনপ্রিয়তা কিছু সংখ্যক আকর্ষণীয় মিশ্র রূপের দৃষ্টান্তেও সপ্রমাণ: মুখলিঙ্গ এবং লিঙ্গোদ্ভব-মূর্তিতে শিবলিঙ্গের সঙ্গে দেবতার মানুষী রূপও চিত্রিত। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত ও অন্ধ্র প্রদেশের গুড়িমল্লমে আবিষ্কৃত নিদর্শনে একটি বড়ো শিবলিঙ্গের উপর দ্বিভুজ ও জটাধারী মহাদেবের মূর্তি দেবতার প্রতীকী ও মানুষী রূপের সমন্বয়ের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। অনুরূপভাবে, ঐ সময়ের কিছু মুদ্রায় দেবতার প্রিয় লাঞ্ছন ত্রিশূল বা পরশু-সমন্বিত ত্রিশূলসহ বৃষ দৃষ্টিগোচর হয়। ত্রিশূলের অনুষঙ্গে এই বৃষকে শিবের পশু-রূপ মনে করা সঙ্গত। খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর হূণ রাজা মিহিরকুলের মুদ্রায় বৃষের প্রতিকৃতির নিচে 'জয়তু বৃষ:' লেখা আছে, বলা বাহুল্য এই বৃষ শিবেরই পশু-রূপ। দেবতার মানুষী রূপের সংখ্যা প্রচুর, প্রকাশভঙ্গী অনুসারে মানুষী মূর্তিগুলি 'সৌম্য' ও 'ঘোর' এ দু শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কয়েকটি কাহিনী-আশ্রিত হওয়ায় 'সৌম্য' ও 'ঘোর' মূর্তিগুলির দু'টি উপবিভাগ : কাহিনী-বিহীন সৌম্য ও ঘোর মূর্তি, কাহিনী-আশ্রিত সৌম্য ও ঘোর প্রতিকৃতি, অর্থাৎ মোট চার শ্রেণীর শিববিগ্রহের সাক্ষাৎ মেলে। হরগৌরী, বৃষবাহন (বৃষের পিঠে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো), বৃষভারূঢ় (বৃষভে আরূঢ়), চন্দ্রশেখর (জটায় অর্ধচন্দ্র দৃশ্যমান) প্রভৃতি কাহিনী-বিহীন সৌম্য প্রতিমা ; গঙ্গাধর (জটায় ধৃত গঙ্গা), কল্যাণসুন্দর (শিব-পার্বতীর পরিণয়-দৃশ্যের রূপায়ক), রাবণানুগ্রহ (ভক্ত রাবণের দর্পহারী ও অনুগ্রহকারী), চণ্ডেশানুগ্রহ (বিচারশর্মার ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে তাঁকে চণ্ডেশ নাম দিয়ে প্রধান প্রতিহারী নিযুক্ত করেছিলেন) প্রভৃতি কাহিনী-আশ্রিত সৌম্য মূর্তির দৃষ্টান্ত ; রাবণানুগ্রহ, চণ্ডেশানুগ্রহ প্রভৃতি দেবতার 'অনুগ্রহ-

মূর্তি' নামেও পরিচিত। মহাদেবের ঘোর রূপের সংখ্যা যথেষ্ট, হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ হিন্দুদের কল্পনা-কিংবদন্তীতে তিনি ধ্বংসের দেবতা। অঘোর, পাশুপত, ভৈরব, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি তাঁর কাহিনী-বিহীন বিগ্রহ। অধিকাংশ শৈব আগম ও তন্ত্রগ্রন্থে মহাদেবের ভৈরব-রূপের সংখ্যা চৌষট্টি বলা হয়েছে (চৌষট্টি ভৈরবের জন্য চৌষট্টি যোগিনীর কল্পনা ও মূর্তিও এ সূত্রে স্মরণীয়), এই সব ভৈরবের অধিকাংশই ভয়ালদর্শন। তাঁর কামদহন বা কামান্তক, কালারি বা যমান্তক, ত্রিপুরান্তক, গজাসুর-সংহার প্রভৃতি কাহিনী-নির্ভর ঘোর মূর্তির দৃষ্টান্ত (নামকরণেই স্পষ্ট ; যেমন, কামান্তক অর্থাৎ যে- মূর্তিতে তাঁর কামদহনের দৃশ্য বা ঘটনা রূপায়িত)। এই চার শ্রেণীর মূর্তি ছাড়া আর-একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর প্রতিমানিচয়ের গণবোধক নাম 'দক্ষিণামূর্তি', এই ধরনের মূর্তিতে মহাদেবের যোগীরূপ, ব্যাখ্যাতা- বা শিক্ষক- রূপ এবং নৃত্যগীতে পারঙ্গম রূপের পরিচয় দেওয়া হয় (দক্ষিণমুখী হয়ে তিনি যোগসাধনা, শিষ্যদের শিক্ষাদান ইত্যাদি করেছিলেন বলে দক্ষিণামূর্তি নামকরণ) ; মহাদেবের দক্ষিণামূর্তির সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় উদাহরণ 'নটরাজ'। পূর্বোক্ত শ্রেণীগুলির (দক্ষিণামূর্তিসহ) বহিঃপাতী দেবতার আর দু'টি শ্রেণীর রূপ-নিদর্শন হলো : সদাশিব ও মহাসদাশিব এবং লকুলীশ মূর্তি। সদাশিব-মহাসদাশিবে শুদ্ধ শৈবদের তত্ত্বদর্শন অভিব্যক্ত ; আদিতে মানুষ ও শৈব গুরু এবং পরে দেবায়িত ও শিবের অবতাররূপে কল্পিত লকুলীশের মূর্তি মহাদেবের বিগ্রহ-রূপেই পূজিত হয়। নিচে শিবের বটুক-ভৈরব ও নটরাজ রূপ-প্রমূর্তি বর্ণিত হলো।

বটুক-ভৈরব : 'ভরণ' বা সৃষ্টিকে রক্ষা করেন বলে মহাদেবের আর-এক নাম ভৈরব, যদিও ভৈরবের রূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উগ্র ও ভয়াল। চৌষট্টি ভৈরবের অন্যতম 'বটুক-ভৈরব' নামের অর্থ সুন্দর বা যুবক ভৈরব। প্রাচীনতর 'রূপমণ্ডন' গ্রন্থে আছে, বটুক-ভৈরবের হাতের সংখ্যা আট ; ছ হাতে খট্বাঙ্গ, পাশ, শূল, ডমরু, কপাল ও সর্প, বাকি দু হাতের একটিতে অভয়-মুদ্রা, অন্যটিতে মাংসখণ্ড ; বটুক-ভৈরবের সঙ্গে আছে একটি কুকুর, কুকুরের রং তার প্রভুর গাত্রবর্ণের মতো। 'বটুক-ভৈরবকল্প' নামে আর-একটি গ্রন্থের বর্ণনা এ রকম : ত্রিনয়নবিশিষ্ট দেবতার রক্তবর্ণ জটা, এবং তাঁর গায়ের রঙও লাল ; তিনি সম্পূর্ণ উলঙ্গ ও প্রেত-প্রমথ-পরিবৃত, তাঁর হাতে শূল, পাশ, ডমরু ও কপাল, এবং তিনি তাঁর বাহন কুকুরের উপর আরোহণ করেন।

বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত বটুক-ভৈরবের মূর্তিগুলি চতুর্ভুজ, বেশির ভাগই স্থানক অর্থাৎ দণ্ডায়মান শ্রেণীভুক্ত। দক্ষিণ ভারতের পট্টীশ্বরমের নিদর্শনে বটুক-দেবতা নগ্ন এবং শূল, ডমরু, পাশ ও কপাল ধারণ করে আছেন; তাঁর ঠিক পিছনেই একটি কুকুর, কণ্ঠহার ও অন্যান্য অলঙ্কারে সুশোভিত। উত্তর ভারতের দৃষ্টান্তগুলিতে বটুক-ভৈরবের পায়ে 'চটি-জাতীয় জুতা দৃশ্যমান, এই বৈশিষ্ট্য দক্ষিণের বিগ্রহগুলিতে অনুপস্থিত। বেনারসে আবিষ্কৃত একটি মূর্তিতে তরুণ দেবতা নরমুণ্ডমালা ও নৃমুণ্ড-মেখলা পরিহিত, তিনি বাম দিকে অগ্রসরমান, তাঁর সহচর কুকুরটি তাঁর মূল দক্ষিণ হস্তে ধৃত কর্তিত নরমুণ্ড-লেহনে (রক্ত-লেহনে বলা বাহুল্য) নিরত; ভৈরবের বাকি তিন হাতে তরবারি বা খড়্গ, ঘণ্টা ও ত্রিশূল। অন্ধ্র প্রদেশের গুণ্টুর জেলাস্থ দুর্গিতে প্রাপ্ত দৃষ্টান্তে বটুক-ভৈরবের কুকুর-সঙ্গী প্রভুর বাম হস্তধৃত নরমুণ্ড চর্বণের চেষ্টায় রত; খড়্গ, ডমরু ও ত্রিশূল দেবতার বাকি তিন হাতের লাঞ্ছন। খাজুরাহোতে পাওয়া আসন ভঙ্গীর একটি বিশিষ্ট উদাহরণে দেবতার একটি হাতে তাঁর কুকুরের গলার শিকল, অন্য তিন হাতে গদা (এ লাঞ্ছন বিরল), ঘণ্টা ও খড়্গ।

উপরি-বর্ণিত সব ক'টি নিদর্শনেই কুকুর বটুক-ভৈরবের অপরিহার্য সঙ্গী। কুকুর কোন দেবতার বাহন বা সহচরের মর্যাদা পায় নি (অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বিশ্বাসে ও কল্পনায় যমের সহচর), একমাত্র মহাদেবের বটুক-ভৈরবের রূপভেদ ছাড়া। তথ্য হিসাবে এটি মনোযোগের যোগ্য। কিন্তু এ প্রসঙ্গে সর্বাধিক আকর্ষণীয় সংবাদ পাচ্ছি যজুঃ- ও অথর্ব- বেদ থেকে।[১] অথর্ববেদে রুদ্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে (১১. ২. ৩০) সহচর হিসাবে তাঁর বহু চওড়া চোওয়ালের কুকুরের উল্লেখ আছে; কুকুরগুলি প্রায় সময়েই এমন চিৎকার করে যে কেউ রুদ্রের কাছে যেতে সাহস পায় না। যজুর্বেদের একাধিক স্থানেও রুদ্রকে 'শ্বপতি' অর্থাৎ 'কুকুরের প্রভু' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে ('বাজসনেয়ী সংহিতা', ১৬. ২৮; 'কাঠক সংহিতা', ১৭. ১৩; 'মৈত্রায়নী সংহিতা', ২. ৯. ৫)।

বটুক-ভৈরবের বর্তমান মূর্তি-নিদর্শনগুলির কোনটিই নবম-দশম শতাব্দীর পূর্ববর্তী নয়। কিন্তু কুকুর-বাহন বটুক-ভৈরবের সঙ্গে রুদ্রের সহচর হিসাবে কুকুরের উল্লেখকে সংশ্লিষ্ট করা অসঙ্গত হবে না। রুদ্রের বেদ-

---

১ বর্তমান লেখক ১৯৬৭ সালে এ বিষয়ে সর্বপ্রথম বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর আলোচনার জন্য *Journal of the Asiatic Society*, IX, 3-4 (1967), pp. 200-201 দ্রষ্টব্য।

বর্ণিত রূপের সঙ্গে বটুক-ভৈরবের পরিচিত মূর্তিগুলির কালের ব্যবধান অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সন্দেহ নেই, কিন্তু দীর্ঘকাল বাদে আপাতবিস্মৃত বহু ঐতিহ্য-কিংবদন্তীর পুনরুত্থান অসম্ভব নয়। যজুঃ- ও অথর্ব- বেদের আলোচ্য রুদ্রের বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে কুকুর-বাহন বটুক-ভৈরবের মূর্তি তারই একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

নটরাজ: মহাদেবের দক্ষিণামূর্তির অন্যতম নটরাজ, তাণ্ডবনৃত্যের লীলামূর্তি। 'নটরাজ' নামান্তরে 'সভাপতি' নামেও পরিচিত। শিবের নটরাজ মূর্তির অধিকাংশই দক্ষিণ ভারতে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এই মূর্তির রূপ-কল্পনা দক্ষিণ ভারতের কোনও স্থানে উদ্ভূত হয়েছিল মনে করা অসঙ্গত নয়। বস্তুত, শিল্পরসিক-সমাজের প্রশংসাধন্য চারিহস্ত- বিশিষ্ট যে- নটরাজমূর্তি ভারতে সুপরিচিত তার উদ্ভব দক্ষিণ ভারতের চোল রাজাদের আমলে; চোল শিল্পশৈলীর অন্তর্গত ব্রোঞ্জনির্মিত এই মূর্তিগুলি মধ্যযুগের ভারতীয় শিল্পীদের অসাধারণ সৃষ্টিরূপে নন্দিত হয়েছে। এই রূপ-প্রমূর্তিতে শিব অপস্মার-পুরুষ (তামিল ভাষায় 'মূয়লক') নামক এই কুশ্রী বামনের উপর নর্তনশীল, তাঁর দক্ষিণ পদ অপস্মারের পৃষ্ঠদেশে প্রোথিত, বাম পদ একটু দক্ষিণ ঘেঁষে উত্থিত: তাঁর চার হাতের মধ্যে সামনের বাম হাত দোল- বা গজহস্ত- ভঙ্গীতে উত্থিত বাম পদকে নির্দেশ করে প্রলম্বিত, সম্মুখের দক্ষিণ হস্ত অভয়মুদ্রায় বিন্যস্ত, পশ্চাতের বাম হস্তে অগ্নিগোলক এবং পশ্চাতের দক্ষিণ হস্তে ডমরু (তামিল ভাষায় 'উদুক্কই'); একটি পীঠিকায় সংস্থাপিত সম্পূর্ণ মূর্তিটি অগ্নিশিখার অলঙ্করণ-সমন্বিত প্রভাবলী (তামিল ভাষায় 'তিরুবসি') দ্বারা বেষ্টিত, প্রভাবলীর প্রান্ত দু'টি পীঠিকায় এসে মিলিত হয়েছে। 'উণমইবিলক্কম্' নামে একটি মধ্যযুগীয় তামিল গ্রন্থে এই অপূর্ব মূর্তি-রূপের শিল্প ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: ডমরু থেকে সৃষ্টির শুরু, অভয়-মুদ্রায় স্থিতির ইঙ্গিত; অগ্নি-গোলক প্রলয় বা ধ্বংসের প্রতীক, উত্থিত বাম পদে মূর্তির (অন্যভাবে অনুগ্রহ বা প্রসাদের) আভাস, প্রভাবলী তাঁহার তিরোভাবের দ্যোতক; অর্থাৎ নটরাজ মূর্তির মধ্যে দেবতার পঞ্চকৃত্যের (সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, অনুগ্রহ এবং তিরোভাব) রূপ পরিস্ফুট হয়েছে।

উপরি-বর্ণিত চারিহস্ত- বিশিষ্ট নটরাজ মূর্তি ছাড়া নৃত্যপর শিবের আরও বিভিন্ন ধরনের মূর্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই সকল মূর্তিতে দেবতার হাতের সংখ্যা আট, দশ, বারো এবং ষোল; তাঁর নৃত্যভঙ্গীতেও বৈচিত্র্য বিদ্যমান। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও বিখ্যাত নটরাজ মূর্তিগুলির

মধ্যে বাদামী, এলোরা, এলিফ্যাণ্টা প্রভৃতি গুহাগুলি এবং কাঞ্চি বা কাঞ্জিবরমের মন্দিরের গাত্রে ক্ষোদিত মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বাদামী গুহার মূর্তিতে (আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দী) অতিভঙ্গ ভঙ্গীতে নৃত্যপর দেবতার হাতের সংখ্যা ষোল ; বাম হাতগুলির একটি গজহস্ত এবং দক্ষিণ হাতগুলির একটি 'চতুর' ভঙ্গীতে বিন্যস্ত। তিনি বিভিন্ন হাতে ত্রিশূল, দণ্ড, ডমরু, পরশু ইত্যাদি ধারণ করে আছেন। বামদিকে তাঁর বাহন নন্দী, দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান গণেশ ও ঢোলকবাদনরত জনৈক পুরুষ। এলোরার মূর্তিতে (আনুমানিক অষ্টম শতাব্দী) কটিসম ভঙ্গীতে নৃত্যরত শিবের হাতের সংখ্যা আট। কয়েকটি হাত ভেঙে গেছে, দক্ষিণ হাতের একটিতে ডমরু এবং একটি কটকভঙ্গীতে প্রদর্শিত, বাম হাতগুলির একটি ত্রিপতাক ভঙ্গীতে বিন্যস্ত। তাঁকে ঘিরে আছে তাঁর অনুচর ও ভক্তবৃন্দ, বিমুগ্ধভাবে তারা দেবতার নৃত্যকলা নিরীক্ষণে নিরত। বাদামী এবং এলোরার নৃত্যমূর্তিগুলিতে এবং কৈলাসনাথ মন্দিরের মূর্তিতেও শিবের পদতলে শায়িত অপস্মার-পুরুষ নেই। অপস্মার-পুরুষের সংযোজন যে পরবর্তী কালের তাতে সন্দেহের অবকাশ কম।

মূর্তিতত্ত্বের ক্ষেত্রে দেশ-কালের প্রভাব যে কত গভীর হতে পারে, বাংলাদেশে প্রাপ্ত নটরাজ মূর্তিগুলি তার বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। মধ্যযুগের বঙ্গীয় শিল্পশৈলীর অন্তর্গত এই মূর্তিগুলির অধিকাংশ পাওয়া গেছে পূর্ববঙ্গে, ঢাকা জেলার রামপাল, কুমিল্লা এবং অন্যত্র। এইরূপ দু'টি সুন্দর মূর্তির একটি রামপালের কাছে শংকরবান্ধায়, অন্যটি কুমিল্লা জেলার পালগিরিতে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই মূর্তি দু'টিতে নাগোপবীত-পরিহিত শিব তাঁর বাহন নন্দীর উপর নৃত্য করছেন, আনন্দে আত্মহারা হয়ে নন্দী তার প্রভুর দিকে তাকিয়ে আছে এবং তার সামনের ও পিছনের দু'টি পা তোলা থাকাতে মনে হচ্ছে যে, সেও যেন প্রভুর নৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিতে ব্যগ্র ; নৃত্যশীল শিবের দশ হাতে ত্রিশূল, দণ্ড, গদা, ঢাল, পাশ ইত্যাদি নানাবিধ আয়ুধ, তাঁর দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে তাঁর শক্তি পার্বতী ও গঙ্গা স্ব স্ব বাহন মকরের উপর দণ্ডায়মানা, মূর্তির প্রভাবলী ও পীঠিকায় উৎকীর্ণ নাগ-সিংহ ও গণাদি দেবতাকল্পগণ মুগ্ধভাবে নটরাজ শিবের নৃত্যকৌশল নিরীক্ষণ করছেন। ত্রিপুরার ভারেল্লা গ্রামে (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভূত) প্রাপ্ত অনুরূপ একটি মূর্তির হাতের সংখ্যা বারো এবং এর পাদপীঠে উৎকীর্ণ লেখতে 'নর্তেশ্বর' রূপে মূর্তিটির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে আবিষ্কৃত মূর্তিও শংকরবান্ধার নিদর্শনের

মতো দশ হাত-বিশিষ্ট। অপস্মার-পুরুষের পরিবর্তে বৃষের উপর নৃত্যপর শিবের রূপ-কল্পনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের নটরাজ মূর্তিগুলির সঙ্গে মৎস্য-পুরাণে (২৫৯ অধ্যায়) বর্ণিত নটরাজ মূর্তির সৌসাদৃশ্য বর্তমান।

সংক্ষেপে, শিব-নটরাজ মূর্তির রূপ-কল্পনায় ভারতীয় শিল্পিগণ বিশ্ব-সৃষ্টির মূল তত্ত্বকে আশ্চর্যসুন্দর রূপ দিয়েছেন এবং বিজ্ঞান, ধর্ম ও শিল্পের অন্তর্নিহিত সত্যকে সমন্বিত করেছেন।

মাতৃকা

ইন্দ্রাণী : কিংবদন্তী অনুসারে অন্ধকাসুর বধের সময় মহাদেবের সাহায্যার্থে বৈষ্ণবী, কৌমারী প্রমুখ অন্যান্য মাতৃকাদের সঙ্গে ইন্দ্রাণীও সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এঁরা যথাক্রমে বিষ্ণু, কুমার, ইন্দ্র প্রমুখের শক্তি। পুরাণ ও আগমাদি গ্রন্থোক্ত মাতৃকাসমূহের সংখ্যা সাধারণত সাত (এখানে দুজনের কথা বলা হলো)। ঐন্দ্রী বা শচী নামেও পরিচিত ইন্দ্রাণী দেবরাজ ইন্দ্রের শক্তি বা ভার্যা। 'পূর্বকারণাগমে' ইন্দ্রাণী দ্বিনয়নবিশিষ্ট রূপে বর্ণিত হলেও 'অংশুমদ্‌ভেদাগমে'র বর্ণনায় দেবী ত্রিনেত্রা (তাঁর পতি ত্রিনয়ন-যুক্ত)। 'অংশুমদ্‌ভেদাগম'-বর্ণিত ইন্দ্রাণীর অন্যান্য রূপবৈশিষ্ট্য এ রকম : তিনি রক্তবর্ণ, কিরীটিনী, সর্বাভরণ-সংযুক্তা, চতুর্হস্তা, বজ্র ও শক্তি তাঁর আয়ুধ এবং বরদ ও অভয় তাঁর দুই মুদ্রা ; তাঁর পতির মতো তাঁরও বাহন ঐরাবত নামীয় গজ এবং তাঁর ধ্বজেও গজ-প্রতীক অঙ্কিত। 'বিষ্ণুধর্মোত্তর'কার ঐন্দ্রীকে ষড়্‌ভুজা ও সহস্রাক্ষী (গৌতম মুনির অভিশাপে শচীপতির সহস্রাক্ষ হওয়ার কাহিনী স্মরণীয় ; 'হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে'র ভাষায় 'বহু-লোচনা') বলে বর্ণনা করলেও এরকম কোন প্রতিমা অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি। 'দেবীপুরাণে'র বর্ণনানুসারে মাতৃকারূপে ইন্দ্রাণী পূর্বোক্ত বৈষ্ণবী, কৌমারী প্রমুখের সঙ্গে চিত্রিত হন এবং এ ধরনের গোষ্ঠীবদ্ধ মাতৃকা-মূর্তির দু পাশে গণেশ ও বীরভদ্রের বিগ্রহ ক্ষোদিত হয়। মাতৃকাদের সমবেত রূপায়ণের অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন ভুবনেশ্বরস্থিত পরশুরামেশ্বর মন্দির (সপ্তম শতাব্দী) থেকে পাওয়া গেছে। এই ভাস্কর্যে ইন্দ্রাণী উপবিষ্টা, তাঁর বাম হাতে বজ্র ও ডান হাতে পাত্র ; এবং পাদপীঠে ঐরাবত (অন্যত্র তিনি দু হাতে বজ্র ও অঙ্কুশ ধারণ করেন)। অন্যান্য মাতৃকাদের সঙ্গে একত্রে রূপায়িত হলেও বিভিন্ন সংগ্রহশালায় ইন্দ্রাণীর স্বতন্ত্র মূর্তিরও সাক্ষাৎ মেলে। উদয়পুর মিউজিয়ামে সংরক্ষিত এ রকম একটি

ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের নিদর্শনে ইন্দ্রাণীর বাম কোলে শিশু (এই শিশু ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী প্রমুখ দেবীদের 'মাতৃকা'- রূপ-কল্পনার পরিচায়ক), তাঁর দক্ষিণ হস্তে বজ্র এবং শিরোদেশে জ্যোতিশ্চক্র ; মূর্তিটি স্থানক শ্রেণীর। বেনারসের ভারত কলাভবনের সংগ্রহভুক্ত একটি প্রতিমাতে দেবী পর্যঙ্কাসনে উপবিষ্টা, তাঁর বাম হাতে বজ্র ও ডান হাতে মাতুলুঙ্গ (এক জাতীয় ফল) ; ইন্দ্রের মতো তাঁরও ললাটমধ্যে তৃতীয় নয়ন, কিন্তু এই নিদর্শনে তাঁর কণ্ঠহারের ও স্তনযুগলের উপরে নিচে দুই সারি চোখ খোদাই করিয়ে ভক্ত তাঁর আরাধ্য দেবীকে বিরল বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছেন ; বলা বাহুল্য, দেবীর গাত্রে সংযোজিত এই অতিরিক্ত নেত্রাবলি তাঁর পতি সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের স্মারক এবং এই রূপ-বৈশিষ্ট্যে বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের সহস্রাক্ষী দেবীর বর্ণনা অনুসরণের প্রয়াস স্পষ্ট ; প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অদ্যাবধি এই ধরনের দ্বিতীয় কোন মূর্তি আবিষ্কৃত হয় নি। আর-একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য, ইন্দ্রাণী 'মাতৃকা' রূপে খ্যাত হলেও পূর্ব দিকের অধিপতি দেবতা ইন্দ্রের পত্নী হিসাবেও যে তিনি পরিচিত ছিলেন ভুবনেশ্বরের চিত্রেশ্বর, সারি, অনন্ত-বাসুদেব প্রভৃতি মন্দিরের দেওয়ালে উৎকীর্ণ পতির সঙ্গে তাঁর উপস্থিতিতে তা সপ্রমাণ।

চামুণ্ডা : চামুণ্ডা বা চামুণ্ডী মাতৃকাগণের অন্যতম অথবা সামান্যত গণবোধক। চামুণ্ডাসহ মাতৃকাগণের সংখ্যা সাধারণত সাত হলেও কোনও কোনও পুরাণে আট ও নয় বলে উল্লিখিত হয়েছে। চামুণ্ডা ছাড়া অন্যান্য মাতৃকারা হলেন ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী এবং ইন্দ্রাণী। 'মার্কেণ্ডেয়পুরাণে' (৮৮ অধ্যায়) শিবদূতী এবং নারসিংহী নামে আরও দু'জন মাতৃকার নাম পাওয়া যায়। 'অগ্নিপুরাণে' (১৪৬ অধ্যায়) চামুণ্ডা ছাড়া মাতৃকাদের প্রত্যেকের নামের সঙ্গে আবার 'চামুণ্ডা' যুক্ত দেখা যায় ; যেমন, চামুণ্ডা-মাহেশ্বরী, এবং শেষ দু'জনের নাম চামুণ্ডা-চণ্ডী এবং চামুণ্ডা-ঈশানী। সুতরাং অগ্নিপুরাণে মাতৃকাদের সংখ্যা আট।

যদিও চামুণ্ডাকে কখনও কখনও যামী (যমের শক্তি) বলে মনে করা হয়, তথাপি ব্রহ্মাণী প্রমুখ মাতৃকা যেমন ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদের শক্তি, সে রকম চামুণ্ডা শিবের ঘোর রূপ ভৈরবের শক্তি বলে কল্পিত হন। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, 'বাজসনেয়ী সংহিতা' (৫. ১১)-য় বর্ণিত মনোজবাকে ('মনোজবস') যমের অন্যতম শক্তি বলে ধরলে 'মুণ্ডকোপনিষদে' (১. ২. ৪) উল্লিখিত মনোজবাকে যমের পত্নী বলে গ্রহণ করতে অসুবিধা হয় না।

ভারতে শক্তিপূজার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে আজ আর সংশয়ের অবকাশ নেই এবং সেই হিসাবে চামুণ্ডা বা তাঁর কোনও আদিরূপের কল্পনাও

বেশ প্রাচীন বলে মনে হয়, বিশেষত রূপ-চিন্তার দিক থেকে পূর্বোক্ত মনোজবাকে চামুণ্ডার সঙ্গে অভিন্ন ধরলে দেবীর প্রাচীনত্ব খ্রীস্টজন্মের পূর্ব পর্যন্ত টানা যেতে পারে। মার্কণ্ডেয়পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য অংশ, অন্যান্য পুরাণ ও উপপুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত দেবী মাতৃশক্তিরই সর্বোচ্চ রূপ। তাঁর বিভিন্ন রূপ-সংক্রান্ত বিবরণ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যের আলোকে মনে হয়, চামুণ্ডা এবং দেবীর বিভিন্ন রূপের অনেকাংশ অনার্যদের কাছ থেকে গৃহীত হয়েছিল। চামুণ্ডা বা তাঁর আদিরূপ অনার্যদের কৃষির সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে অনুমান করা যায়, কারণ 'পুরশ্চর্যার্ণবে'র তৃতীয় খণ্ডে ব্রহ্মাণী, কালিকা, চামুণ্ডা ইত্যাদিকে বিভিন্ন ফল-শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। চামুণ্ডা সেখানে মানকচুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'পুরশ্চর্যার্ণব' গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের হলেও চামুণ্ডাদি দেবীর সঙ্গে বিভিন্ন ফল-শস্যের সম্পর্কিত তথ্য প্রাচীন অনার্যসমাজে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের অবশিষ্টাংশ বলে মনে করা অসঙ্গত নয়।

চামুণ্ডাদেবী পুরাণ ও আগমাদি গ্রন্থের সর্বত্রই ভীষণদর্শনারূপে চিত্রিত আছেন। 'পূর্বকারণাগমে'র বর্ণনায় চামুণ্ডা দীর্ঘজিহ্ব, উর্ধ্বকেশা, নির্মাংসা, ব্যাবৃতমুখী, শবারূঢ়া এবং মাংসপূর্ণ কপাল, সর্প ও অগ্নি ধারণ করেন। 'হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে'র মতে, দেবী কপাল, পট্টিশ, শূল ও কর্ত্রিধারিণী। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত চামুণ্ডার প্রতিমাগুলিও তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভীষণদর্শনা। ওড়িশার যাজপুরে (প্রাচীন বিরজাক্ষেত্র) আবিষ্কৃত এইরূপ একটি মূর্তিতে দেবী শবাসীনা ; তাঁর চার হাতে কর্ত্রি, শূল, কপাল ও নরমুণ্ড ; তিনি অস্থিচর্মসারা, কৃশোদরী, শিথিলস্তনী এবং কোটরাক্ষী। চামুণ্ডার আর-একটি সুপরিচিত মূর্তি ভুবনেশ্বরের বৈতাল দেউলের গর্ভগৃহে বর্তমান। ইনিও শবাসনা ও কৃশোদরী। এই দেবীমূর্তির দুই পাশের প্রাচীর গাত্রে অন্যান্য মাতৃকাগণের এবং বীরভদ্র ও গণেশাদির মূর্তিও ক্ষোদিত দেখতে পাওয়া যায়। যাজপুরে আর-একটি ভয়াবহ মূর্তি পাওয়া গেছে। তবে এই মূর্তিতে দেবীর কান দু'টি অতিশয় দীর্ঘ এবং তিনি উবু হয়ে বসে আছেন। তাঁর মুখের অস্বাভাবিক নিষ্ঠুর হাসিটিও লক্ষণীয়। মূর্তিতত্ত্বের বিচারে এই মূর্তিতে চামুণ্ডার দন্তুরা নামক একটি বিভেদ রূপায়িত হয়েছে।

দেব-দেবীদের ব্যাপারে হিন্দু, জৈন এবং বৌদ্ধদের পারস্পরিক আদান-প্রদান সুপরিচিত ঘটনা। বৌদ্ধ 'নিষ্পন্নযোগাবলী'তে বিভিন্ন দেব-দেবীর মধ্যে চামুণ্ডার উল্লেখ পাওয়া যায়। অধ্যাপক ক্লার্ক চীনের পিপিঙ শহরে

প্রাপ্ত কপালধারিণী একটি মূর্তিকে চামুণ্ডা বলে বর্ণনা করেছেন। ভারতে আবিষ্কৃত দেবী-মূর্তিগুলি ছাড়া সাহিত্যগত সাক্ষ্যের দ্বারাও চামুণ্ডা-পূজার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়; ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটকে করালা-চামুণ্ডার মন্দিরের উল্লেখ আছে। দেবীর চামুণ্ডাদি ঘোর মূর্তিগুলি স্বভাবত তান্ত্রিক সাধকদের মধ্যেই অধিকতর প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে চামুণ্ডাদেবীর পূজা এখনও প্রচলিত। মহীশূর শহরের নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের শীর্ষে চামুণ্ডাদেবীর মন্দির আছে এবং হায়দার আলীর রাজত্বের প্রাক্কালেও ঐ মন্দিরে নরবলি হতো। বাংলাদেশে বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর-এর চামুণ্ডা পূজা সুপ্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর বৈশাখী শুক্লাষ্টমীতে অনুষ্ঠিত এই সর্বজনীন পূজায় ধীবর ও ব্যগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিই প্রধান উদ্যোক্তা। এই উপলক্ষে ব্যাপক ও নির্বিচার বলিদান প্রচলিত আছে।

সংক্ষেপে, চামুণ্ডার সামগ্রিক রূপ-কল্পনা ও সংশ্লিষ্ট কাহিনী-কিংবদন্তী ও পূজা-পদ্ধতি বিচার করলে সন্দেহ থাকে না যে, আদিপর্বে চামুণ্ডা ছিলেন অনার্যদের আরাধ্য দেবতা। কালক্রমে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সূত্রে তিনি ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দেবতামণ্ডলীর মধ্যে পরিবর্তিত আকারে স্থান লাভ করেন।

গণেশ

আনুমানিক খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে শিব ও পার্বতীর পুত্র গণপতি বা গণেশের একান্তিকী পূজার প্রচলন হয়, কিন্তু গণেশ-গণপতির একভক্ত সম্প্রদায় বা গাণপত্যগণ আরও দু-এক শতাব্দী পরে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন বলে অনুমান। গাণপত্যগণ কালক্রমে ছ'টি শাখায় বিভক্ত হন এবং তাঁরা মহা, হরিদ্রা, উচ্ছিষ্ট, নবনীত, স্বর্ণ ও সন্তান নামীয় ছ'টি গণপতি-রূপের উপাসনা করতে থাকেন। গাণপত্যদের প্রতিষ্ঠা অধুনা বিলুপ্ত হলেও গণপতি আজও হিন্দুদের প্রিয় দেবতা। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গণেশ-গণপতির মন্দিরগুলির মধ্যে পুণার কাছে অবস্থিত ছিঞ্চবাড়ের দেবায়তনটি সুপ্রসিদ্ধ। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের কপিলাশ রোড স্টেশনের অদূরবর্তী 'গণেশ-ক্ষেত্র' নামে পরিচিত মহাবিনায়ক পর্বত হিন্দুদের অন্যতম তীর্থ।

তন্ত্র-পুরাণাদি শাস্ত্রে গণপতির বর্ণনা এরূপ: এই দেবতা খর্বাকৃতি,

স্থূলদেহী, হস্তিবদন,[১] লম্বোদর, সিদ্ধিদাতা এবং সিন্দুরবর্ণাভ। গণেশের রূপ-কল্পনার উৎস-সন্ধান দুরূহ হলেও এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, ইতিহাসের কোনও এক পর্বে আদিম জাতিদের পূজিত হস্তিদেবতা বিবর্তনের সূত্রে মানবরূপের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে কালক্রমে গজমুণ্ডবিশিষ্ট মানবাকৃতি দেবতায় পরিণতি লাভ করেছেন। গণেশের হস্তিমুণ্ড যেমন হস্তি-দেবতার স্মারক, 'তুন্দিল' বা লম্বোদর তেমনই প্রাচীন যক্ষ-দেবতার রূপ-বৈশিষ্ট্যকে মনে করিয়ে দেয়। 'নিদ্দেস' নামীয় প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত হস্তি- ও যক্ষ- দেবতার উপাসনার কথা এ সূত্রে স্মরণীয়। গণেশের বাহন মূষিক। একেও কোনও আদিম জাতির 'টোটেম' বলে মনে হয়।

সিংহলের মিহিনটাল অঞ্চলের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত একটি শিলাফলকে উৎকীর্ণ গুঁড়িমারা অবস্থায় প্রদর্শিত গজমুণ্ড- ও- দন্ত- বিশিষ্ট মূর্তিটিই গণেশ-গণপতির প্রোটোটাইপ বা আদি-রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে পরিগণিত হয়। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে হয়ত বা খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতকে এর রচনা হয়েছিল। উত্তর প্রদেশের ফর্‌রুখাবাদ জেলায় প্রাপ্ত আনুমানিক চতুর্থ শতকের একটি প্রস্তর-মূর্তিতে দ্বিভুজ গজানন দেবতা বাম হাতে সম্ভবত মোদকভাণ্ড ধারণ করে শুণ্ড দ্বারা মোদক আস্বাদনে ব্যাপৃত, তাঁর ডান হাত দন্ত স্পর্শ করে আছে বলে মনে হয়। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকের উদয়গিরির (মধ্যপ্রদেশ) গুহাগাত্রে এবং ভূমারা (মধ্যপ্রদেশ) ও ভিতরগাঁওর (উত্তর প্রদেশ) মন্দির দু'টি থেকে পাওয়া ফলকে যে- গণেশমূর্তির সাক্ষাৎ মেলে তাতেও দেবতা শুণ্ডের দ্বারা মোদকাস্বাদনে নিরত। উদয়গিরির মূর্তিটিতে সমাসীন গণপতিকে ঊর্ধ্বলিঙ্গ বলে মনে হয়।

গণেশ-গণপতির মূর্তিগুলি তিন শ্রেণীতে বিভাজ্য : 'স্থানক' (দাঁড়ানো), 'আসন' (বসা) এবং 'নৃত্যরত'। গণেশের হস্তসংখ্যা সাধারণত চার, তবে ছয়- , আট- , কিংবা দশ- হস্তযুক্ত গণেশমূর্তিও বিরল নয়। দ্বিভুজ গণেশমূর্তি অপেক্ষাকৃত কম, পূর্বোক্ত ফর্‌রুখাবাদের ও উদয়গিরির মূর্তি দু'টি বা মিসনে (আনাম) আবিষ্কৃত মূর্তিটি দেবতার দ্বিভুজ রূপের উদাহরণ। মিসনের মূর্তিতে দণ্ডায়মান দেবতা মোদকাস্বাদনরত, দেখে মনে হয় এক-জন সুখী সচ্ছল ভদ্রলোক। গণেশের হাতে মোদকভাণ্ড, পরশু, অক্ষমালা, মূলক, দন্ত, অঙ্কুশ, পাশ, দণ্ড, শূল, সর্প, ধনুঃ, শর ইত্যাদি দেখা যায়। তবে মোদকভাণ্ড, পরশু, অক্ষমালা, মূলক ও দন্তই তাঁর প্রধান লাঞ্ছন।

১. গণেশের গজমুণ্ড সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন কাহিনীর জন্য 'বরাহপুরাণ' (২৩ অধ্যায়), 'শিবপুরাণ' (১৩–১৮ অধ্যায়) এবং 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' (গণপতিখণ্ড) দ্রষ্টব্য।

গণেশের স্থানক ও আসন মূর্তির সংখ্যা প্রচুর। স্থানক মূর্তির তুলনায় আসন মূর্তির সংখ্যা অধিকতর। জাভার বারা নামক স্থানে আবিষ্কৃত একটি আসনমূর্তিতে দেবতাকে নরকপালযুক্ত আসনের উপর সমাসীন দেখা যায়, তাঁর জটামুকুটেও নরকপাল- লাঞ্ছন। আনুমানিক একাদশ শতকের এই মূর্তিতে তান্ত্রিকতার প্রভাব স্পষ্ট, যদিও দেবতার শক্তি এখানে অনুপস্থিত। নৃত্যমূর্তিগুলিতে গণেশ তাঁর বাহনের উপর নর্তনশীল। উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত এ ধরনের একটি নৃত্যমূর্তির প্রভাবলীর উপরদিকের কেন্দ্রস্থলে সপল্লব আম্রগুচ্ছ দেখা যায়। আম্রের মতো উৎকৃষ্ট ফল সিদ্ধির দেবতা তাঁর ভক্তকে দিয়ে থাকেন, এটাই বোধ হয় আম্রগুচ্ছ রূপায়ণের তাৎপর্য। তাঞ্জোরের একটি চোলযুগীয় লেখে গণেশের সঙ্গে বৃক্ষের সম্পর্কের উল্লেখও এ সূত্রে উল্লেখযোগ্য। স্থানক আসনাদি স্বতন্ত্র মূর্তি ছাড়া সপ্তমাতৃকার ফলকে সর্ববামে গণেশ চিত্রিত হন।

শক্তিপূজা ও তান্ত্রিকতার প্রাধান্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গণেশকে শক্তির সঙ্গে উপস্থাপিত করার প্রবণতা দেখা যায়। এ ধরনের শক্তিসহ গণেশের মূর্তি শক্তিগণেশ, লক্ষ্মীগণেশ (এ লক্ষ্মী 'শ্রী-লক্ষ্মী' নন), উচ্ছিষ্ট-গণেশ ইত্যাদি বিভিন্ন অভিধায় পরিচিত। এদের মধ্যে উচ্ছিষ্ট-গণেশের রূপটি আদিরসাশ্রিত।[১] দক্ষিণ ভারত থেকে কিছু উচ্ছিষ্ট-গণেশের মূর্তি পাওয়া গেছে। জব্বলপুরের কাছে ভেরাঘাটে আবিষ্কৃত গজমুণ্ডবিশিষ্ট একটি নারীমূর্তিকে গণেশদেবতার স্ত্রীরূপ বা গণেশানী বলে মনে করা হয়।

গণেশের বিভিন্ন মূর্তির মধ্যে বিশিষ্ট একটির নাম হেরম্ব-গণপতি। হেরম্বমূর্তিতে দেবতার বাহন সিংহ হলেও নেপালের অনুরূপ কিছু দৃষ্টান্তে মূষিক দেখা যায়। হেরম্ব-গণপতি পঞ্চমুখ-বিশিষ্ট, চারটি মুখ এক এক করে পূর্ব-পশ্চিমাদি চতুর্দিকের অভিমুখী, পঞ্চমটি আকাশ-মুখীভাবে মুখচতুষ্টয়ের উপর সংস্থাপিত। ঢাকা জেলার রামপালে আবিষ্কৃত হেরম্ব-গণপতি মূর্তিটির প্রভাবলীর উপরে ছ'টি ক্ষুদ্রাকৃতি গণেশ মূর্তির উপস্থিতি সবিশেষ লক্ষণীয়। এই ছোট মূর্তিগুলি গাণপত্যসম্প্রদায়ের ছ'টি শাখার আরাধ্য মহা, হরিদ্রা, উচ্ছিষ্ট, নবনীত প্রভৃতি ষড়্‌বিধ গণপতি-মূর্তির প্রতীক বলে মনে করা হয়।

১ এটি গণপতির পূজা ও রূপ-কল্পনায় তান্ত্রিক প্রভাবের সংক্রামের উদাহরণ। বিভিন্ন পুরাণে ও তন্ত্রগ্রন্থে মহাগণপতি, শক্তিগণপতি, বিঘ্নগণপতি প্রভৃতি এ ধরনের আরও একাধিক রূপ-প্রমূর্তির পরিচয় আছে।

তিলক-চিহ্ন, হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রতীক

হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্তগণ কর্তৃক ললাটাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অঙ্কিত চিহ্নই তিলক-চিহ্ন নামে পরিচিত। সাম্প্রদায়িক নিয়ম অনুসারে চন্দন, খড়ি-জাতীয় জিনিসের গুঁড়া, ভস্ম প্রভৃতির সাহায্যে তিলক অঙ্কিত হয়। অনেক সময়ে একটি কাষ্ঠময় বা ধাতুময় মুদ্রা এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের সাম্প্রদায়িক চিহ্নধারণ প্রথার উৎপত্তি ও প্রাচীনত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। তবে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে ললাটে হোমভস্মের টীকা অঙ্কনের প্রথার সঙ্গে এর দূরায়ত যোগ আছে বলে মনে হয়। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের স্ব স্ব তিলক-চিহ্ন বিদ্যমান থাকলেও বৈষ্ণবদের মধ্যেই তিলক-চিহ্নের বৈচিত্র্য ও সংখ্যাধিক্য চোখে পড়ে এবং প্রত্যহ স্নানান্তে তিলক গ্রহণকে বৈষ্ণব ভক্ত মুখ্য সাধনরূপে গণ্য করেন। সাধারণভাবে নিষ্ঠাবান হিন্দুমাত্রই নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এ ত্রিবিধ কর্ম এবং পৈত্র্যাদিকর্ম অনুষ্ঠানের পূর্বে তিলকসেবা করে থাকেন।

খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে বাণভট্টের 'কাদম্বরী' গ্রন্থে তপস্বী দৃঢ়দস্যু এবং জাবালি ঋষির বর্ণনা প্রসঙ্গে ললাটে ভস্মের সাহায্যে ত্রিপুণ্ড্র অঙ্কনের প্রথার কথা জানা যায়। এই ত্রিপুণ্ড্র যে পরবর্তী কালের শৈব উপাসকদের তিনটি সমান্তরাল রেখার সমাহারে গঠিত তিলক-চিহ্নবিশেষ তাতে সন্দেহ নেই। সপ্তম শতকের পূর্বে সাম্প্রদায়িক ভক্তদের মধ্যে তিলক-চিহ্ন ধারণের প্রথা প্রবর্তিত হওয়াই স্বাভাবিক। তবে ঠিক কবে এবং কিভাবে এর উদ্ভব হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

সাম্প্রদায়িক তিলক-চিহ্নগুলির উৎস-সন্ধানের সূত্রে বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতাদের মূর্তিতে পরিদৃষ্ট লাঞ্ছনগুলির অধ্যয়ন অপরিহার্য। বৈষ্ণব শৈবাদি উপাসকগণের তিলকগুলির সঙ্গে তাঁদের স্ব স্ব ইষ্টদেবতার বিগ্রহ-ধৃত কিছু কিছু চিহ্ন-লাঞ্ছনের সৌসাদৃশ্য মনোযোগ আকর্ষণের যোগ্য। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, বর্তমান কালে দক্ষিণ ভারতের বিষ্ণু- মূর্তিগুলির ললাটে তিনটি ঊর্ধ্বাধঃ রেখার সমাবেশে অঙ্কিত তিরুনামম্ বা শ্রীনামম্ নামে যে-চিহ্ন দেখা যায়, তা শ্রী-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত তিলক-চিহ্নগুলির অন্যতম। শৈব ভক্তদের ললাটশোভন ত্রিপুণ্ড্র শিবলিঙ্গের পূজা বা রুদ্রভাগে অঙ্কিত চিহ্নের অনুরূপ। দেবীমূর্তির ললাট-মধ্যস্থ ত্রিনয়নের নিচে যে

রক্তবর্ণ বিন্দুচিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, তা শক্তিসাধকেরও অন্যতম লাঞ্ছন। অর্থাৎ হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তিতে অঙ্কিত অধিকাংশ চিহ্নই যে সাম্প্রদায়িক তিলক-চিহ্নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। তবে তিলক-চিহ্ন রঙের মতো অস্থায়ী জিনিসে অঙ্কিত হয় বলে অনুরূপ লাঞ্ছনযুক্ত প্রাচীন দেবতা-মূর্তি পাওয়া যায় না। বস্তুত তিলক-প্রতিম চিহ্নযুক্ত মূর্তিগুলি সবই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। অধ্যাপক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী প্রখ্যাত চোল সম্রাট রাজরাজের (৯৮৫-১০১৪) সমকালীন একটি লিপির সাক্ষ্যে বলেছেন, দশম-একাদশ শতাব্দীতেও বিষ্ণুমূর্তির ললাটে স্বর্ণনির্মিত শ্রীনামম্ উৎকীর্ণ করার প্রথা বর্তমান ছিল। সুতরাং এটা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, ঐ সময়ে ইষ্টদেবতার চিহ্নের অনুসরণে বিষ্ণুর ভক্তগণের একাংশ অন্তত তাঁদের ললাটে শ্রীনামম্ চিহ্ন অঙ্কিত করতেন।

বস্তুত খ্রীস্টীয় দশম-একাদশ শতকের মধ্যে রচিত পদ্ম, ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, দেবীভাগবত প্রভৃতি কিছু পুরাণ ও উপপুরাণ গ্রন্থের সাক্ষ্যেও এ কথা মনে হয় যে ঐ সময় থেকে শৈবাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে তিলক-চিহ্ন ধারণের প্রথা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এসব গ্রন্থের অন্তর্গত তিলক ধারণের নিয়মাবলি পরবর্তী কালের রচনায় পূর্ণত অথবা অংশত উদ্ধৃত হয়েছে। দশম ও একাদশ শতকের চর্যাগীতি-কোষের লুইপাদ রচিত একটি চর্যায় ব্যবহৃত 'বাণচিহ্ন' শব্দবন্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, এই 'বাণচিহ্ন' সাম্প্রদায়িক তিলক-চিহ্নেরই ভাষান্তর। অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[১] তাঁর মত গ্রহণান্তে অনুমান করেন, দক্ষিণ ভারতে যেমন তিলকাদি চিহ্ন তিরুনামম্ বলে বর্ণিত হতো, উত্তর ভারতে বোধ হয় মধ্যযুগে ও পরে এগুলির আখ্যা ছিল বাণচিহ্ন (বর্ণচিহ্ন)। সংক্ষেপে, লেখ ও সাহিত্যের মিলিত সাক্ষ্যে এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, খ্রীস্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীর পর থেকে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ভক্তগণের মধ্যে তিলক-চিহ্ন ধারণের প্রথার ক্রমপ্রচলন হয়। এবং আমাদের একটি বিশেষ অনুমান, শৈব তপস্বী ও উপাসকদের ত্রিপুণ্ড্র ধারণের প্রথা থেকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভক্তগণ ললাটাদি অঙ্গে তিলক-চিহ্ন ধারণের প্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করে।

মোটামুটিভাবে দশম থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত সময়-

১ পঞ্চোপাসনা, পৃ. ৩৫১।

পরিসরকে সাম্প্রদায়িক তিলক-চিহ্নগুলির রূপবিবর্তন-কাল বলে গণ্য করা যেতে পারে। প্রাচীন চিহ্নগুলির বিবর্তনের সঙ্গে কয়েকটি নূতন তিলক চিহ্নও এই সময়-সীমায় দেখা দিয়েছিল এবং সন্দেহ নেই বৈষ্ণব শৈবাদি সম্প্রদায়ের বিভাজনের সঙ্গে তিলক-চিহ্নগুলির বৈচিত্র্য বৃদ্ধি এবং ক্ষেত্রবিশেষে চিহ্ন-লাঞ্ছনের উদ্ভব-ক্রিয়া বিজড়িত। বর্তমানে বৈষ্ণব, শৈব সৌর, শাক্ত ও গাণপত্য এ পাঁচটি সম্প্রদায় ও তাদের বিভিন্ন উপ-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ভক্তগণ স্ব স্ব তিলক চিহ্নাদি ধারণ করেন।

পুরাণ- ও তন্ত্র- সাহিত্যে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক তিলকের বিস্তৃত বর্ণনা ও তাদের ধারণ সংক্রান্ত নিয়মাবলির সাক্ষাৎ মেলে। এসব গ্রন্থ বর্ণিত তিলকগুলির কয়েকটির সঙ্গে অধুনাপ্রচলিত তিলক-চিহ্নের সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। বাস্তব নিদর্শন ও সাহিত্য-সাক্ষ্যে দেখা যায়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় বৈষ্ণবরাই তিলকসেবার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তাঁদের তিলক-চিহ্ন ও সংখ্যা বৈচিত্র্য-বিচারে বিশেষ আকর্ষণীয়। স্নানের পর বিষ্ণুর দ্বাদশ নামোচ্চারণের সঙ্গে দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ প্রত্যেক বৈষ্ণবের কর্তব্য বলে মনে করা হয়। এই দ্বাদশ নাম ও দ্বাদশ অঙ্গ : ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষে মাধব, কণ্ঠে গোবিন্দ, দক্ষিণ পার্শ্বে বিষ্ণু, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদন, দক্ষিণ স্কন্ধে ত্রিবিক্রম, বাম পার্শ্বে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, বাম স্কন্ধে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ এবং কটিতে দামোদর ('পদ্মপুরাণ', উত্তরখণ্ড)।

পূর্বোক্ত পদ্মপুরাণে প্রথমে ললাটে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ ও পরে ললাটাদি-ক্রমে তিলক গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পুরাণে ঊর্ধ্বপুণ্ড্রের বর্ণনা এ রকম : একান্তধর্মাবলম্বী অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ অন্তরালসহ হরিপদাকৃতি পুণ্ড্র অঙ্কন করে থাকেন। নাসিকামূল থেকে আরম্ভ করে ললাটদেশের সেই শেষ সীমা পর্যন্ত মৃত্তিকা (গঙ্গা-মৃত্তিকা) দ্বারা অঙ্কন করতে হবে। 'হরিমন্দির' নামে খ্যাত ঊর্ধ্বাধঃ রেখার মধ্যে ব্যবধান রাখবার জন্যে পুরাণকার বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। তবে বর্তমানে শ্রীবৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ের ভক্তদের মধ্যে যেসব তিলক দেখা যায়, সেগুলি পদ্মপুরাণ-বর্ণিত ঊর্ধ্বপুণ্ড্র জাতীয় হলেও পুরাণোক্ত বর্ণনার সঙ্গে অনেকাংশে মেলে না। বৈষ্ণবদের বিভিন্ন উপবিভাগভুক্ত ভক্তদের তিলক-চিহ্নের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বড়কলইপন্থী শ্রী-বৈষ্ণবদের তিলক ইংরেজী V অক্ষরের অনুরূপ ; শ্বেত বর্ণের এই তিলকের মধ্যবর্তী রেখার ঊর্ধ্বাংশটি সিন্দূর-চর্চিত। বল্লভাচারী বৈষ্ণবগণের একাংশ ইংরেজী U অক্ষরের আকার-

সদৃশ তিলক-চিহ্ন ধারণ করেন ; এ চিহ্ন ললাটের নিম্নভাগ থেকে কেশ-রেখার উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয়দের চিহ্নের সঙ্গে মাধ্ব–সম্প্রদায়ভুক্ত বিষ্ণুভক্তদের তিলক-চিহ্নের প্রভেদ লক্ষ করা যায়। দৃষ্টান্ত না বাড়িয়ে এটুকু বলা চলে, বৈষ্ণবদের বিভিন্ন শাখান্তর্গত ভক্তগণ একরেখ বা অধিকরেখ নানা ধরনের উর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করে থাকেন। উর্ধ্বপুণ্ড্র ছাড়া তাঁরা অন্যান্য অঙ্গে শঙ্খ-চক্র-গদাদির চিহ্নও অঙ্কন করেন।

শৈবগণ ললাটদেশে যে-চিহ্ন অঙ্কন করেন, তার নাম ত্রিপুণ্ড্র। সাধারণত এ তিনটি সমান্তরাল রেখার সাহায্যে রচিত হয়। তবে কোনও কোনও গ্রন্থে এটি ঈষৎ বক্র ও খণ্ডচন্দ্রের আকারসদৃশ বলে বর্ণিত হয়েছে এবং বাস্তবেও এরূপ ত্রিপুণ্ড্রের সাক্ষাৎ মেলে। একাধিক গ্রন্থে ত্রিপুণ্ড্রধারণ শিবোপাসকদের অবশ্যকরণীয় বলে উল্লিখিত হয়েছে এবং 'কঙ্কালমালিনী' নামে একটি তন্ত্রগ্রন্থে আছে, ত্রিপুণ্ড্রধারণে গঙ্গাদি পবিত্র নদীতে স্নানের এবং শ্রীবিষ্ণুর ও শিবের কোটি মন্ত্রজপের পুণ্য অর্জিত হয়। 'কঙ্কালমালিনী', 'শাশ্বততন্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে শৈব ছাড়া বৈষ্ণবাদি অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদেরও ত্রিপুণ্ড্রধারণ করতে বলা হয়েছে। শৈব তিলক-চিহ্নের অন্যান্য রূপভেদের মধ্যে ত্রিপুণ্ড্র, অর্ধচন্দ্র ও বিন্দুর সমন্বয়ে গঠিত চিহ্ন, অর্ধচন্দ্র ও বিন্দুর সমাহারে রচিত চিহ্ন, বিল্বপত্রাকৃতি এবং একজাতীয় প্রস্তগুটিকাকৃতি চিহ্ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শৈব তিলক-চিহ্নের সঙ্গে শাক্ত তিলক-চিহ্নের সাদৃশ্য বিদ্যমান। দক্ষিণাচারী তান্ত্রিক শাক্তদের তিলক-চিহ্ন বক্রাকৃতি ত্রিপুণ্ড্র ও বিন্দুর সমন্বয়ে গঠিত, বিন্দুটি ত্রিপুণ্ড্রের সর্বনিম্ন রেখার নিচে মধ্যস্থলে অঙ্কিত হয়। বামাচারী তান্ত্রিক শক্তিসাধকের তিলক একটি ঈষৎ বক্ররেখা ও দু'টি বিন্দুর সাহায্যে রচিত হয়, বিন্দু দু'টি রেখার উপরে ও নিচে মধ্যবর্তী অংশে স্থাপিত হয় এবং উপরের বিন্দুটি যথার্থ বর্তুলাকার না হয়ে কিছুটা কোণাকৃতি। মহাকালীর উপাসকদের তিলক আবার অন্যরূপ। অর্থাৎ শাক্ত তিলক-চিহ্নের মধ্যেও প্রকারভেদ লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য, শিব ও শক্তিকে যাঁরা যুগ্মভাবে উপাসনা করেন, তাঁদের তিলক-চিহ্নও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। শাক্ত তিলক-চিহ্নের মধ্যে বিন্দুর নিত্য উপস্থিতি সবিশেষ লক্ষণীয়।

সৌর এবং গাণপত্য তিলক-চিহ্নের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য সীমাবদ্ধ। সৌর সম্প্রদায়ের চিহ্ন দু'টি স্থূল সরলরেখার সমন্বয়ে গঠিত, সর্বনিম্ন দ্বিতীয়

রেখাটি আকারে প্রথম রেখার এক চতুর্থাংশেরও কম এবং প্রথম রেখাটির সঙ্গে কেন্দ্রস্থলে যুক্ত, এ ক্ষুদ্র রেখাটি দুই ভুরুর মধ্যস্থলে সংস্থাপিত হয়। গাণপত্যদের তিলক-চিহ্ন ইংরেজী U অক্ষরের মতো এবং এর মধ্যস্থলে প্রদীপশিখার মতো একটি রেখা পরিদৃষ্ট হয়।

তিলক-চিহ্ন প্রসঙ্গে দু'টি সামাজিক তথ্যের উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, তিলকচিহ্ন ধারণের বিধি ব্যবস্থাতেও হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ প্রথার ছায়াপাত ঘটেছে। যদিও সকল বর্ণের হিন্দুই তিলক গ্রহণের অধিকারী পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণভেদ অনুসারে ভক্তদের বিভিন্ন ধরনের তিলক ধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'শিবার্চনচন্দ্রিকা'ধৃত, যামলে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ ঊর্ধ্বপুণ্ড্র, বৈশ্য অর্ধচন্দ্রাকৃতি তিলক এবং শূদ্র বর্তুলাকার তিলক ধারণ করবে। এ নির্দেশে অবশ্য সাম্প্রদায়িক তিলক-চিহ্নের উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়ত, গ্রাম-ভারতের লৌকিক দেব-দেবীর পূজার্চনার সঙ্গে কিছু কিছু তিলক-চিহ্নের দূরায়ত সংযোগ থাকা বিচিত্র নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দক্ষিণ ভারতের গ্রামদেবী গঙ্গেম্মাকে যাঁরা বাড়িতে পূজা করেন, তাঁরা অনুষ্ঠানের পূর্বে ঘরের দেওয়াল গোময়ের সাহায্যে পরিষ্কার করে তার উপর যে- চিহ্ন আঁকেন, তা প্রায় অবিকল শৈবদের ত্রিপুণ্ড্র। বস্তুত, সাম্প্রদায়িক তিলক-চিহ্ন ধারণের প্রথার উদ্ভবে ও চিহ্নগুলির রূপ-বৈচিত্র্যের বিবর্তনে আর্যসংস্কৃতির সঙ্গে অনার্যসংস্কৃতি কতখানি অংশ গ্রহণ করেছে, তা ব্যাপক ও গভীর গবেষণার বিষয়।

মুদ্রার আলোকে, প্রাচীন ভারতের জনগোষ্ঠী

কিছুদিন আগে পর্যন্তও ভারতবর্ষের ইতিহাস ছিল নানা রাজবংশের বৃত্তান্ত, আর ভারতবর্ষ ছিল সেই বৃত্তান্তের ফ্রেম মাত্র, ছবি নয়। সাম্প্রতিক কালে ইতিহাস রচনার পদ্ধতি বদলেছে ও বদলাচ্ছে, ইতিহাস-লেখকরা আবহমান ভারতবাসীর চিত্তের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস, ধ্যান-ধারণার ইতিহাস রচনায় ক্রমশ মনোযোগী হচ্ছেন। প্রতিষ্ঠাপন্ন রাজদরবারের বাইরের জনসাধারণের এই ইতিহাস রচনার উপকরণ ছড়িয়ে আছে একাধিক ক্ষেত্রে : গল্পে, গাথায়, কিংবদন্তীতে, দেব-দেবীর মূর্তিতে, দৈনন্দিন ব্যবহারের নানা জিনিসপত্রে। আর সেই প্রতিদিনের ব্যবহার্য অতি প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের অন্যতম হলো মুদ্রা, চলতি কথায় টাকাকড়ি। কয়েক দশক আগে পর্যন্তও এ দেশে মুদ্রা থেকে ইতিহাসের উপকরণ আহরণের কথা ঐতিহাসিকরা বিশেষ ভাবতেন না, ভাবতে পারতেন না, মুদ্রা ছিল তাঁদের কাছে মিউজিয়ামে রক্ষণায় বা দ্রষ্টব্য পুরা বস্তু মাত্র। দৃষ্টিভঙ্গীর এবং গবেষণা-পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে আজ তাঁরা একদা-অবহেলিত মুদ্রা থেকে উদ্ধার করেন শতাব্দীপারের কাহিনী, অন্যান্য উপাদান থেকে সমাহৃত তথ্যের সমর্থনে সে কাহিনীকে দাঁড় করান ইতিহাসের শক্ত জমির উপর। আপাতত প্রাচীন ভারতের একটি যুগ-পর্বের ইতিহাসের সাহায্যে বক্তব্যটি বিশদ করা যেতে পারে।

এ কথা হয়তো অনেকের জানা, মৌর্য সাম্রাজ্যের পরবর্তী এবং গুপ্ত রাজত্বের পূর্ববর্তী প্রায় পাঁচশো বছরের উত্তর ভারতের ইতিহাস আদ্যন্ত তিমিরময় না হলেও বহুলাংশে অন্ধকারাচ্ছন্ন। অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী—এই কালসীমায় আবদ্ধ ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় ঐক্য অনুপস্থিত, আর রাষ্ট্রীয় অনৈক্যের সুযোগে যবন-শক-পহলব-কুষাণ প্রমুখ বিদেশী শক্তিবর্গ নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপনে তৎপর। এবং তাঁদের মধ্যে কুষাণরা বেশ কিছু সময় ভারতবর্ষের বেশ কিছু অংশে আধিপত্য বিস্তারে সাফল্যও অর্জন করেছিলেন। এই সব বিদেশী রাজশক্তি ছাড়া এ দেশের আর যে সমস্ত ছোট-বড় নানা রাজ্যের প্রাধান্যের কথা জানা যায়, তাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল অ-রাজতান্ত্রিক, একটু বিস্তৃত অর্থে প্রজাতান্ত্রিক।

এই প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির রূপকারদের সাধারণভাবে 'ট্রাইব' বলা হয়ে থাকে, কিন্তু 'ট্রাইব' বললে যে- অর্ধবর্বর মানুষদের ছবি আমাদের মতো শহুরে বাবুদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আমাদের বর্তমান আলোচনার ট্রাইবগুলি বোধ করি আমাদের অনেকের চাইতে সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে প্রাগ্রসর ছিলেন। কারণ তাঁরা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে মুদ্রার ব্যবহার জানতেন, তাঁদের অনেক মুদ্রাই শিল্পগুণে নন্দনীয়, আধুনিক অর্থে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তক না হলেও তাঁরা ছিলেন গণতন্ত্রের পূজারী : তাঁদের মুদ্রায় সমগ্র জাতির নাম উৎকীর্ণ, ব্যক্তির নাম বিরল, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি-বিশেষের নাম থাকলেও তাঁর গোষ্ঠীপরিচয় অনিবার্যভাবে উপস্থিত। দৃষ্টান্ত : ঔদুম্বর জাতির মুদ্রায় পাওয়া যাচ্ছে শিবদাস, রুদ্রদাস, ধরঘোষের নাম, কিন্তু সেই সঙ্গে জাতি-নাম 'ঔদুম্বর'ও বর্তমান, কুণিন্দদের মুদ্রায় উৎকীর্ণ জনৈক অমোঘভূতির নাম, অমোঘভূতির সঙ্গে বিদ্যমান তাঁর জাতি-পরিচয় 'কুণিন্দ'।[১]

ঔদুম্বর-কুণিন্দদের প্রসঙ্গে 'জাতি' শব্দটি ব্যবহার করেই আমাকে থামতে হচ্ছে, ভাবতে হচ্ছে 'ট্রাইব'-এর বাংলা বা ভারতীয় প্রতিশব্দ কি হবে। 'জাতি' বা 'জাত' বলতে 'বর্ণ' বোঝায়—ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য জাতি, আবার ইংরেজী 'নেশন' বোঝাতেও আমরা 'জাতি' বলে থাকি, 'ইণ্ডিয়ান নেশন' যেমন 'ভারত জাতি'। কেউ কেউ 'ট্রাইব'-এর ভারতীয় রূপ খুঁজেছেন 'কৌম'-এ, কিন্তু 'কৌম' শব্দটিও তো অ-ভারতীয় ; আরবী শব্দের সাহায্যে ইংরেজী 'ট্রাইব'-এর ভারতীয়করণ সম্ভব কি ? সরকারী মহলে 'ট্রাইব'-এর এ-দেশী প্রতিশব্দ হিসাবে 'উপজাতি' কথাটার চল আছে, কিন্তু 'উপজাতি' বললেই নানা ক্ষেত্রে অনুন্নত নৃগোষ্ঠী-বিশেষের কথা মনে পড়ে। যদিও মন্দের-ভালো কাজ-চালানো গোছের শব্দ হিসাবে 'উপজাতি' চলতে পারে, আমার মতে 'জনগোষ্ঠী' শব্দটিই 'ট্রাইব'-এর যোগ্যতম ভারতীয় রূপ : প্রাচীনতর 'জন' শব্দে আছে নৃতাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা আর 'গোষ্ঠী'তে দলগত ঐক্য ও সাংস্কৃতিক সাধর্ম্য—ট্রাইব-সুলভ বৈশিষ্ট্য। 'জনগোষ্ঠী' নাম দিয়ে 'ট্রাইব' শব্দের এই তর্জমা সুধিবৃন্দের ও শিক্ষিতসমাজের অনুমোদন লাভ করবে বলে আমার আশা ও বিশ্বাস। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি

১ মুদ্রাগুলির মুখ্য দিকে ব্রাহ্মী হরফে লেখা : 'রাজ্ঞ কুণিংদস (স্য) অমোঘভূতিস (স্য) মহারাজস (স্য)', গৌণ দিকে খরোষ্ঠী হরফে লেখা 'রঞ কুণিদস অমোঘভুতিস মহরজস' (খরোষ্ঠীতে দীর্ঘস্বর অনুপস্থিত)।

আমার এই বিনীত তর্জমা ইতিমধ্যে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ছাড়পত্র পেয়েছে।

॥ দুই ॥

ফিরে আসা যাক ইতিহাসের ক্ষেত্রে। এমনই অসংখ্য জনগোষ্ঠী ছিল প্রাচীন ভারতে, যাঁদের অনেকে ইতিহাসের পাতায় নামমাত্র, অনেকে বিস্মৃতির অন্তরালে, হয়তো তাঁদের অধিকাংশই কালক্রমে বৃহত্তর ভারতীয় জনপ্রবাহে আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলেছেন। আলোচ্য কালপর্বে — খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী — এ ধরনের জনগোষ্ঠীগুলির* যাঁরা মুখ্যত তাঁদের প্রণীত ও ব্যবহৃত মুদ্রার মাধ্যমে আমাদের পরিচিত, সংখ্যায় তাঁরা চোদ্দ; তাঁদের নাম: অগ্র—আর্জুনায়ন—অশ্বক—ঔদুম্বর—কুলূত—কুণিন্দ—মালব—রাজন্য—শিবি—ত্রিগর্ত—উদ্দেহিক — বেমক — বৃষ্ণি এবং যৌধেয়। এই চতুর্দশ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই ছিলেন পাঞ্জাবের বাসিন্দা—পাঞ্জাব বলতে আমি ইংরেজ-শাসিত অবিভক্ত পাঞ্জাব বোঝাচ্ছি। কারো কারো বসতি ছিল রাজস্থানে, কোন কোন গোষ্ঠী বিস্তৃততর ভূখণ্ডে অধিকার বিস্তারেও সফল হয়েছিলেন। ঔদুম্বর-কুণিন্দ-যৌধেয় প্রমুখ খ্যাতিমান গোষ্ঠীগুলির অধিষ্ঠান ছিল পাঞ্জাব, মালব-শিবি উদ্দেহিকরা ছিলেন রাজস্থানে, আর যৌধেয় জনগোষ্ঠী তাঁদের আদি বাসস্থান বর্তমান হরিয়ানার রোহটক-এর বাইরেও আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

এই চোদ্দটি জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ইতিবৃত্ত রচনা দুরূহ কাজ, কারণ প্রাসঙ্গিক তথ্যের অপ্রতুলতা, তবু সম্ভাব্য নানা সূত্র ধরে এঁদের সম্পর্কে যেসব সংবাদ সংগ্রহ করেছি, নানাভাবেই তা আকর্ষণীয়। সংগৃহীত সংবাদের মূল উৎস জনগোষ্ঠীদের নিজস্ব মুদ্রা, তা ছাড়া 'ইনসক্রিপশন' বা অভিলেখ এবং পুরাণ-মহাকাব্য প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকেও খবরাখবর পাওয়া গেছে। মুদ্রাগত উপাদানের প্রধান তথ্য, স্বাধীন রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে এই সব জনগোষ্ঠীর উত্থান খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে। তবে খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থে কিংবা খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের কৌটিলীয় 'অর্থশাস্ত্রে' এঁদের কারো কারো নামোল্লেখ আছে, যেমন অগ্র, বৃষ্ণি এবং যৌধেয়। শুধু এ- দেশের গ্রন্থে কেন, বিদেশী লেখকদের রচনাতেও এঁদের কারো কারো কথা পাওয়া যায়। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ

---

* আলোচ্য জনগোষ্ঠীদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য আমার *A Tribal History of Ancient India : A Numismatic Approach* (Calcutta, 1974) দ্রষ্টব্য।

শতাব্দীতে ভারত আক্রমণের সময় আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে বন্ধু কিংবা শত্রুভাবে যাঁদের সাক্ষাৎ ঘটেছিল, মালব ও শিবি তাঁদের অন্যতম। গ্রীকদের সঙ্গে মালবদের সংঘর্ষ ঘটেছিল, শিবিদের সঙ্গে ছিল মিত্রতামূলক সম্পর্ক। জনগোষ্ঠীদের কারো কারো সম্পর্কে লেখপ্রমাণও আছে। আজমীঢ়ের ৭৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমের নান্দ্‌সা গ্রামে পাওয়া অভিলেখতে 'মালব-গণ-বিষয়ে'র কথা আছে; অভিলেখটি ২২৫–২৬ খ্রীস্টাব্দের।[১] এই নান্দ্‌সা লেখপ্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায়, ঐ সময়ে অর্থাৎ খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে আজমীঢ়, উদয়পুর, জয়পুর ও টোঙ্ক্ অঞ্চল নিয়ে 'মালব গণ-বিষয়' অর্থাৎ মালব-রাষ্ট্র গঠিত ছিল। এই সমস্ত অঞ্চলে আবিষ্কৃত মালবদের মুদ্রা এ বক্তব্যের সমর্থক। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের সমুদ্রগুপ্তের বিখ্যাত প্রয়াগ প্রশস্তিতে মালবদের সঙ্গে আর্জুনায়ন ও যৌধেয়দের উল্লেখ আছে, গুপ্ত সম্রাটের কাছে তাঁরা নাকি নতি স্বীকার করেছিলেন।[২] তবে তাঁদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সমুদ্রগুপ্ত হস্তক্ষেপ করতেন এমন কোন প্রমাণ নেই। প্রয়াগ প্রশস্তি ছাড়া ১৫০ খ্রীস্টাব্দের জুনাগড়ের লেখ-সাক্ষ্যও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই লেখটি থেকে জানা যাচ্ছে, শক নৃপতি রুদ্রদামা যৌধেয়দের পরাস্ত করেছিলেন; লেখ-রচয়িতা কিন্তু সেই সঙ্গে যৌধেয়দের বীর্যবত্তার কথা জানাতে ভোলেন নি।[৩] প্রাচীনতর ও সমসাময়িক গ্রন্থাদি এবং লেখমালা থেকে সংগৃহীত এ ধরনের নানা সংবাদকে মুদ্রা-লব্ধ তথ্যের সঙ্গে সমন্বিত করে জনগোষ্ঠীগুলির ইতিহাস রচনা শ্রমসাধ্য হলেও অবশ্য করণীয়, কারণ ভারত-ইতিবৃত্তের বিবর্তনে নানা রাজবংশের চাইতে তাঁদের দান কোন অংশে কম নয়। মৌর্যোত্তর ও গুপ্তপূর্ব ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার দিনে এই গণতন্ত্রপ্রিয় জনগোষ্ঠীগুলির প্রাধান্য, সুতরাং এই গোষ্ঠীগুলির বৃত্তান্ত ভারত-ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

।। তিন ।।

আগেই বলেছি, জনগোষ্ঠীগুলির ইতিবৃত্তের প্রধান উপাদান তাঁদের প্রণীত ও ব্যবহৃত মুদ্রা। শতকরা নিরানব্বইটি মুদ্রা তামার, সামান্য কিছু রুপোর। গোষ্ঠীদের মধ্যে কুণিন্দরাই বেশিসংখ্যক রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন

১ Nandsa Inscription, *Epigraphia Indica*, Vol. XXVII, pp. 252 ff.

২ Fleet (ed.), *Corpus Inscriptionum Indicarum*, Vol. III, pp. 6 ff.

৩ Junagadh Inscription, *Epigraphia Indica*, Vol. VII, pp. 42 ff.

করেছিলেন, সম্ভবত সমসাময়িক ইন্দো-গ্রীক বা ভারতস্থ গ্রীক রাজাদের রজত-মুদ্রার সঙ্গে প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে। ঔদুম্বর, বৃষ্ণি, বেমক ও যৌধেয়দের রৌপ্যমুদ্রাও পাওয়া গেছে, ঔদুম্বরদের মোট দু'টি, বাকি প্রত্যেকের মাত্র একটি করে। ঢালাই কিংবা ছাঁচ পদ্ধতিতে প্রস্তুত মুদ্রাগুলির[১] দুই পিঠে নানা ধরনের প্রতীক, পশু এবং মনুষ্য-মূর্তি, সেই সঙ্গে ব্রাহ্মী কিংবা খরোষ্ঠী হরফে প্রাকৃত কিংবা সংস্কৃত ভাষায় লেখা জনগোষ্ঠীর নাম। ব্রাহ্মী এবং প্রাকৃত লেখর সংখ্যাই বেশি; খরোষ্ঠী হরফের ব্যবহার মেলে ঔদুম্বর-কুণিন্দ-বৃষ্ণি প্রমুখদের মুদ্রায়, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত খরোষ্ঠীর সঙ্গে যাঁদের পর্যাপ্ত পরিচয় ছিল। সংস্কৃত বা সংস্কৃত-ঘেঁষা লেখগুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের, কুলূত-আর্জুনায়ন-মালব ও যৌধেয়দের এক শ্রেণীর মুদ্রায় এ ধরনের লেখা দেখা যায়।[২] এই সব মুদ্রালেখতে কখনও কখনও গোষ্ঠীর নেতাবিশেষের নামের সাক্ষাৎ মেলে। তবে ব্যক্তি-নামের উল্লেখের ঘটনা বেশি নয়, সর্বত্রই মুদ্রা-গুলির প্রণয়নকারী গোষ্ঠীদের স্বনামের প্রাধান্য। আর্জুনায়ন, মালব এবং যৌধেয়রা যখন জয়ের কিংবা বিজিগীষার ইঙ্গিত দিয়েছেন, তখন তা সমগ্র গোষ্ঠীর নামেই দিয়েছেন, ব্যক্তিবিশেষের নামে নয়; যেমন, 'আর্জুনায়নানাং জয়ঃ', 'মালবগণস্য জয়ঃ', 'যৌধেয়গণস্য জয়ঃ' ইত্যাদি। এই মুদ্রালেখগুলি যে মালব-যৌধেয় প্রমুখদের গোষ্ঠীসচেতনতা, একটু অন্যভাবে, গণতন্ত্রপ্রিয়তার সাক্ষ্য বহন করে তা বলা বাহুল্য।

কিছু সংখ্যক মুদ্রায় ব্যক্তিবিশেষের নামের আগে 'রাজা' কিংবা 'মহারাজা' দেখা যায়। ফলে এ সন্দেহ অস্বাভাবিক নয়, ইতিহাসের কোন পর্বে প্রজাতান্ত্রিক জনগোষ্ঠীদের কেউ কেউ রাজতন্ত্রের অনুবর্তী হয়েছিলেন কিংবা রাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছিলেন। ঔদুম্বরদের মুদ্রায় শিবদাস-রুদ্রদাস প্রমুখদের কিংবা কুণিন্দগোষ্ঠীর অমোঘভূতির নামের আগে 'রাজা' আছে, অমোঘভূতির ক্ষেত্রে 'রাজার' সঙ্গে 'মহারাজা'ও। আমার মতে, এসব ক্ষেত্রে 'রাজা' বা মহারাজা আক্ষরিক নয়, সাম্মানিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

১ ভারতবর্ষের প্রাচীনতম মুদ্রা অঙ্কচিহ্নিত (punch-marked), অধিকাংশ রজতনির্মিত। এগুলির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সাধারণভাবে স্বীকৃত মত এই, এ ধরনের মুদ্রা খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে চালু হয়েছিল। ঢালাই পদ্ধতির তাম্রমুদ্রাগুলি একটু পরবর্তী কালের।

২ 'অর্জুনায়নানাং জয়', 'বীরযশস্য রাজ্ঞ কুলূতস্য', 'বৃষ্ণি রাজজ্ঞাগণস্য ত্রতরস্য' ইত্যাদি সংস্কৃত-ঘেঁষা মুদ্রালেখের উদাহরণ।

প্রাচীনতর কালে শাক্য ও লিচ্ছবিদের শাসন-পরিচালনার ভার যাঁদের উপর ন্যস্ত হতো, তাঁরা সকলেই 'রাজা' বলে অভিহিত হতেন, অথচ শাক্য ও লিচ্ছবিরা যে রাজতন্ত্র-শাসিত ছিলেন না, এ সত্য ইতিহাসের। আধ্যাত্মিক গুরু বা আচার্যদের এখনও 'মহারাজা' বলা হয়, বলা বাহুল্য সাম্মানিক অর্থেই। অনুরূপভাবে, ঔদুম্বর ও কুণিন্দরাও ছিলেন অরাজতান্ত্রিক, বা 'নন-মনারকিক্যাল', এবং শিবদাস-রুদ্রদাস-অমোঘভূতি প্রমুখের মুদ্রায় তাঁদের নামের সঙ্গে অপরিহার্যভাবে তাঁদের গোষ্ঠীনামের উল্লেখ যে-ইঙ্গিত বহন করে তা হলো, ব্যক্তিবিশেষের আপেক্ষিক প্রাধান্য সত্ত্বেও জনগোষ্ঠীগুলি তাঁদের মৌল চরিত্র হারিয়ে কখনও রাজতান্ত্রিক শাসনের অধীন হন নি। আর এই ইঙ্গিত ঐতিহাসিক সত্যের সামীপ্য লাভ করে মুদ্রা-লেখতে 'গণ' শব্দের প্রয়োগে। খ্রীস্টজন্মের একশো বছর আগে-পরে রচিত, আমাদের মুদ্রাগুলির সমসাময়িক, 'অবদানশতক' গ্রন্থে আছে, সেকালে 'গণাধীন' ও 'রাজাধীন' দু ধরনের শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। সুতরাং ঔদুম্বর-কুণিন্দ-মালব-যৌধেয় প্রভৃতি জনগোষ্ঠী-গুলির কোন কোন নেতা খ্যাতিমান কিংবা ক্ষমতাশালী হলেও গোষ্ঠী-গুলি মূলত গণতান্ত্রিক থেকে গিয়েছিল। এ তথ্যের আকর্ষণীয় সমর্থন মেলে গ্রীক-রোমক লেখকদের রচনায়, আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের বিবরণে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মালবদের তাঁরা স্পষ্টতই 'কিংলেস ট্রাইবস' বা 'নৃপতিবিহীন জনগোষ্ঠী'র অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১]

গণতন্ত্রের সঙ্গে রাজতন্ত্রের বিরোধ দীর্ঘ দিনের, এই সব জনগোষ্ঠীর ইতিহাসেও তার নজির মেলে। অগ্র-ত্রিগর্ত-যৌধেয়দের নাম খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পাণিনির ব্যাকরণ-গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁরা যে রাজ-তান্ত্রিক ছিলেন না, পাণিনি এবং অন্যান্য প্রাচীন লেখকদের রচনায় তার ইঙ্গিত রয়েছে। আমাদের বর্তমান আলোচনার বহির্ভূত গণতান্ত্রিক লিচ্ছবি ও শাক্যদের নাম সুবিদিত। স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ এই জনগোষ্ঠীগুলি ছিল পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, ফলে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মতো এ দেশে একনায়ক-তন্ত্রের প্রথম সার্থক রূপকারের পক্ষে যৌধেয়-অগ্র-ত্রিগর্তদের বাসভূমি নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করা অসহজ হয় নি। সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। খ্রীস্টপূর্ব ১৮৫ অব্দে বা তার কাছাকাছি সময়ে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মৌর্যবংশীয়

১ McCrindle, *Invasion of Alexander*, pp. 143-44, 156.

বৃহদ্রথকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন, তিনি মৌর্য সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষের সংহতি মোটামুটি বজায় রাখতে পারলেও তাঁর উত্তরসূরিদের পক্ষে তা আর সম্ভব হয় নি। একনায়কতন্ত্রের পিছু-হটার এই দিনগুলিতে স্বাতন্ত্র্যকামী জনগোষ্ঠীগুলির পুনরাবির্ভাব, আগেকার যৌধেয়-ত্রিগর্তদের সঙ্গে আরও অনেকে স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করেন। নানা সূত্রে জানা যায় তাঁদের নাম, তাঁদের প্রণীত ও ব্যবহৃত মুদ্রা যাদের অন্যতম। সাধারণভাবে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের উত্তর ভারতে চন্দ্রগুপ্ত-অশোকের মতো একনায়কবাদী শক্তিধর রাজার অভাবে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি বিপর্যস্ত, ছোট-বড় নানা রাজ্যের উত্থানে বিচ্ছিন্ন স্থানীয় আত্মসচেতনতার পুনঃপ্রকাশ, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ও অনৈক্যের সুযোগে যবন-শক-পহ্লব-কুষাণ প্রভৃতি বৈদেশিকদের ক্রমপর্যায়ী আক্রমণ ও অধিকার বিস্তার, সব মিলিয়ে এ সময়কার রাজনৈতিক চিত্র হতাশাব্যঞ্জক। মথুরা, অযোধ্যা, মগধ প্রভৃতি অঞ্চলে বিভিন্ন রাজবংশের একনায়কতান্ত্রিক শাসন, পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের কিয়দংশে ঔদুম্বর-কুণিন্দ-মালব-আর্জুনায়ন-যৌধেয় প্রমুখ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির দীপ্ত সমুত্থান। খ্রীস্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত এই সব রাষ্ট্র-গুলির অধিকাংশই তাদের স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরে-ছিল। অধিকাংশ বলছি এজন্য, অশ্বক-রাজন্য-শিবি-কুলূত প্রভৃতি কিছু কিছু জনগোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আত্মসংযুক্তিকে প্রশস্ত মনে করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের প্রয়াগ প্রশস্তিতে তাঁদের অনেকের নাম অনুপস্থিত, তাই এই অনুমান। যাই হোক, মালব-যৌধেয়দের মতো শক্তিশালী জনগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে শক-কুষাণ প্রভৃতি বহিরাগতদের সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল, সংঘর্ষ ঘটেওছিল, না হলে 'মালবানাং জয়ঃ', 'যৌধেয়-গণস্য জয়ঃ' প্রভৃতি মুদ্রালেখর তাৎপর্য থাকে না। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ইন্দো-গ্রীক বা যবনদের আক্রমণের ফলে মূলত পাঞ্জাববাসী মালবরা রাজস্থানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন, খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে শক রাজা রুদ্রদামার সঙ্গে যৌধেয়দের বিরোধ ঘটেছিল। আর খ্রীস্টীয় প্রথম–দ্বিতীয় শতাব্দীতে কুষাণদের সঙ্গে একাধিক জন-গোষ্ঠী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। কুষাণদের বিরুদ্ধে সম্ভবত একাধিক জনগোষ্ঠী জোট বেঁধেছিলেন, তবে খুব সুবিধা করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না; অন্তত কণিষ্ক-হুবিষ্কের মতো কুষাণ সম্রাটদের প্রবল প্রতাপের দিনে তাঁরা শেষ পর্যন্ত মাথা নিচু করেই

অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন বলে মনে হয়। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষদিকে কুষাণশক্তির ক্রমাবনতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পুনরভ্যুত্থান এবং চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়-পর্বের পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা সগৌরব অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

জনগোষ্ঠীগুলির 'ইতিহাস গুপ্ত-পরবর্তী যুগে প্রসারিত করা যায় না, সাহিত্য-ধৃত বা মুদ্রাগত কোন প্রমাণই আমাদের কাছে নেই। সমুদ্র-গুপ্তের আমলেই তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের আগে-পরে তাঁদেরও পতন ঘটেছিল। অতীতে তাঁরা মৌর্য সাম্রাজ্যবাদকে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন, গুপ্ত সাম্রাজ্যবাদকে অতিক্রম করা শেষ পর্যন্ত তাঁদের পক্ষে আর সম্ভব হয় নি। তাঁদের ক্রমলুপ্তির কারণ একাধিক। সম্ভাব্য কারণের প্রধান যেটি তা হলো, একনায়ক-বাদের প্রতি সাধারণ ভারতবাসীর প্রবণতা। অর্থাৎ সেই সময়কার সাধারণ মানুষ ক্রমশ বিচ্ছিন্ন স্থানীয় আত্মসচেতনতার পরিবর্তে সংহত সুশাসিত রাষ্ট্রচেতনার অধীন হয়ে পড়েছিলেন। অতীতের অভিজ্ঞতায় তাঁরা বুঝতে পারছিলেন, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধে কিংবা রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা স্থাপনে একাধিক গণরাষ্ট্রের চাইতে একটি শক্তিশালী রাজশক্তি অনেক বেশি কার্যকর। বস্তুত, গুপ্তোত্তর যুগে বহু রাজতন্ত্র-শাসিত রাজ্যের উদ্ভব হলেও প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় আর ঘটে নি।

॥ চার ॥

আবহমান ভারতবাসীর চিত্তের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস, ধ্যান-ধারণার ইতিহাসও আলোচ্য জনগোষ্ঠীর ইতিবৃত্তে বিধৃত। সে- ইতিবৃত্ত এতদিন পর্যন্ত ছিল অলিখিত, ঐতিহাসিক-সমাজে জনগোষ্ঠীগুলি ছিল অনাদৃত। ইতিহাসে উপেক্ষিত এই সব জনগোষ্ঠীর ইতিহাস রচনাকালে অনেক আকর্ষণীয় তথ্য পেয়েছি, অনুধাবন করেছি ইতিহাস রচনায় আপাতসামান্য প্রাচীন মুদ্রার মূল্যবত্তা। অগ্র-আর্জুনায়ন-শিবি-বেমক-যৌধেয়-দের মুদ্রায় যে- সমস্ত প্রতীক, পশু-প্রতিকৃতি ও মানব-মূর্তির সাক্ষাৎ মেলে, নিঃসন্দেহেই সেগুলি নানা সাংস্কৃতিক তথ্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন। স্বস্তিক-চিহ্ন, পাহাড়, নদী, বেষ্টনীবদ্ধ বৃক্ষ, নন্দিপদ, সৌর চিহ্ন ; বৃষ-হস্তি-সিংহের প্রতিকৃতি ; মন্দির-স্থাপত্যের নিদর্শন ; শিব-কার্তিক-শ্রীলক্ষ্মী ও বিশ্বামিত্রের মূর্তি — সংক্ষেপে এই হলো জনগোষ্ঠী-মুদ্রার শিল্পভাণ্ডার। প্রতীক-চিহ্ন ও প্রতিকৃতিগুলিতে স্বভাবতই জনগোষ্ঠীদের ধ্যান-ধারণা

ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতিফলন মেলে। এবং এগুলির অধিকাংশই তাঁরা উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁদের পূর্বসূরিদের—হড়প্পা ও আর্যসংস্কৃতির ধারক-বাহকদের—কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। সংখ্যাবিচারে তাঁদের বেশিরভাগ মুদ্রাতে বৃক্ষ-প্রতীক ও বৃক্ষের উপস্থিতি লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য, এ দু'টি মোটিফই সুপ্রাচীন, সিন্ধু সভ্যতার আমল থেকেই এদের জনপ্রিয়তা। হস্তি অনেক মুদ্রাতে অঙ্কিত হলেও সিংহের প্রতিকৃতি বিশেষ দেখা যায় না। অগ্র এবং মালবদের মুদ্রায় সিংহের সাক্ষাৎ মেলে। হরিণ ও হরিণী কুণিন্দ ও যৌধেয়দের এবং অশ্ব-মোরগ ও ময়ূর শুধুমাত্র যৌধেয়দের মুদ্রায় দেখা যায়। উদ্দেহিকদের কিছু মুদ্রায় মাছও উৎকীর্ণ হয়েছে। অগ্র ও বৃষ্ণিদের মুদ্রায় বকচ্ছপ জাতীয় আজগুবি প্রাণীর (বৃষ্ণি-মুদ্রার প্রাণীটি হস্তির পুরোভাগ ও সিংহের পশ্চাদ্ভাগের সংমিশ্রণ) উপস্থিতি কৌতূহলোদ্দীপক; সমসাময়িক কিংবা অল্পবিস্তর পূর্ববর্তী পশ্চিম এশিয়ার শিল্পধৃত অনুরূপ বিচিত্র জন্তুগুলির সঙ্গে এদের যোগ অস্বাভাবিক নয়। দেব-দেবীদের মধ্যে শিব ও লক্ষ্মী জনপ্রিয় ছিলেন, কুণিন্দরা উভয়েরই ভক্ত ছিলেন, যৌধেয়রা এঁদের ছাড়া কার্তিকেয়-দেবতারও অর্চনা করতেন। ঔদুম্বর-গোষ্ঠী সাধারণভাবে শিবের উপাসক ছিলেন, কিন্তু ঋষি বিশ্বামিত্র ছিলেন তাঁদের মানিত পূর্বপুরুষ, দেবজ্ঞানে পূজনীয়। আলোচ্য জনগোষ্ঠীরা প্রতীকের মাধ্যমেও আরাধ্য দেবতার উপস্থিতি ব্যক্ত করতেন তাঁদের মুদ্রায়। এ পর্যন্ত বৃষ্ণিদের একটিমাত্র মুদ্রা পাওয়া গেছে, সেই মুদ্রায় একটি বিশিষ্ট চক্র সুন্দরভাবে অঙ্কিত; আমার মতে এটি বৃষ্ণিগোষ্ঠিভুক্ত শ্রীকৃষ্ণের অমূর্ত প্রতীক, তাঁরই বিখ্যাত লাঞ্ছন সুদর্শন-চক্র।

দু-একটি উদাহরণের সাহায্যে জনগোষ্ঠীদের ধর্মবিশ্বাস ব্যাখ্যান হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কুণিন্দদের একশ্রেণীর মুদ্রায় পদ্মধরা শ্রী-লক্ষ্মী, অন্য-শ্রেণীর মুদ্রায় জটামণ্ডিত মহাদেব। শ্রী-লক্ষ্মীর সঙ্গে একটি পশু — হরিণী, এ সনাক্তীকরণ ঋগ্বেদীয় শ্রীসূক্তের ভিত্তিতে সম্পন্ন। শ্রীসূক্তে হরিণী শ্রীলক্ষ্মীর পশুরূপ বলে বর্ণিত।[১] অতএব কুণিন্দদের মুদ্রাগুলিতে একই

১ হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহঃ॥

তামিলনাড়ু অঞ্চলের প্রাচীন সাহিত্যে ও শিল্পে দুর্গার সঙ্গে হরিণীর সম্পর্ক দেখা যায়। মহাবলীপুরমের বরাহমণ্ডপম্ ও আদিবরাহ গুহামন্দিরে এবং কাঞ্চী-পুরমের কৈলাসনাথ মন্দিরে দুর্গা ও হরিণীর একত্রিত মূর্তি আছে। 'পায়কলৈপ্পবই',

সঙ্গে শ্রীলক্ষ্মীর মানবী ও পশুরূপের সাক্ষাৎ নিঃসন্দেহেই আকর্ষণীয়। কুণিন্দদের অন্য মুদ্রাগুলিতে শিবের প্রতিকৃতির সঙ্গে যে-অভিলেখটি উৎকীর্ণ তাতে দেবতাকে 'ছত্রেশ্বর' (স্থানীয় ভাষার বানানে 'চত্রেশ্বর') অভিধা দেওয়া হয়েছে ; এই মুদ্রাগুলিতে কুণিন্দদের নাম নেই, অনুমান করি কোন এক কালপর্বে কুণিন্দরা তাঁদের রাষ্ট্রকে মহাদেবের নামে উৎসর্গ করেছিলেন ; অর্থাৎ তাঁরা মহাদেবের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যশাসন করতেন। কুণিন্দদের যেমন শিব, যৌধেয়দের তেমনই আরাধ্য দেবতা ছিলেন স্কন্দ-কার্তিকেয়। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী দেবতাদের প্রসাদকামী যৌধেয়দের মুদ্রায় দেবসেনাপতি কার্তিক ষড়ানন কিংবা একমুখ রূপে চিত্রিত হয়েছেন। একটি মুদ্রায় 'যৌধেয়' শব্দটি উৎকীর্ণ হলেও আবিষ্কৃত অন্য সমস্ত মুদ্রাতেই গোষ্ঠী-নাম অনুপস্থিত। মুদ্রালেখতে শুধুমাত্র ভগবান স্বামী ব্রহ্মণ্যদেব-কুমারের উল্লেখ বর্তমান, 'ব্রহ্মণ্য' ও 'কুমার' কার্তিকের দু'টি পরিচিত নাম। সুতরাং যৌধেয় রাষ্ট্রও ছিল ধর্মভিত্তিক, অর্থাৎ যৌধেয়রা তাঁদের রাষ্ট্র কার্তিকেয়কে উৎসর্গ করে তাঁর নামে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। দেবতার নামে শাসনকার্য পরিচালনার নজির এ দেশে আরও আছে। আদি-মধ্যযুগের রাজস্থানের মেবার অঞ্চলের গুহিলবংশের রাজারা একলিঙ্গ-শিবকে তাঁদের অধিপতি জ্ঞানে রাজ্যশাসন করতেন। সাম্প্রতিক কালে ব্রিটিশ ভারতে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের মহারাজারা পদ্মনাভ– বিষ্ণুর প্রতিনিধি হিসাবে শাসনকার্য চালাতেন।

॥ পাঁচ ॥

আলোচ্য জনগোষ্ঠী-মুদ্রাগুলির শিল্পগুণও মনোযোগের যোগ্য। এদের দু পিঠে দৃষ্টিগোচর চিহ্ন-প্রতীক, জীবজন্তু, মানুষ ও দেবদেবীর রূপায়ণে অজ্ঞাত শিল্পীদের তক্ষণকৌশল প্রশংসনীয়। মুদ্রাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিসরের কথা ভাবলে একথা আরও বেশি মনে হবে। এ সূত্রে কুণিন্দদের মুদ্রায় অন্যূন ছ'টি প্রতীকের মাত্রাবৃত্ত বিন্যাসের উল্লেখ করা যেতে পারে। কখনও কখনও মুদ্রার দ্বিমাত্রিক সমতলে ত্রিমাত্রিকতার আভাস এনে শিল্পীরা তাঁদের পরিপ্রেক্ষিতের জ্ঞান এবং শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়

'কলৈম্পরিউর্দি', 'কম্বরামায়ণম্' প্রভৃতি গ্রন্থে (শেষোক্তটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন) হরিণীকে দুর্গার বাহন বলা হয়েছে। সুতরাং কুণিন্দ-মুদ্রায় হরিণীসহ দেবীকে দুর্গা-লক্ষ্মীও বলা যেতে পারে।

দিয়েছেন। তাঁদের চোখের দেখা স্বচ্ছ, দেখার চোখ গভীর, ফলে তাঁদের অঙ্কিত জীবজন্তু এবং দেবদেবীরা জীবন্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, মনকে নাড়া দেবার ক্ষমতায় বিশিষ্ট। যৌধেয়দের কিছু মুদ্রার কার্তিকেয়-মূর্তি সেনাপতি-সুলভ সাহস ও বীর্যবত্তায় যেমন দৃপ্ত, মুদ্রাগুলির অপর পৃষ্ঠে কার্তিকেয়-পত্নী দেবসেনার মূর্তিটিও তেমনই লাবণ্যময়ী, প্রাণবন্ত ও গতিশীল। কুণিন্দদের মুদ্রায় লক্ষ্মীর ও হরিণীর প্রতিকৃতি দু'টিও শিল্পীদের স্বচ্ছ ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টির পরিচায়ক। হরিণীর প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, আলোচ্য মুদ্রার শিল্পীরা জন্তুজগৎকে ভালোভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। জীবজন্তুর প্রতি তাঁরা কতখানি সংবেদনশীল ছিলেন, আর্জুনায়নদের কয়েকটি মুদ্রায় যজ্ঞোৎসর্গের বৃষের মুখে প্রতিফলিত মৃত্যুর পূর্বাভাসের বেদনা দেখেই তা বোঝা যায়। বৃষ্ণিদের অনন্য মুদ্রাটিতে হাতি ও সিংহের সমন্বয়ে তৈরি আজগুবি জন্তুটি স্বপ্নসম্ভব হয়েও যেন বাস্তব, যার সঙ্গে যে-কোনদিন দেখা হয়ে যাওয়া আশ্চর্যের নয়। মুদ্রাগুলির তক্ষণশিল্পে দেশজ ও বিদেশী শৈলীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, কখনও স্বতন্ত্র- কখনও সমন্বিত- ভাবে : কুণিন্দদের মুদ্রার ছত্রেশ্বর মহাদেব- মূর্তি দেশজ শৈলীর পরিচায়ক, অন্যদিকে কিছু যৌধেয় মুদ্রায় উৎকীর্ণ কার্তিকেয় ও দেবসেনার রূপায়ণে বিদেশী (গ্রীক) শিল্পরীতির প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। ঔদুম্বরদের রৌপ্যমুদ্রা দু'টিতে উৎকীর্ণ বিশ্বামিত্রের মূর্তিতেও গ্রীক ভাস্কর্যসুলভ বাস্তবতাবোধের স্বাক্ষর স্পষ্ট।

॥ ছয় ॥

আলোচ্য জনগোষ্ঠীদের মুদ্রা থেকে আরও অনেক আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক তথ্য পাওয়া যায়। ভৌগোলিক এবং নৃতত্ত্বগত দু-একটি উদাহরণ দিয়ে বর্তমান আলোচনার উপসংহার টানছি।

অগ্র নামীয় জনগোষ্ঠীর মুদ্রা পাওয়া গেছে এখনকার হরিয়ানা প্রদেশের হিসার অঞ্চলে, উৎখননের সূত্রে মুদ্রাগুলির সঙ্গে আরও অনেক পুরা বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। সময়ের হিসাবে, এগুলি খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতাব্দীর। প্রাচীন লোকশ্রুতি অনুসারে 'অগ্রবাল' বা আগরওয়াল শ্রেণীর বৈশ্যরা হিসার থেকে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মুদ্রা এবং লোকশ্রুতির মিলিত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অগ্র জনগোষ্ঠীকে এ কালের অগ্রবাল-আগরওয়ালদের পূর্বপুরুষ মনে করা অসঙ্গত হবে না। ভাগবতপুরাণ ও অন্যত্র মালব ও মালব-দ্বিজের কথা আছে, মুদ্রায় উৎকীর্ণ মালবগণের নাম, আর দূর-প্রাচীন এই মালব জনগোষ্ঠীর স্মৃতি দীপ্যমান হয়ে

আছে মালব-মালওয়া দেশখণ্ডে, মালব্য-মালবীয় হিন্দু ব্রাহ্মণদের পদবীতে। হিমাচল প্রদেশের নিসর্গ-রমণীয় কুলু উপত্যকার খ্যাতি দূর-বিস্তৃত, কিন্তু দূর কালের কুলূত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তার সম্পর্কের সন্ধান আর কেই-বা রাখেন? অনুরূপভাবে, একালের শতদ্রু-তীরবর্তী জোহিয়াবার যে একদিন যৌধেয়দের বাসভূমির অন্তর্গত ছিল কিংবা একালের জোহিয়া-রাজপুতরা যে যৌধেয়দের উত্তরপুরুষ এ সব খবর অনেক সংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞেরও অজানা।

লোকশ্রুতি সর্বাংশে বা নিজস্ব মূল্যে নির্ভরযোগ্য না হলেও ঐতিহাসিকদের কাছে সম্পূর্ণ অবহেলার বস্তুও নয়। অন্তত নতুন গবেষণা-পদ্ধতিতে জনশ্রুতি-গাথা-কিংবদন্তীর মূল্য ক্রমশ স্বীকৃত হচ্ছে। বিশেষত ভারতবর্ষের মতো যে- সব প্রাচীন দেশের সভ্যতা এখনও জীবন্ত, যে- সব দেশের সভ্যতার ধারা প্রাচীনকাল থেকে এখনও প্রবহমান, সে- সব দেশের ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে সব সময় পাথুরে প্রমাণের উপর একান্ত নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। এই মুহূর্তে বর্তমান মালবীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে প্রাচীন মালবদের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের পাথুরে প্রমাণ আমার হাতে নেই, কিন্তু ঐতিহ্য-নির্ভর আমার অনুমান অসঙ্গত নয় বলে আমার বিশ্বাস। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আরও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে। আমার বিশ্বাসের মূলে আমার অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

ঔদুম্বর জনগোষ্ঠীর দু'টি রৌপ্যমুদ্রায় ঋষি বিশ্বামিত্রের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ, সঙ্গে খরোষ্ঠী হরফের পরিচয়-লিপি 'বিশ্পমিত্র', অর্থাৎ বিশ্বামিত্র। প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ পণ্ডিত ও মুদ্রাবিদ্ জন অ্যালান ঔদুম্বরদের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের সম্পর্ক আবিষ্কারে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ১৯৬১ সালে বেদ-মহাকাব্য-পুরাণ ইত্যাদির মিলিত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আমি সিদ্ধান্ত করেছিলাম, বিশ্বামিত্র ঔদুম্বরদের পূর্বপুরুষ, সেই কারণেই ঔদুম্বরদের মুদ্রায় তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি।[১] আমার এই সিদ্ধান্ত সর্বজন-মানিত হলেও আমার একটি অনুমান সম্পর্কে কিছুদিন আগেও কারো কারো সংশয় ছিল। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের রোমক লেখক প্লিনির একটি উক্তির উপর নির্ভর করে আমি বলেছিলাম, খ্রীস্টীয় প্রথম শতকেই ঔদুম্বরদের একটি শাখা পাঞ্জাব থেকে গুজরাতে চলে এসে কচ্ছ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন এবং একালের ঔদুম্বর নামীয় গুজরাতী ব্রাহ্মণবর্গ ঐ প্রাচীন ঔদুম্বরদের উত্তরপুরুষ।

---

১ *Journal of the Asiatic Society*, III, No. 1. (1961), pp. 15-19; এবং মৎপ্রণীত *The Audumbaras* (Calcutta, 1965) pp. 5-7.

সম্প্রতি আমার সেদিনের এই অনুমানের আশ্চর্য তথ্য-সমর্থন পেলাম। ঔদুম্বর ব্রাহ্মণবংশীয় জনৈক লেখকের 'ঔদুম্বর পরিচয়' নামের একটি গুজরাতী বই থেকে জানতে পারলাম, গুজরাতের ঔদুম্বর ব্রাহ্মণরা বিশ্বামিত্র গোত্রের অন্তর্গত।[১] বিশ্বামিত্রের মূর্তিবহ পাঞ্জাবী ঔদুম্বরদের মুদ্রা, প্লিনির বিবৃতি এবং গুজরাতী ঔদুম্বর ব্রাহ্মণ-সংক্রান্ত সদ্যোক্ত তথ্যের সমবেত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে একথা বলা আজ আর অসঙ্গত হবে না, দূর অতীতে পাঞ্জাব থেকে যে- ঔদুম্বররা গুজরাতে বসতি স্থাপন করেছিলেন, কালক্রমে তাঁরা স্থানীয় জনপ্রবাহে মিশে গিয়ে স্বনামে নতুন এক ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন, সেই সঙ্গে গোত্রনামের মাধ্যমে আদিনিবাসের পূর্বপুরুষ ঋষি বিশ্বামিত্রের স্মৃতিকে কালোত্তীর্ণভাবে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস যথার্থভাবে লিখতে হলে প্রতিষ্ঠাপন্ন রাজদরবারের বাইরে চোখ ফেরাতে হবে, ইতিহাসে উপেক্ষিতদের কাহিনী উদ্ধার করতে হবে একাধিক উৎস থেকে—অভিলেখ-মুদ্রা-দেবপ্রতিমাদি প্রত্যক্ষ নিদর্শন ছাড়া গল্প-গাথা-কিংবদন্তী থেকেও ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহ করতে হবে। অর্থাৎ আমাদের একই সঙ্গে বহুমুখী উৎসসন্ধানে প্রবৃত্ত হতে হবে। বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য ও সংবাদকে যথাযথভাবে যাচাই করার পর পরীক্ষা-শুদ্ধ তথ্যগুলির সার্থক সমন্বয়ের মাধ্যমেই ইতিহাসের নির্মিতি-ব্রতের উদ্‌যাপন। ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক অঞ্চল এখনও অনাদৃত, পরিচিত রাজবৃত্তের বাইরে অগণ্য জনসাধারণ এখনও অবহেলিত। যে- চৌদ্দটি 'ট্রাইব' বা 'জনগোষ্ঠী' বর্তমান আলোচনার উপজীব্য, তাঁদের আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত রচনার কথা কেউ কোনদিন ভাবেন নি, অথচ প্রাচীন ভারতের একটি বিশেষ কাল-পর্বে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার পথ কণ্টকাকীর্ণ, কিন্তু শ্রম ও সাধনার দ্বারা সেই সব কাঁটাকে অসংখ্য গোলাপের অনুপম ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করা দুঃসাধ্য নয়।

১ রমেশচন্দ্র আচার্য রচিত এবং নবীনচন্দ্র আচার্য সম্পাদিত (বোম্বাই, ১৯৭০) পৃ. ৯। রমেশচন্দ্রের বইতে আমার মতের স্বীকৃতি আছে। এই পুস্তিকার প্রাসঙ্গিক অংশ পাঠে সাহায্য করেছেন আমার প্রাক্তন ছাত্রী (রাজনীতি বিভাগের) শ্রীমতী মায়া শাহ।

লেখালেখির প্রসঙ্গ, প্রাচীন ভারতে

বিবর্তনের পথে মানব-সভ্যতার একটি বড়ো আবিষ্কার লিপি। আবিষ্কারের প্রথম স্তরে মানুষ শব্দের মাধ্যমে নির্দেশিত বস্তুর রেখাচিত্র আঁকত, একে বলা যায় pictogram বা 'চিত্রলিপি'। দ্বিতীয় স্তরে আঁকত ideogram বা 'ভাবলিপি' অর্থাৎ নিজ নিজ দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে সুপ্রচলিত বিভিন্ন প্রতীকের সাহায্যে নির্দিষ্ট ভাব বা ঘটনাবলি বোঝাবার চেষ্টাতে এর উদ্ভব। তৃতীয় স্তরে এলো phonogram বা 'শব্দলিপি' : মানুষ তখন শব্দের প্রতীক রূপে সুনির্দিষ্ট চিহ্ন এঁকে ভাবকে প্রকাশ করতে শুরু করলো (অনেকটা আমাদের shorthand writing-এর চিহ্নের মতো)।[১] শেষ স্তরে শব্দের আদ্যধ্বনিকে বোঝাবার জন্য প্রতীক-চিহ্ন বা 'বর্ণ' ব্যবহৃত হতে থাকে। যেমন, হিব্রু 'আলেফ' (*āleph*) অর্থ বৃষ ; গ্রীকরা এইটিকেই পরে তাদের বর্ণমালার প্রথম বর্ণ *ālphā* হিসাবে গ্রহণ করেন। এই আদ্যধ্বনি নির্দেশিত হওয়ার পর থেকেই আস্তে আস্তে 'অক্ষরলিপি' (syllabic script) এবং 'বর্ণলিপি' (alphabetic script)-র উদ্ভব হলো। গ্রীক বর্ণমালার প্রথম বর্ণ *ālphā* এবং দ্বিতীয় বর্ণ *betā*, এ দুয়ের সংযোগে হলো *alphabetos*, লাতিন *alphabetum* এবং ইংরেজী *alphabet*। বলতে গেলে, পৃথিবীর কোন ভাষার বর্ণমালাই মানুষের উচ্চারিত সমস্ত ধ্বনিকে প্রকাশ করতে সমর্থ নয়।[২] এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালার সংখ্যা-বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য ; মিশরীয় বর্ণমালায় ২৪ বা ২৫টি বর্ণ, হিব্রুতে ২২, গ্রীকে ২৫, রোমকে ও ইংরেজীতে ২৬, ফরাসীতে ২৩, রাশিয়ানে ৪৮, আরবীতে ২৮, পারসীকে ৩১, সংস্কৃতে ৫০ ইত্যাদি। সংস্কৃত ভাষাতে মূল ধ্বনি ৫০টি, বর্ণমালার বর্ণসংখ্যাও ৫০, সে হিসাবে সংস্কৃতের বর্ণমালাকে (প্রাচীন কালে ব্রাহ্মী, একালে দেবনাগরী, বাংলা,

১ চিত্রলিপি, ভাবলিপি ও শব্দলিপির দৃষ্টান্ত মেলে যথাক্রমে উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের লিপিতে ; ইউকাটন ও গুয়াতেমালার মায়ালিপিতে, এবং প্রাচীন মিশরের হাইঅ্যারোগ্লিফিক লিপিতে।

২ দৃষ্টান্ত : বাংলায় দু'টি ধ্বনিই 'অ' বর্ণের মাধ্যমে ব্যক্ত হয় : অশোক, অতুল্য (ওতুল্য) ; ইংরেজীতে U একাধিক স্বরধ্বনির প্রতীক—*but* (বাট্), *put* (পুট), *dupe* (ডিউপ) ইত্যাদি।

গুজরাতী, মারাঠী প্রভৃতি ব্রাহ্মীর সন্ততিরা) অনেকে সর্বাধিক ধ্বনিবিজ্ঞান-সম্মত বলে মনে করেন।

অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে খ্রীস্টজন্মের তিন হাজার বছরেরও আগে মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে সুমেরবাসীরাই প্রথম লিপি ব্যবহার করে ; বাণমুখ অর্থাৎ তীরের ফলার মতো সুঁচলো দেখতে ছিল এই লিপি। সুমের-লিপির প্রভাবে মিশরীয় লিপির উদ্ভব, ৩০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে। মিশর লিপির প্রভাবের ফল ঈজিয়ানদের লিপি, যার প্রত্যক্ষগোচর প্রমাণ ক্রীট দ্বীপে আবিষ্কৃত ২০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের প্রাচীন মিনোআন লিপি-নিদর্শন। মিনোআন লিপির অল্পবিস্তর সমসাময়িক লিপিগুলি হলো : আনাতোলিয়ার হিত্তী (Hittite) সাম্রাজ্যে হিত্তী হাইঅ্যারোগ্লিফিক (Hieroglyphic বা শব্দলিপি) ও হিত্তী বাণমুখ লিপি, চীনদেশীয় লিপি, পশ্চিম ইরানের সুশা অঞ্চলে প্রচলিত আদি-এলামীয় (Proto-Elamite) এবং সিন্ধু-তীরবর্তী মহেঞ্জোদাড়ো, হড়প্পা প্রভৃতি স্থানের সিন্ধু-লিপি বা আদি-ভারতীয় (Proto-Indic) লিপি। এই সাতটি সুপ্রাচীন লিপির মধ্যে আদি-এলামীয়, মিনোআন ও সিন্ধু-লিপির পাঠোদ্ধার এখনও হয় নি।

সিন্ধু-লিপির আবিষ্কারের আগে ম্যাক্স মুল্যর, বার্নেল প্রমুখ বিগত শতকের প্রাচীতত্ত্বজ্ঞরা মনে করতেন, ভারতীয় লিপিকলার প্রাচীনত্ব খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম অথবা চতুর্থ শতকের আগে প্রসারিত করা সম্ভব নয়। তাঁদের পরে ভারতীয় লিপিকলা সম্পর্কে পথিকৃৎ গবেষক বুহলার সিদ্ধান্ত করেন, সর্বপ্রাচীন ভারতীয় লিপি অর্থাৎ 'ব্রাহ্মী'র বিবর্তন খ্রীস্টপূর্ব ৫০০ অথবা তারও আগে ঘটেছিল, সুতরাং ব্রাহ্মীর প্রবর্তন-কাল খ্রীস্টপূর্ব দশম শতকের কাছাকাছি সময়ে ধরা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, সিন্ধু-লিপির আবিষ্কারের ফলে তাঁদের এসব মত এখন পরিত্যক্ত। তবে এই সিন্ধু-লিপি থেকে ব্রাহ্মীর উদ্ভব কিনা অর্থাৎ সিন্ধু-লিপি ব্রাহ্মীর আদিরূপ কিনা সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায় নি।

॥ দুই ॥

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-ধৃত ঐতিহ্য থেকে ভারতীয় লিপিকলার প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হয়। নারদ-স্মৃতির (খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতক) সাক্ষ্যে এবং বৃহস্পতির উক্তিতে ('আহ্নিকতত্ত্বে' উদ্ধৃত) মনে হয় ভারতীয় সাহিত্যের

জন্ম-সময় থেকেই ভারতবর্ষে লেখার চল ছিল। বৃহস্পতির উক্তিতে আরও প্রমাণ হয়, লেখার সর্বপ্রাচীন এবং সর্বপ্রচলিত উপাদান ছিল তালপত্র, ভূর্জপত্র জাতীয় 'পত্র' বা পাতা। জৈন গ্রন্থ 'সমবায়াঙ্গসূত্র' ও 'প্রজ্ঞাপনাসূত্র' এবং বৌদ্ধ গ্রন্থ 'ললিতবিস্তর' লিপিকলার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সরব। মহাকবি কালিদাসও 'রঘুবংশে' বলেছেন, লিপিকলায় যথার্থ জ্ঞান থাকলেই সাহিত্যের বিরাট ভাণ্ডারের সামীপ্য লাভ করা যায়। ভারতীয় শিল্পকলার প্রাচীন নিদর্শনসমূহেও (যেমন, বাদামী-তে ব্রহ্মার ভাস্কর্যে) দেখা যায় তালপত্রের স্তবক বা গ্রন্থের প্রতীকের উপস্থিতি। সরস্বতীর হাতে বই থাকার রীতিও খুব প্রাচীন। সুতরাং ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ভারতে লিপিকলা অনেকদিন আগে থেকেই প্রচলিত ছিল ; প্রাচীন ভারতীয়রা সব জিনিস মুখস্থ করে রাখতেন, কিছুই লিখতেন না, এ ধারণা ঠিক নয়।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য নিয়ে আর একটু বিশদ আলোচনা করলে এ তত্ত্ব সপ্রমাণ হয়। রামায়ণে ও মহাভারতে, খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকেই যাদের মোটামুটি চেহারা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বলে ধরা হয়, 'লিখ', 'লেখ', 'লেখন' প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায় এবং ব্যাসদেব যে মহাভারত রচনার সময় গণেশকে লিপিকার হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন, এ কিংবদন্তী তো সর্বজনবিদিত। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' (খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতক), সূত্র-সাহিত্য (খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতক এবং দ্বিতীয় শতকের মধ্যবর্তী সময়ে যার উৎপত্তি ও বিবর্তন), পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' (আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতক), যাস্কের 'নিরুক্ত' (পাণিনির কিছু পূর্ববর্তী), 'উপনিষদ', 'আরণ্যক' ও 'ব্রাহ্মণ'সমূহ এমন কি চতুর্বেদের সাক্ষ্যেও লিপিকলার প্রাচীনত্ব নিরূপিত হয়। উপনিষদ, আরণ্যক ও ব্রাহ্মণসমূহের অধিকাংশই গদ্যে লিখিত। দার্শনিকতা-সমৃদ্ধ বা আচার-আচরণ সম্বলিত এই বিরাট গদ্য-সাহিত্যের পুরোটাই যে শুধুমাত্র স্মৃতির মাধ্যমেই বংশ-পরম্পরায় রক্ষিত হতো, এমন কথা মনে হয় না। শিক্ষণ ও স্মরণের জন্য অন্তত এদের কিছু অংশ লিখিত হতো, এমন ধারণা অস্বাভাবিক নয়। উপনিষদ-আরণ্যকের আগের যুগে অর্থাৎ বেদের সময়ও যে লেখার চল ছিল, এ কথা বেদ-সমূহের সাক্ষ্যেই মনে হয়। যেমন, ঋগ্বেদে (১০. ৬২. ৪) আছে, সাবর্ণি রাজা যে- একহাজার গরু দান করেছিলেন, তাদের কানে ৮ সংখ্যাটি লেখা ছিল। যজুর্বেদের 'বাজসনেয়ী সংহিতা'য় পুরুষমেধ-সংক্রান্ত লোক-জনদের মধ্যে গণক বা জ্যোতির্বিদ্‌কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তা ছাড়া 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'য় 'অন্ত' 'প্রার্ধ' প্রভৃতি বিরাট বিরাট সংখ্যা বা

'শতপথ ব্রাহ্মণে'র দিন-রাত্রির যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগ, বা ঋগ্বেদ যজুর্বেদে নানাবিধ ছন্দের উল্লেখ থেকে অনুমিত হয়, বৈদিক সাহিত্যের রচয়িতারা লিপিকলার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সূক্ষ্ম গাণিতিক হিসাব-নিকাশ (অন্ত =১,০০,০০,০০,০০,০০০ ; প্রার্ধ=১০,০০,০০,০০,০০,০০০) করতে হলে লিখতে জানা চাই, ছন্দ-মাত্রা-যতি ইত্যাদির তাত্ত্বিক বিচার লিপিকলার জ্ঞান ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। সাহিত্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান যাঁদের আছে তাঁরাই এ সব বিচার করতে পারেন এবং লিখিত সাহিত্য ছাড়া এ সব বিচার করবার মতো জ্ঞানার্জন অসম্ভব।

বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ ঘাঁটলেও ভারতীয় লিপিকলার প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ পালি-সাহিত্যের প্রাচীনতম স্তর মোটামুটিভাবে খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম এবং প্রথম শতাব্দীর মধ্যে রচিত বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। এই সাহিত্যে 'অক্ষরিকা' নামে এক ধরনের খেলার উল্লেখ পাওয়া যায় ; একজনের পিঠে আঙুল দিয়ে লেখা অক্ষর চেনা ও বলতে পারাই ছিল শিশুদের এই খেলার বিষয়। ভিক্ষুরা এ খেলা খেলতে পারত না। অন্য পক্ষে 'বিনয়পিটকে' লেখন বা লিপিকলাকে নির্দোষ গণ্য করে ভিক্ষুদের কাছে অনুমোদন করা হয়েছে। 'জাতক'সমূহে ব্যক্তিগত ও সরকারী চিঠিপত্র, রাজকীয় ঘোষণা, পত্রক বা পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি প্রসঙ্গেই শুধু লেখার উল্লেখ নেই, পরন্তু লেখার উপাদানরূপে 'বর্ণক' নামক দারু-ফলকেরও উল্লেখ আছে। 'মহাবগ্গে' লেখ অর্থাৎ লেখা, গণনা অর্থাৎ গণিতবিদ্যা এবং রূপ অর্থাৎ ফলিত গণিতবিদ্যা, বিশেষত মুদ্রা-সংক্রান্ত গণিতবিদ্যা, বিদ্যায়তনের পাঠ্যক্রম হিসাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। এদের পরবর্তী 'ললিতবিস্তর' নামক গ্রন্থে আছে, বুদ্ধদেব লিপিশালায় (অর্থাৎ যেখানে লিখতে শেখানো হতো) গিয়ে বিশ্বামিত্র নামক শিক্ষকের কাছে লিপিশিক্ষা করতেন। এ ভাবে বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের সাক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক যে, খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ এবং চতুর্থ শতকের মধ্যেই লিপিকলা সম্পর্কে ভারতবাসীরা উল্লেখ্যরকমের জ্ঞানার্জন করেছিল এবং খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের অনেক আগেই লিপিকলার প্রবর্তন হয়েছিল। জৈনদের গ্রন্থেও যে ভারতীয় লিপিকলার প্রাচীনত্বের কথা আছে, তার উল্লেখ কিছু আগেই করা হয়েছে।

শুধু ভারতীয় সাহিত্য নয়, আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের সময় যে কয়েকজন গ্রীক লেখক তাঁর সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন, তাঁদের রচনা থেকেও ভারতে লিপিকলার প্রাচীনত্বের প্রমাণ মেলে। আলেক-

জাণ্ডারের অন্যতম সেনাপতি নিয়ার্কাসের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ভারতীয়রা তুলো এবং ছেঁড়া কাপড় থেকে কাগজ তৈরি করতে জানতেন এবং তাঁরা কাগজ তৈরী করতেন, নিশ্চয়ই লেখার জন্য। মেগাস্থিনিসের বিবরণীতে রাস্তায় সরাইখানার দূরত্ব-নির্দেশক খোদাই-করা পাথরের উল্লেখ পাওয়া যায়। কুইণ্টাস কার্টিয়াস লেখার উপাদান হিসাবে এক ধরনের গাছের নরম ছালের কথা বলে গেছেন। কেউ কেউ কার্টিয়াস-প্রোক্ত এই ছালকে প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত ভূর্জপাতা বলে মনে করেন। গ্রীক লেখক ছাড়া চৈনিক পর্যটক য়ুয়ান চোয়াঙ এবং আরব পণ্ডিত অল-বিরূণীও ভারতীয় লিপিকলার প্রাচীনত্বের কথা বলে গেছেন। চৈনিক মহাকোষ 'ফ-ওয়ান-সু-লিন'-এ আছে, বাঁ দিক থেকে ডান দিকে লিখতে হয় যে-ব্রাহ্মী লিপি তা 'ফন' বা ব্রহ্মা কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং লিপি হিসাবে তা সর্বোত্তম।

॥ তিন ॥

এতক্ষণ শুধু গ্রন্থ-প্রমাণ বা পরোক্ষ প্রমাণের কথা বলা হলো। এবার প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রসঙ্গে আসা যাক। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ হলো লেখমালা। এরানে (সাগর জেলায়, মধ্যপ্রদেশ) আবিষ্কৃত একটি মুদ্রার লেখ, তক্ষশিলায় প্রাপ্ত মুদ্রার লেখ, মহাস্থানগড়ে (বগুড়ায়) প্রাপ্ত শিলালেখ, সোহগৌরায় প্রাপ্ত তাম্রলেখ, পিপরাওয়ায় আবিষ্কৃত বৌদ্ধ পাত্র-লেখ, বার্লিতে (আজমীঢ়ে) প্রাপ্ত লেখ ইত্যাদি অভিলেখসমূহ[১] এবং অশোকের লেখমালা থেকে সপ্রমাণ হয়, খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে লিপিকলা বর্তমান ছিল এবং ব্রাহ্মী লিপি নামক সে সময়কার এই লিপির বিবর্তন হতে নিশ্চয়ই আরো বেশ কয়েক শতক লেগেছিল। অশোকের লেখমালা এবং ইন্দো-গ্রীক (অর্থাৎ ভারতস্থ গ্রীক) রাজাদের মুদ্রা থেকে ব্রাহ্মীর সমকালীন খরোষ্ঠী লিপির প্রচলনের কথা জানা যায়। এটি দক্ষিণ থেকে বামে লেখা হতো এবং চলত প্রধানত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে। অশোকের মুখ্য শিলাভিলেখের (মেজর রক্ত এডিক্ট্স্) দু'টি সংস্করণ খরোষ্ঠীতে উৎকীর্ণ, পাওয়া গেছে পাকিস্তান-ভুক্ত ঐ অঞ্চলেই, শাহবাজগঢ়ী ও মানসেরা নামে দু'টি জায়গায়। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে ভারতবর্ষে খরোষ্ঠীর ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়।

১ নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও এগুলি অশোকের সময়ের কাছাকাছি খোদাই হয়েছিল বলে অনুমান করি, যদিও কোন কোন পণ্ডিত এদের খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে (২০০-১৫০) ফেলেছেন।

অশোকের লেখসমূহে অক্ষরগুলির আঞ্চলিক বৈচিত্র্য লক্ষ করে বুহলার বলেছেন যে, আঞ্চলিক চরিত্রের এত বিভিন্ন অক্ষর এবং দ্রুত-বহ (cursive) অক্ষরের আধিক্য এই কথাই প্রমাণ করে যে অশোকের সময়ের লিপিকলার ইতিহাস দীর্ঘদিনের এবং সেই সময়ে অক্ষরগুলি পরিবর্তনশীল স্তরে ছিল। একটি লেখতে অশোক বলছেন, অনুশাসন পাথরে খোদাই করার কারণ পাথর দীর্ঘস্থায়ী ; এ কথার তাৎপর্য, অচির-স্থায়ী জিনিসেও সে সময় লেখার কাজ চলত। বৌদ্ধ শ্রমণ ও সাধারণের পাঠ ও আবৃত্তির জন্য ধর্মশাস্ত্রসমূহও যে অশোক নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন তা তাঁর আর-একটি শিলালেখ থেকে জানা যায় এবং ঐ ধর্মশাস্ত্রসমূহ নিশ্চয়ই পাতা, গাছের ছাল, কাগজ ইত্যাদিতে লেখা হতো। যাঁরা প্রশ্ন করেন, ভারতবর্ষে লিপিকলার ইতিহাস খুব প্রাচীন হলে তার নিদর্শন পাওয়া যায় না কেন তার উত্তরও এখানেই নিহিত। অর্থাৎ পাতা, গাছের ছাল ইত্যাদি বিনাশশীল পদার্থ বলেই তাদের উপর কোন সুপ্রাচীন নিদর্শন পাওয়া সম্ভব হয় নি। তা ছাড়া, প্রাচীন ভারতে বিশেষত বৈদিক যুগে স্মৃতিশক্তির উপর জোর দেওয়া হতো। শাস্ত্র-পারঙ্গমতা বলতে তখনকার দিনের ভারতীয়রা বুঝতেন, অধীত শাস্ত্রে স্মৃতিনির্ভরতা। যাজ্ঞবল্ক্য-শিক্ষায় লিখিত শাস্ত্র দেখে শিক্ষাদান অসম্মানজনকরূপে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু স্মৃতি-নির্ভর ছিলেন বলে ভারতীয়রা শাস্ত্রাদি লিখতেন না বা লিখতে আদৌ জানতেন না, এটা কোন যুক্তি নয়। সদ্যোক্ত যাজ্ঞবল্ক্য-শিক্ষা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

উপরি-উল্লিখিত পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণসমূহ—ভারতীয় সাহিত্য-প্রসঙ্গ ও বিদেশীদের বিবরণী-প্রসঙ্গ এবং লেখমালা—থেকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে, ভারতবর্ষে লিপিকলার ইতিহাস যথেষ্ট প্রাচীন।

॥ চার ॥

কিন্তু সেই প্রাচীন যুগে লেখালেখির কাজ কিসে হতো ? সেকালে বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে লেখার জিনিস ঠিক করা হতো। সাধারণ চিঠি বা বইপত্র লেখার জন্য খুব একটা টেকসই জিনিস ব্যবহৃত হতো না, কিন্তু রাজরাজন্যদের গুণাবলির বিবরণ অর্থাৎ প্রশস্তি, সরকারী আদেশ, দানপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি স্বভাবতই তামা, রুপো, লোহা বা পাথরের মতো টেকসই ও শক্ত জিনিসে খোদাই করা হতো। এদের মধ্যে পাথরের ব্যবহার খুব পুরানো। সহজলভ্য এবং সেই সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার ফলে

পাথর একেবারে গোড়া থেকেই লেখার উপকরণ হিসাবে চলে আসছে। পাথর ছেঁচে মসৃণ করে, পাথরের স্তম্ভ, পাথরের মূর্তির পায়ের নিচে বা মূর্তির পিছনে, মন্দিরের গায়ে বা গুহায় সাধারণত জরুরি রাজাদেশ, বা প্রশস্তি, কোন দান বা উৎসর্গ ইত্যাদি বিষয় লেখা হতো। বলা বাহুল্য, এখনও অনেক সময় পাথরের উপর দরকারী বা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস লেখা হয়ে থাকে। বিখ্যাত ও প্রাচীন দৃষ্টান্ত হিসাবে সম্রাট অশোকের লেখমালার কথা বলা যায়। অশোকের অনুশাসন পাথরে লেখা এবং পাথরের একটি স্তম্ভলিপিতে তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি তাঁর বাণীগুলি পাথরে খোদাই করে রাখছেন যাতে তারা অনেক দিন স্থায়ী হয়।

ইঁটের উপরও লেখায় চল ছিল সে সময়। মেসোপটেমিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার মতো অতটা না হলেও, ইঁটের উপর লেখার কিছু নিদর্শন ভারতবর্ষে পাওয়া গেছে। মথুরা মিউজিয়ামে এ ধরনের কিছু প্রাচীন নিদর্শন (কয়েকটি খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর) সংরক্ষিত হয়েছে। এ ছাড়া মাটির পাত্র বা ফলকেও লেখার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। ইঁট বা মাটির পাত্র ইত্যাদি আগুনে পোড়াবার আগে নরম থাকতে থাকতে লেখা খোদাই করে নেওয়া হতো।

পাথরের মতো দীর্ঘস্থায়ী বলে লেখন-সামগ্রী হিসাবে ধাতুরও কদর ছিল যথেষ্ট। ধাতুর মধ্যে ছিল সোনা, রুপো, তামা, লোহা, পিতল ইত্যাদি। দামী বলে সোনার চল খুবই অল্প ছিল। তক্ষশিলার কাছে সোনার উপর একটি লেখা পাওয়া গেছে। ব্রহ্মদেশেও সোনার উপর লেখার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। রুপোর উপর লেখার একটি সুপ্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে দক্ষিণ ভারতের ভট্টিপ্রোলুতে এবং অন্যটি তক্ষশিলাতে। ধাতব দ্রব্যের মধ্যে সব চাইতে প্রচলিত ছিল তামা। তামার উপরেই তখন বেশিরভাগ দরকারী বিষয় লেখা হতো। লেখার বিষয়ানুসারে ক্ষোদিত তামার পাতটিকে তাম্রপট্ট, তাম্রপত্র, তাম্রশাসন ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হতো। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকে ফা-হিয়েন নামে একজন চৈনিক পর্যটক ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি লিখে গেছেন যে তিনি বৌদ্ধ বিহারে তামাতে খোদাই-করা জমি ইত্যাদির দানপত্র দেখেছিলেন এবং এই সমস্ত দানপত্রের কয়েকটি নাকি বুদ্ধের সময়কার। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকের চৈনিক পর্যটক য়ুয়ান চোয়াঙও লেখার উপকরণ হিসাবে তামার ব্যবহারের কথা বলে গেছেন। এখনও পর্যন্ত

সর্বপ্রাচীন তাম্রলেখ বা তামার উপর যে- লেখ-নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা হলো মৌর্য যুগের। এই তাম্রলেখটি উত্তর প্রদেশের, সোহগৌরা নামক স্থানে (প্রকৃতপক্ষে এটি ব্রোঞ্জ, বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত) আবিষ্কৃত হয়েছে। লেখার জন্য আলাদাভাবে পিতল খুব একটা ব্যবহৃত হতো না। পিতলের উপর যা কিছু লেখা পাওয়া গেছে তার প্রায় সবই পিতলের মূর্তির পাদদেশে বা পিছনে উৎকীর্ণ। এই সমস্ত মূর্তির মধ্যে সবচাইতে পুরানো যেগুলি, সেগুলি খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর। আবু পাহাড়ের জৈন মন্দিরগুলিতে কয়েকটি পিতল-লেখ পাওয়া গেছে। অন্যান্য ধাতুর মধ্যে লোহা ও টিনের উল্লেখ করা যায়। যুদ্ধে বা অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনে লোহার খুব চল থাকলেও লেখার জন্য বিশেষ ব্যবহৃত হতো না। লোহার উপর লেখার সর্বপ্রাচীন নিদর্শন হলো দিল্লীর মেহরৌলি লৌহস্তম্ভের উপর গুপ্ত যুগের হরফে লেখা চন্দ্র নামক রাজার প্রশস্তি। এই স্তম্ভলেখটি সম্পর্কে সব চাইতে বড় কথা এই যে, প্রায় দেড়হাজার বছরেও এটির উপর কোনরকম মরিচা পড়ে নি। এ ছাড়া খ্রীস্টীয় পনেরো-ষোল শতকের আরও কয়েকটি লৌহলেখের কথা বলা যায়। টিন ভারতবর্ষে দুর্লভ ছিল বলে টিনের উপর লেখাও খুব দুষ্প্রাপ্য। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত টিনের উপর লেখা একটি বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপিই টিন-লেখর অনন্য নিদর্শন হিসাবে পরিগণিত। কখনও কখনও অন্য ধাতুর সঙ্গে টিনের মিশ্রণ ঘটিয়ে মুদ্রা তৈরি হতো, এই ধরনের প্রাচীন মুদ্রাগুলির উপর উৎকীর্ণ লেখাবলির উল্লেখ এ প্রসঙ্গে করা যেতে পারে।

ধাতব দ্রব্য ছাড়া তালপাতা ও ভূর্জ বৃক্ষের ভিতরকার ছাল অন্যতম লেখন-সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হতো এবং প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতে এ দু'টি জিনিসই ছিল লেখার সর্বপ্রচলিত উপকরণ। চীন-দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থকার হুই-লির লেখা য়ুয়ান চোয়াঙের জীবনীতে আছে, বুদ্ধের নির্বাণের পরে অনুষ্ঠিত প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বা পিটকগুলি তালপত্র বা তাড়পত্রে লেখা হয়েছিল। সে যাই হোক, এখনও পর্যন্ত তালপাতায় লেখা প্রাচীনতম পুঁথি যা পাওয়া গেছে তা হলো আনুমানিক খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের। কাশগড়ে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি, জাপানে খ্রীস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকের দু'টি (হোরিয়ুজি মন্দিরে রক্ষিত) এবং নেপালে কাঠমণ্ডুতে খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকের একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, তালপাতার পুরানো পুঁথির বেশির ভাগ গ্রীষ্মপ্রধান ও শীতপ্রধান দেশে এবং ভারতবর্ষের

অনুরূপ অঞ্চলে পাওয়া গেছে। আর্দ্র ও উষ্ণ আবহাওয়ায় পুঁথি বেশি দিন টেঁকে না বলে দক্ষিণ ভারতে পনেরো শতকের আগে কোন পুঁথি পাওয়া যায় নি।

কি করে তালপাতায় লেখা হতো সে সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। তালপাতাগুলি প্রথমে রোদ্দুরে শুকিয়ে নিয়ে তারপর জলে ফুটিয়ে কিংবা শুধু ভিজিয়ে নেওয়া হতো। ঐ ভিজে পাতা আবার রোদ্দুরে শুকিয়ে নেওয়ার পর একটি মসৃণ পাথর কিংবা শাঁখ দিয়ে চেঁছে মসৃণ করে নেওয়া হতো। তারপর তার উপর লেখা হতো হয় কালি কলম দিয়ে নয়তো লৌহকীলক বা স্টাইলাস দিয়ে। স্টাইলাস ব্যবহৃত হলে পাতাগুলি খোদাই করা হয়ে যাবার পর কাঠকয়লার গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হতো কিংবা ভুষি মাখিয়ে নেওয়া হতো, ফলে অক্ষরগুলি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠত।

তালপাতার মতো ভূর্জপত্র বা ভূর্জবৃক্ষের ভিতরকার ছাল লেখার উপকরণ হিসাবে বহুলপ্রচলিত ছিল। হিমালয় অঞ্চলে ভূর্জবৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। ভূর্জপত্রে লেখার চল ঐ অঞ্চলেই প্রথম হয়েছিল এবং ক্রমে তা ভারতবর্ষের অন্যত্র এমন কি মধ্য-এশিয়াতেও ছড়িয়ে পড়ে। এখানে বলা প্রয়োজন, তাল গাছের প্রাচুর্যের ফলে দক্ষিণ ভারতে ভূর্জ-পত্র কখনো জনপ্রিয় হতে পারে নি এবং দক্ষিণ ভারতের লোকেরা বলতে গেলে বরাবরই তালপাতায় লেখাপড়ার কাজ করতেন।

কুইণ্টাস কার্টিয়াস নামক গ্রীক লেখকের কথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি তাঁর বিবরণীতে লেখার উপাদান হিসাবে এক ধরনের গাছের নরম ছালের কথা বলেছেন। তাঁর বর্ণিত এই গাছের ছাল ভূর্জপত্র হওয়া অস্বাভাবিক নয়। নিয়ার্কাসের উক্তিও আবার স্মরণ করা যায়। তিনি বলেছেন, সেকালে ভারতীয়রা সুতির কাপড়ে ও কাগজে (তুলো ও ছেঁড়া কাপড় থেকে তৈরি হতো) লিখতেন। ভারতীয় লেখকদের মধ্যে অমর রচিত অভিধান 'অমরকোষে' ও কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে' ভূর্জপত্রের উল্লেখ আছে। একাদশ শতাব্দীর আরবদেশীয় লেখক অল-বিরূণীও (যিনি সুলতান মামুদের সঙ্গে ভারতবর্ষে এসেছিলেন) বলে গেছেন, মধ্য ও উত্তর ভারতের লোকেরা ভূর্জপত্রে লিখতেন। তালপাতার মতো ভূর্জপত্রও লেখার উপযোগী করার জন্য মসৃণ করে নেওয়া হতো। তারপর তাদের উপর তেল মাখিয়ে নিয়ে বিশেষ ধরনের কালিতে শরের কলম দিয়ে লেখা হতো।

ভারতীয় ভাষা ও অক্ষরে লেখা ভূর্জপত্রের প্রাচীনতম পুঁথি খোটান

থেকে পাওয়া গেছে। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের দিকে এ লেখা হয়েছিল। ভূর্জপত্রের প্রাচীন পুঁথি বলতে গেলে বেশির ভাগই পাওয়া গেছে নিয়া, খোটান প্রভৃতি মধ্য-এশিয়ার অঞ্চলগুলিতে; এবং বালি ও পাথরের তলায় চাপা থাকার ও শুকনো আবহাওয়ার দরুণ ঐ সব জায়গা থেকে এত পুরানো পুঁথি পাওয়া সম্ভব হয়েছে। পনেরো ও তার পরবর্তী সময়ের বেশির-ভাগ ভূর্জপত্রের পুঁথি কাশ্মীর থেকে এসেছে। এখানে উল্লেখ্য, পুঁথি, পুস্তক, গ্রন্থ ইত্যাদি শব্দের উৎপত্তি তালপাতা বা ভূর্জপত্রের পাণ্ডুলিপি থেকেই। ভূর্জপত্র বা তালপাতাগুলি মাঝখানে, একদিকে কিংবা দু দিকে ফুটো করে সুতোর সাহায্যে গ্রন্থিত করে অর্থাৎ বেঁধে রাখা হতো। প্রত্যেকটি পাতায় যথাযথ সংখ্যা নির্দেশ করে দু'টি কাঠ বা কোন ধাতুর লম্বা টুকরোর মধ্যে পাতাগুলি শক্ত করে বেঁধে রাখা হতো।

তালপাতা ভূর্জপত্র ছাড়া কাগজ, সুতির কাপড়, কাঠের ফলক এবং চামড়াও লেখার কাজে ব্যবহৃত হতো। ভারতীয়গণ কর্তৃক কাগজ ব্যবহারের প্রাচীন উল্লেখ যে নিয়ার্কাসের বিবরণীতে মেলে, এ কথা ইতিপূর্বে বলেছি। মধ্য-এশিয়ার কাশগড় ও কুজিয়ের থেকে কাগজে লেখা পাণ্ডুলিপির প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে, যদিও গুপ্ত যুগের লিপিতে লেখা পঞ্চম শতকের এই পাণ্ডুলিপির কাগজ যথার্থই ভারতে উৎপন্ন কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। ভারতবর্ষে প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন কাগজের পুঁথি হলো চোদ্দ-পনেরো শতকের। ভারত-বর্ষে খুব পুরানো পুঁথি না পাওয়ার কারণ, ভারতবর্ষের আর্দ্র জলবায়ু এবং সেই সঙ্গে কাগজের অচিরস্থায়ী ধর্ম। ভাতের বা গমের মণ্ড খুব পাতলা করে কাগজের উপর দিয়ে তা শুকিয়ে নেওয়া হতো এবং পরে শাঁখ ইত্যাদির সাহায্যে মসৃণ করে নিয়ে তাতে লেখা হতো। কালি চুপসে গিয়ে যাতে কাগজ নষ্ট করে না দেয়, তার জন্যই ছিল এই ব্যবস্থা। লেখার পর পাতাগুলি মাঝখানে ফুটো করে সুতোর সাহায্যে বেঁধে রাখা হতো। লেখন-সামগ্রী হিসাবে কাগজের পরেই ছিল সুতির কাপড়। এখন যেমন সেকালেও বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠান পালা-পার্বণে লেখার জন্য কাপড় ব্যবহৃত হতো। লেখার জন্য ব্যবহৃত কাপড়কে বলা হতো পট, পটিকা বা কার্পাসিক-পট। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ও লেখমালায় পটের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাপড়ের উপর লেখার প্রাচীন নিদর্শন হলো চোদ্দ-পনেরো শতকের একটি জৈন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। শৃঙ্গেরী মঠ থেকে শ' দুই-তিন বছর আগেকার সুতির

কাপড়ে লেখার নিদর্শন পাওয়া গেছে। যশলমীর অঞ্চলে জার্মান পণ্ডিত বুহলার রেশমের উপর পুরানো লেখার নিদর্শন আবিষ্কার করেছিলেন। কাগজের মতো লেখার কাপড়ের উপরেও ভাতের অথবা গমের মণ্ড খুব পাতলা করে ঢেলে দিয়ে কাপড়টাকে শুকিয়ে নেওয়া হতো এবং পরে তাকে মসৃণ করে লেখার উপযোগী করে নিয়ে কালো কালিতে লেখা হতো। যে- কারণে খুব পুরানো কাগজের পুঁথি পাওয়া যায় নি সেই কারণেই প্রাচীন কাপড়ের পুঁথিও দুর্লভ। জলবায়ুর কারণ ছাড়া কাগজ ও কাপড় উভয়েই উইপোকার প্রিয় খাদ্য।

প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বিনয়পিটক এবং জাতকে লেখার উপকরণ হিসাবে কাঠের উল্লেখ আছে। লেখার কাঠকে বলা হতো 'ফলক' এবং কয়েকটি জাতক থেকে জানা যায় তরুণ শিক্ষার্থীরা এই ফলকে অক্ষর লেখা অভ্যাস করতো। ললিতবিস্তরে আছে, বিদ্যালয়ে চন্দনকাঠের ফলক শ্লেটের মতো ব্যবহৃত হতো। 'কাত্যায়নস্মৃতি', 'দশকুমারচরিত' প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-গ্রন্থে লেখার জন্য ব্যবহার্য কাষ্ঠফলকের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। আসাম থেকে পাওয়া একটি লিখিত কাষ্ঠফলক য়ুরোপের একটি গ্রন্থাগারে রয়েছে। ভারতবর্ষে লিখিত কাষ্ঠফলকে পুরানো লেখার নিদর্শন খুব কমই আবিষ্কৃত হয়েছে। অন্ধ্র প্রদেশের শালিহুণ্ডমে শঙ্খের উপর লেখার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে।

লেখার উদ্দেশ্যে পশুচর্মের ব্যবহার প্রাচীন ভারতবর্ষে বিশেষ ছিল না। এর কারণ হরিণের বা বাঘের চামড়া ছাড়া অন্যান্য জন্তুর চামড়া ভারতীয়রা অপবিত্র জ্ঞান করতেন ; ফলে লেখার মতো পবিত্র বিষয়কে তাঁরা চামড়ার সঙ্গে যুক্ত করতেন না। হরিণের চামড়ায় লেখার প্রথার উল্লেখ 'বাসবদত্তা' নামে একটি পুরানো সংস্কৃত গ্রন্থে বর্তমান। চামড়ায় লেখা খুব পুরানো কোন পাণ্ডুলিপি আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে পাওয়া যায় নি। কাশগড়ে অবশ্য চামড়ার উপর ভারতীয় লিপিতে লেখার নিদর্শন পাওয়া গেছে ; তবে তা যে ভারতবর্ষ থেকে ওখানে গিয়েছিল এমন কোন প্রমাণ নেই, কারণ নিয়া, কাশগড়, খোটান প্রভৃতি মধ্য-এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় লিপির চল ছিল।

॥ পাঁচ ॥

এ তো গেল কিসের উপর লেখা হতো তার বিবরণ। এখন কি কি জিনিস দিয়ে এ সবের উপর লেখা হতো সে- কথা বলা যাক।

কালি আর কলম বা তজ্জাতীয় জিনিস ছাড়া লেখা সম্ভব নয়। সুতরাং ভারতীয়রা কেমন কালি আর কলম ব্যবহার করতেন ?

যে- জিনিসের উপর লেখা হবে, তার প্রকৃতির উপর কালি ও কলমের প্রকৃতি নির্ভর করে। সুতরাং একালের মতো সেকালেও পাথর, ইঁট বা ধাতব দ্রব্যে লিখতে হলে খোদাই করার প্রয়োজন হতো ; এবং সে ক্ষেত্রে কালি বা কোনরকম রঙের প্রয়োজন হতো না। আর কলমের পরিবর্তে লৌহকীলক বা বাটালি অক্ষর খোদাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হতো। অন্য-পক্ষে ভূর্জপত্র, তালপত্র, কাগজ, কাপড় ইত্যাদি নরম জিনিসে কলম, কালি বা রঙের সাহায্যে লেখা হতো।

লেখার কালিকে তখনকার দিনে বলা হতো 'মসি' বা 'মসী' (বানানান্তরে 'মষি' বা 'মষী') এবং 'মেলা'। মসী শব্দের অর্থ যা গুঁড়ো করা হয় এবং কালি তৈরির উপাদানগুলিকে ভালো করে গুঁড়ো করে কালি তৈরি হতো বলে কালি 'মসী' নামে কথিত হতো। ভারতবর্ষের কোন কোন জায়গায় এখনও কালি বোঝাতে 'মেলা' কথাটার চল আছে। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত গ্রীক 'মেলস' শব্দ থেকে 'মেলা'র উৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন ; বুহলার বাংলা 'ময়লা' শব্দ থেকে 'মেলা'র উৎপত্তি হয়েছে বলে অনুমান করেন। অন্যান্য পণ্ডিতরা সংস্কৃত 'মেল্' ধাতু থেকে 'মেলা' নিষ্পন্ন হয়েছে বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন, কালি তৈরি করতে হলে অনেক জিনিস মেশাতে হয়, সুতরাং 'মেল্' ধাতু, যার অর্থ মিশ্রণ, তা থেকেই 'মেলা'র উৎপত্তি সম্ভব। কালি অর্থে 'মেলা'র উল্লেখ সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'য় পাওয়া যায়। কালির পাত্র বা দোয়াতকে সংস্কৃতে 'মেলামন্দা', 'মেলানন্দু' 'মসিপাত্র', 'মসিভাণ্ড', 'মসিকূপিকা' ইত্যাদি বলা হতো। নিয়ার্কাস, কুইণ্টাস কার্টিয়াস প্রমুখ গ্রীক লেখকদের বিবরণী পড়ে মনে হয়, তখনকার দিনে লেখার জন্য কালি বা তজ্জাতীয় কোন রং ব্যবহৃত হতো ; বুহলার অশোকের কোন কোন লেখতে বৃত্তাকার গ্রন্থির পরিবর্তে বিন্দুজাতীয় দাগ দেখে অনুমান করেছেন, খোদাই করার আগে লেখার পুরো বিষয়টা কালিতে লিখে দেওয়া হতো। কালিতে লেখার প্রাচীনতম নিদর্শন এসেছে ভিলসার কাছে আন্ধের-এর একটি স্তূপ থেকে, কারো কারো মতে এই স্তূপ আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর। খোটানে প্রাপ্ত খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের পাণ্ডুলিপিতে কালির ব্যবহার দেখা গেছে। ঐ সময়কার কালিতে লেখা কয়েকটি ভূর্জপত্র ও মাটির পাত্র আফগানিস্তানেও পাওয়া গেছে। অজন্তা গুহায় কয়েকটি অঙ্কিত লেখার নিদর্শন দৃষ্ট হয়েছে।

প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন রঙের কালির মধ্যে কালো কালিই সবচাইতে বেশি প্রচলিত ছিল। কাঁচা এবং পাকা দু'রকম রঙের কালিরই ব্যবহার ছিল। আটা, চিনি ইত্যাদি চটচটে জিনিসের সঙ্গে কাঠকয়লার গুঁড়ো জলে গুলে কাঁচা রঙের কালি তৈরি করা হতো। অন্যপক্ষে ভুষি, সোহাগা ইত্যাদির সঙ্গে লাক্ষা জলে ফুটিয়ে পাকা কালি তৈরি করা হতো। কাশ্মীরে গোমূত্রে কাঠকয়লার গুঁড়ো ফুটিয়ে কালি তৈরি হতো এবং এইজাতীয় কালি অনেকদিন অক্ষত থাকত। দক্ষিণ ভারতে কালির চল হতে সময় লেগেছে। ভুষি বা কাঠকয়লার গুঁড়োই সেখানে কালির কাজ করতো। কালো ছাড়া লাল রঙের কালি লেখার কাজে বহুল ব্যবহৃত হতো। অলক্তক ও হিঙ্গুল থেকে লাল কালি তৈরি হতো। কখনও কখনও সবুজ ও হলদে রঙও ব্যবহৃত হতো। অনেক জৈন লেখক সবুজ ও হলদে কালি পছন্দ করতেন এবং বইয়ের শেষ দিকটা সবুজ ও হলদে কালিতে লিখতেন। চিত্রাবলিতে লেখার উদ্দেশ্যে বা পবিত্র পাণ্ডুলিপি তৈরি করার সময় বা ধনী ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য বই লিখবার সময় সোনালি এবং রুপোলি কালির উল্লেখ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে আছে বটে, কিন্তু তাতে লেখা পুঁথির যা নিদর্শন পাওয়া গেছে তার বয়স খুব বেশি নয়। প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা দেখাবার জন্য অনেকে তাঁদের প্রতিজ্ঞার বিষয় স্বীয় রক্তে লিখতেন বলে জানা যায়। তবে সে রকম ঘটনা বিশেষ ঘটত না।

এবার কলমের প্রসঙ্গে আসা যাক। সাধারণভাবে কলমকে বলা হতো 'লেখনী'। রামায়ণ ও মহাভারতে লেখনীর উল্লেখ আছে। এখানে বলা দরকার যে, লেখার যন্ত্রমাত্রেই—তা সে বাটালি, শরের বা খাগের কলম, তুলি বা পেন্সিল যাই হোক না কেন—লেখনী নামে অভিহিত হতো। এর কারণ লেখা বলতে তখনকার দিনের লোকেরা আজকের মতো শুধু কাগজের উপর লেখা বুঝতেন না, পাথর বা ধাতব দ্রব্যে খোদাই করাও বুঝতেন। লেখনী ছাড়া 'বর্ণক' বা 'বর্ণিকা', 'বর্ণবর্তিকা', 'তুলি' বা 'তুলিকা', 'শলাকা' প্রভৃতি ছিল কলমের অন্যান্য নাম। এখনকার মতো সে যুগেও কম্পাস ও রুলার ব্যবহৃত হতো।

সংস্কৃত নয়, দেবনাগরী

ছেলেবেলায় একবার সংস্কৃতের প্রশ্নপত্র প্রসঙ্গে সংস্কৃত হরফ বলতে পণ্ডিতমশায় ভুল শুধরে দিয়েছিলেন। যে-হরফে প্রশ্নপত্র ছাপা হয়েছিল, সেটার নাম যে নাগরী বা দেবনাগরী তাঁর কাছেই জেনেছিলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নাগরী আর দেবনাগরীর মধ্যে তফাৎ আছে কি না। উত্তরে পণ্ডিতমশাই দু'টিকে অভিন্ন বলেছিলেন, এবং ব্রাহ্মণ বলেই হয়তো দেবনাগরীর প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল।

আজ এই মধ্য-বয়সেও অনেক শিক্ষিত সংস্কৃতিবানের মুখে আমার ছেলেবেলাকার ভুলটি শুনতে পাই। দেবনাগরীর পরিবর্তে তাঁরা স্বচ্ছন্দে সংস্কৃত অক্ষর বলে থাকেন। কারণটি, বলা বাহুল্য, মনস্তাত্ত্বিক। সংস্কৃতের সঙ্গে দেবনাগরীর সম্পর্ক পুরানো ও প্রায়-অচ্ছেদ্য, সেজন্য সংস্কৃতের অনুষঙ্গে দেবনাগরীর কথা আলাদাভাবে সব সময় তাঁদের আর মনে আসে না, ভাষার নামটি তাঁরা সহজেই লিপির ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। তাঁরা হয়তো বলবেন, যে-লিপিতে আমাদের স্কুল-কলেজের পাঠ্য বই বা প্রশ্নপত্র ছাপা হয়, তাকে সংস্কৃত লিপি বা সংস্কৃত হরফ বললে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়?

মহাভারত অশুদ্ধ না হলেও ইতিহাস অশুদ্ধ হয় বৈকি। অশুদ্ধ হয় লিপিবিজ্ঞান, অস্বস্তি বোধ করেন লিপিশাস্ত্রী। সংস্কৃত একটি ভাষার নাম, নাগরী একটি লিপির। বাংলা, তামিল, তেলুগু প্রভৃতি লিপি যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের বাহন হতে পারে, তেমনই ঐ সব ভাষার বই-পত্র অনায়াসে দেবনাগরীতে লেখা বা ছাপা যেতে পারে। ভারতের প্রধান ভাষাগুলির নিজস্ব লিপি আছে, বাংলার বাংলা, গুজরাতীর গুজরাতী, তামিলের তামিল ইত্যাদি। হিন্দীর লিপি নাগরী, সংস্কৃতেরও তা-ই। নাগরী লিপি শুধু উত্তর ভারতেই নয়, দক্ষিণ ভারতেও সংস্কৃতের প্রধানতম বাহন।

॥ দুই ॥

অন্যান্য ভারতীয় লিপির মতো নাগরীর উদ্ভব প্রাচীনতম ব্রাহ্মীলিপি[১]

১ ব্রাহ্মীর সমকালীন আর-একটি প্রাচীন লিপি খরোষ্ঠী, দক্ষিণ থেকে বামে লেখা হতো। এটি চলত প্রধানত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে, অশোকের মুখ্য

থেকে। মহেঞ্জোদাড়ো, হড়প্পা প্রভৃতি সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত মুদ্রা বা সীলমোহরে উৎকীর্ণ লিপির (এখনও এর পাঠোদ্ধার হয় নি) বিবর্তনের ফলে ব্রাহ্মীর উৎপত্তি বলে অনেকের অনুমান। এখনকার বেশির ভাগ লিপির মতো ব্রাহ্মীও লেখা হতো বাম থেকে দক্ষিণে। ব্রাহ্মীর সর্বপ্রাচীন নিদর্শন সম্রাট অশোকের লেখমালায়, খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এগুলি ক্ষোদিত হয়েছিল। অশোকের আমল থেকে খ্রীস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত নানা পর্যায়ী বিবর্তনের পথে ব্রাহ্মী লিপি অধিকাংশ আঞ্চলিক লিপির আত্মবিকাশের পথ প্রস্তুত করে; এবং মোটা-মুটিভাবে বলতে গেলে সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও অষ্টম শতকের সূচনাতে এই সব আঞ্চলিক লিপির চেহারায় নিজস্বতা প্রকাশ পেতে থাকে এবং একাদশ-দ্বাদশ শতকের মধ্যেই এদের রূপ-চারিত্র্য সুস্পষ্ট হয়।

সপ্তম-অষ্টম শতকের শিলালেখ, তাম্রপট্ট, দানপত্র ইত্যাদিতে উৎকীর্ণ লিপিগুলিকে পুরোপুরি আঞ্চলিক না বলে আদি-আঞ্চলিক বা প্রোটো-রিজিওন্যাল অভিধায় চিহ্নিত করা বাঞ্ছনীয়, কারণ অঞ্চল-ভেদে এদের নিজস্ব চেহারার দেখা মেলে আরও দু-তিনশ বছর পরে। অধ্যাপক আহমদ হাসান দানি[১] আদি-আঞ্চলিক লিপিগুলিকে নয়টি উপবিভাগ সহ চারটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করেছেন: উত্তর ভারতের লিপি, গুজরাত-রাজস্থান-মধ্য ভারতের লিপি, দাক্ষিণাত্যের লিপি এবং দক্ষিণের অর্থাৎ তামিলনাড়ু-কেরলের লিপি। তাঁর মতে, খ্রীস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে কুষাণবংশীয় রাজাদের আমলে মথুরা ও তার আশপাশে প্রচলিত লিপি-শৈলী চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত নরপতিদের রাজত্বকালে রূপান্তরিত হয় এবং পরে সম্রাট হর্ষবর্ধনের (৬০৬-৪৭) সময়ে রাজস্থানী শৈলীর (রাজস্থান-মালব অঞ্চলে প্রচলিত) সঙ্গে সমন্বিত হলে কুষাণ-গুপ্ত যুগের ব্রাহ্মী লিপির চেহারায় লক্ষণীয়রকমের বদল ঘটে। এই পরিবর্তিত

শিলাভিলেখের (মেজর রক এডিক্‌ট্‌স্) দু'টি সংস্করণ খরোষ্ঠীতে উৎকীর্ণ; এগুলি পাওয়া গেছে বর্তমান পাকিস্তান-ভুক্ত ঐ অঞ্চলেই, শাহবাজগঢ়ী ও মানসেরা নামে দু'টি জায়গায়। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে ভারতবর্ষে খরোষ্ঠীর ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। ব্রাহ্মীর মতো খরোষ্ঠী কখনও সর্বভারতীয় লিপির মর্যাদা পায় নি, তবে ব্রাহ্মীর মতো এ লিপিও বহির্ভারতে প্রসার লাভ করেছিল। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া এবং চীনীয় তুর্কিস্তানে খরোষ্ঠীতে লেখা বহু প্রাচীন ভারতীয় দলিল ও পুঁথিপত্র পাওয়া গেছে।

১ *Indian Palaeography* (Oxford, 1963), pp. 109-113.

চেহারার পরিচয় উত্তরপ্রদেশের দেরাদুন জেলার লাখামণ্ডল গ্রামে প্রাপ্ত সপ্তমান্তিক অথবা অষ্টম শতকের অভিলেখতে পাওয়া যায়। এবং শুধু লাখামণ্ডল লেখতেই নয়, স্বয়ং হর্ষবর্ধনের মধুবন ও বাঁশখেরা দানপত্রেও এ পরিচয় আভাসিত। বাঁশখেরা তাম্রপটের অক্ষরগুলি নিপুণভাবে ক্ষোদিত, ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যোজিত আ-কার, ই-কার-আদি মাত্রা অলংকার-বহুল এবং রেফ প্রাসঙ্গিক বর্ণের শিরোরেখাকে ছাড়িয়ে কখনও যায় নি। মধুবন ও বাঁশখেরার এ সব লিপি-বৈশিষ্ট্য পরবর্তী কালের বহু নাগরী শিলালেখ ও তাম্রপটে (যেমন পূর্বোক্ত লাখামণ্ডল অভিলেখতে), বিশেষত দশম-একাদশ শতাব্দীর অনেক হাতে-লেখা পুঁথিতে দেখা যায়। রাজস্থান-মালব অঞ্চলের সপ্তম-অষ্টম শতকের লেখমালায় (এদের কয়েকটি হর্ষ-বর্ধনের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক) লক্ষণীয় বাঁশখেরা লিপি-সুলভ বৈশিষ্ট্য রাজস্থানী শৈলীতে দেখা যায়।

উল্লেখযোগ্য আর-একটি তথ্য এই, বর্তমানে নাগরী উত্তর ভারতের প্রধানতম লিপি হলেও আদি-নাগরীর প্রাচীনতম নিদর্শনগুলি এসেছে দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম ভারত থেকে। গুজরাতের গুর্জরবংশীয় (ঐ নামের বিখ্যাত বংশের শাখা, ব্রোচ-নানডোর অঞ্চলের) রাজা তৃতীয় জয়ভটের ৭০৬ খ্রীস্টাব্দের (৪৫৬ কলচুরি সংবৎ) দানপত্রে জয়ভটের স্বাক্ষর 'স্বহস্তো মম জয়ভটস্য' (এখানে 'স্বহস্ত' অর্থ স্বাক্ষর) আদি-নাগরীতে উৎকীর্ণ। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশের দন্তিদুর্গ (আনুমানিক ৭৫২-৫৮), দ্বিতীয় গোবিন্দ (আঃ ৭৭৩-৮৩), তৃতীয় গোবিন্দ (৭৯৩-৮১৪) প্রমুখ রাজাদের দানপত্রেও আদি-নাগরী অক্ষরের ব্যবহার দেখা যায়। কল্যাণের চালুক্য (পশ্চিম চালুক্য নামেও পরিচিত) এবং কোঙ্কনের শিলাহার বংশের লেখমালা থেকেও পশ্চিম ভারতে আদি-নাগরীর জনপ্রিয়তার প্রমাণ মেলে।

নাগরী লিপির যাত্রা দাক্ষিণাত্যে শুরু হলেও কালক্রমে উত্তর ভারতে বা আর্যাবর্তে এর প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। নাগরী বা দেবনাগরী বললে এখন উত্তর ভারতের লিপিবিশেষের কথা মনে হয়, এর আদিনিবাসের কথা মনে আসে না। নবম শতাব্দীতেই যে আদি-নাগরী আর্যাবর্তে প্রসার লাভ করেছিল তার প্রমাণ মেলে কনৌজের প্রতিহারবংশীয় মহেন্দ্রপালের ৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের (৯৫৫ বিক্রম সংবৎ) একটি অভিলেখতে। দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর চাহমান বা চৌহান, পরমার, কলচুরি, চন্দেল্ল, গাহড়বাল প্রভৃতি বহু রাজবংশ তাঁদের শিলালেখ, তাম্রপট্ট ইত্যাদি যে-লিপিতে খোদাই করেছিলেন, তাকে

স্বচ্ছন্দে নাগরী অভিধায় চিহ্নিত করা যায়, কারণ জয়ভট্ট-দন্তিদুর্গ প্রমুখ রাজাদের সময় অর্থাৎ অষ্টম শতকের প্রথমার্ধ থেকে দশম-একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত দু'শ আড়াই শ বছরের ব্যবধানে আদি-নাগরী স্বাভাবিক পরিণতিতে নাগরীতে রূপান্তরিত হয়েছে, আত্মপ্রকাশ করেছে নিজস্ব বিশিষ্ট রূপে। প্রসঙ্গত, বাংলা, ওড়িয়া, শারদা (পাঞ্জাব-কাশ্মীরের লিপি) প্রভৃতি আঞ্চলিক লিপিগুলিরও উদ্ভব অল্প-বিস্তর কাল-ব্যবধানে দশম-একাদশ শতকেই ; এবং শুধু লিপি নয়, আমাদের অধিকাংশ প্রাদেশিক ভাষার সূচনাপর্বও দশম-একাদশ শতাব্দীতে বিস্তৃত। সংক্ষেপে, নাগরী লিপির মূল কাঠামো দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই তৈরি হয়ে যায়, পরবর্তী পরিবর্তন বহিরঙ্গের। বিবর্তনের স্বভাবী ধারায় এ পরিবর্তনের মূলে কাল ও রুচির প্রভাব ছাড়া তালপাতা, ভূর্জপাতা, কাগজ, কলম, কালি প্রভৃতি লেখন-সামগ্রীর চরিত্রবৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত হিসাবে নাগরীতে দু ধরনের অ (অ এবং अ) এবং ণ (ण এবং ण)-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। দক্ষিণ ভারতের এই ছাঁদকে (अ ও ण) বোম্বাইয়া ছাঁদ বলা হয়। ছাপাখানা চালু হবার পর অন্যান্য লিপির মতো নাগরী লিপিতেও লিপিকরের হাতে-লেখার শিল্প-বৈচিত্র্যের অবকাশ কমে এসেছে, অক্ষরগুলিতে দেখা দিয়েছে স্থিতিশীলতা, অন্যভাবে যান্ত্রিক কাঠিন্য।

॥ তিন ॥

নাগরীর সঙ্গে আর দু'টি লিপির নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত : সিদ্ধমাতৃকা ও কুটিল। এগুলিকে স্বতন্ত্র লিপির পরিবর্তে বিশিষ্ট লিখন-রীতি বলাই বাঞ্ছনীয়। এক ধরনের দ্রুতবহা ব্রাহ্মী লিপির নাম সিদ্ধমাতৃকা, ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে এর উদ্ভব। সিদ্ধমাতৃকা ঢঙে লেখা দলিল-পত্র, প্রশস্তি প্রভৃতি 'সিদ্ধিরস্তু', 'সিদ্ধম্' ইত্যাদি দিয়ে শুরু হতো বলে নাকি এ হেন নামকরণ। সিদ্ধমাতৃকার দু'টি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত বুদ্ধগয়ার ৫৮৮ খ্রীস্টাব্দের (২৬৮ গুপ্ত সংবৎ) অভিলেখ এবং জাপানের হোরিয়ুজি মন্দিরে রক্ষিত সপ্তম (মতান্তরে ষষ্ঠ) শতাব্দীর বৌদ্ধ শাস্ত্র 'উষ্ণীষবিজয়ধারণী'-র তালপাতার পুঁথি[১]। সিদ্ধমাতৃকার অক্ষরগুলির মাথা নখাগ্রের মতো সুঁচলো, দাঁড়-গুলির মাথায় সরাসরি মাত্রার পরিবর্তে তিনকোণা কীলক। কুটিল লিপি সিদ্ধমাতৃকারই রূপভেদ, এ লিপিতে বর্ণমালার দাঁড়গুলি প্রায়শই বঙ্কিম,

১ Max Muller and B Nanjio, 'The Ancient Palm Leaves' (Horiuzi Palm-leaf Ms), *Anecdota Oxoniensia*, Vol. I, pt. iii (Oxford, 1884) দ্রষ্টব্য।

অন্তর্মুখী। রাষ্ট্রকূটবংশীয় দন্তিদুর্গের বা গোবিন্দের আদি-নাগরীর লেখ-গুলির কিছু কিছু অক্ষর কুটিল ছাঁদে লেখা। কালক্রমে সিদ্ধমাতৃকার তিনকোণা কীলক ভেঙে গিয়ে অক্ষরের দাঁড়ের দু'দিকে সরাসরি বেড়ে মাত্রার আকার নেয় এবং অনুরূপভাবে কুটিল লিপির বঙ্কিমতাও বহু অক্ষরকে প্রভাবিত করে। এ উক্তি অন্যান্য লিপির মতো নাগরীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ক্রমবিকাশের পথে বাংলা, শারদা, গুজরাতী প্রভৃতি অন্যান্য লিপির সহগামী হবার ফলে নাগরীর সঙ্গে এদের আকৃতিগত সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। বিশেষত বাংলা (এবং আসামীরও, কারণ বাংলা ও আসামীর পার্থক্য খুবই নগণ্য), পাঞ্জাবী বা গুরুমুখী, গুজরাতী এবং মারাঠীর সঙ্গে নাগরীর সম্পর্ক নিকট আত্মীয়ের। গুজরাতীর সঙ্গে নাগরীর প্রধান পার্থক্য, নাগরীতে শিরোরেখা আছে, গুজরাতীতে নেই। ওড়িয়ার শিরোরেখা বঙ্কিম, অনেক ক্ষেত্রে টুপির মতো। অন্যান্য লিপির মাত্রা সরল, সরাসরি প্রলম্বিত। বাংলা ও ওড়িয়াতে এ-কার বসে ব্যঞ্জনের বামে, গুজরাতী-মারাঠী-পাঞ্জাবীতে নাগরীরই মতো ব্যঞ্জনের মাথায়। অন্যান্য অনেক বিষয়ে লিপিগুলির মধ্যে লক্ষণীয়রকমের সৌসাদৃশ্য।

॥ চার ॥

সম্ভবত এই সব লিপির আত্মীয়তার কথা ভেবেই বিভিন্ন সময়ে একাধিক ভারতীয় নেতা ও মনীষী একটি সর্বভারতীয় লিপি প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছেন। এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সারদাচরণ মিত্র (বিচারপতি) প্রথম এই প্রস্তাব উথাপন করেন। শুধু উথাপন নয়, 'একলিপি বিস্তার পরিষদ্' নামে একটি সংস্থার পত্তন করে এ ব্যাপারে রীতিমতো আন্দোলন চালিয়েছিলেন। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত ঐ পরিষদের অধিবেশনে বিচারপতি ভি কৃষ্ণস্বামী আইয়ার সভাপতির ভাষণে সারদাচরণের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, বহুভাষীর দেশে একটি সর্বজনীন লিপি চালু হলে বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত সাধারণ শব্দাবলির মাধ্যমে একের পক্ষে অন্যের ভাষা বুঝতে সুবিধা হবে। আইয়ারের বক্তৃতার পাঁচ বছর আগে ১৯০৫ সালে লোকমান্য টিলক বেনারসে অনুষ্ঠিত নাগরী-প্রচারিণী সভার অধিবেশনে দেবনাগরীকে সর্ব-ভারতীয় লিপির মর্যাদা দিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী এ ব্যাপারে ছিলেন টিলকের অনুগামী। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজে একটি

ভাষণে তিনি বলেছিলেন, যে- দেশে শতকরা নব্বই জনেরও বেশি লোক নিরক্ষর, সে দেশে একটি সর্বজনীন লিপির মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা-বিস্তারের ব্রত গ্রহণ করা উচিত। সবরকমের প্রাদেশিকতা ও সংকীর্ণতা পরিহার করে দেবনাগরীর মাধ্যমে ভারতবাসী তার নিজের নিজের ভাষা শিখুক, সংক্ষেপে এইটিই ছিল গান্ধীজীর বক্তব্য। জওহরলাল নেহেরু প্রথম জীবনে রোমক লিপির পক্ষপাতী ছিলেন, পরে নাগরীর দিকে ঝোঁকেন। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে সংবিধান প্রণয়নের পর হিন্দী ও দেবনাগরী যথাক্রমে অন্যতম সরকারী ভাষা ও লিপির মর্যাদা লাভ করে।

পরিসংখ্যানের বিচারে নাগরী বা দেবনাগরী একালের মতো অতীতেও যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল এবং এই জনপ্রিয়তার বড়ো কারণ ছিল, সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন সংস্কৃত ভাষার পুঁথিপত্র অনেক ক্ষেত্রে লেখা হতো নাগরীতে। উত্তর ভারতে তো বটেই, তামিল-তেলুগু-কানাড়ী-মলয়ালম ভাষার এলাকা দক্ষিণ ভারতেও সংস্কৃতের অন্যতম বাহন ছিল নাগরী। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বা কোঙ্কণের শিলাহার বংশীয় রাজাদের শিলালেখ, তাম্রপট্ট ইত্যাদির প্রাসঙ্গিক উল্লেখ আগেই করেছি। ত্রয়োদশ শতকে দেবগিরির যাদববংশের এবং চতুর্দশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বিজয়নগরের রাজারাও সংস্কৃত ভাষায় তাঁদের শিলালেখ, দানপত্র, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি নাগরী হরফে লেখাতেন। বিজয়নগর রাজাদের আমলে দক্ষিণী নাগরীর নাম হয়েছিল নন্দিনাগরী।[১] উত্তর ভারতের দেবনাগরীর সঙ্গে নন্দিনাগরীর পার্থক্য সহজে চোখে পড়ার নয়, বর্গীয় ব, ভ এবং শ-এর আকৃতির ক্ষেত্রে এ পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অর্থাৎ নন্দিনাগরী উত্তর ভারতীয় নাগরীরই রূপভেদ, জন্মসূত্রে যে- লিপি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট-বংশীয় দন্তিদুর্গ- দ্বিতীয় গোবিন্দ- তৃতীয় গোবিন্দের লেখমালার আদি-নাগরীর সঙ্গে যুক্ত।

কারণ যা-ই হোক, নাগরীর জনপ্রিয়তার পর্যাপ্ত প্রমাণ একাদশ-দ্বাদশ শতক থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত অসংখ্য শিলালেখ, তাম্রপট্ট, মুদ্রা, দলিল-দস্তাবেজ, ব্যক্তিগত ও সরকারী চিঠিপত্র এবং সাহিত্যগ্রন্থে বিধৃত। এমন কি বহিরাগত আক্রমণকারী ও বিদেশী শাসকদের মুদ্রাতেও। সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরী (মহম্মদ বিন্ সাম) থেকে শুরু করে

১ নন্দিনগর বা মহারাষ্ট্রের বর্তমান নান্দের জায়গাটি। সঙ্গে এ লিপি-নামের যোগ অস্বাভাবিক নয়।

ইলতুৎমিস, শেরশাহ, আকবরের মতো বিখ্যাত সম্রাটরা তাঁদের মুদ্রায় নাগরীকে সসম্মান স্থান দিয়েছিলেন। আকবর রামসীয়া নামে বিশেষ এক ধরনের মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন; এসব মুদ্রার একপিঠে রামসীতার মূর্তির সঙ্গে নাগরী হরফে 'রামসীয়া' লেখা।

॥ পাঁচ ॥

ফিরে আসি কৈশোর স্মৃতিতে, পণ্ডিতমশায়ের কথায়। সেদিন পণ্ডিতমশায় দেবনাগরীকে নাগরীর নামান্তর বলে থেমেছিলেন, নাগরী কবে কেমন করে দেবনাগরী নামে ভূষিত হলো সে বিষয়ে কিছু বলেন নি। এ নিয়ে আমিও তাঁকে আর বিরক্ত করি নি, কিন্তু এ প্রশ্নের সঠিক জবাব এখনও আমি পাই নি। নাগরী নামটাই আসল ও পুরনো, একাদশ শতকের হিন্দু শাস্ত্রবেত্তা বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত অল-বিরূণী তাঁর ভারতবৃত্তান্তে সিদ্ধমাতৃকা, গৌরী (গৌড়দেশের লিপি), লারী (লাটী, লাট বা কাথিয়াওয়াড়ের লিপি), দিরওয়ারী (দ্রাবিড়ী) প্রভৃতি দশটি লিপির সঙ্গে নাগর অর্থাৎ নাগরী লিপির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দেবনাগরী নামটি কবে থেকে চালু হলো? যতদূর জানা গেছে, পিএত্রো দোল্লা ভাল্লে নামে জনৈক ইতালীয় পর্যটক ১৬২২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর একটি চিঠিতে লিপি-নাম হিসাবে দেবনাগরী ব্যবহার করেন। কিন্তু তিনি কোন্ সূত্রে এ নাম পেয়েছিলেন জানা যায় নি। যাই হোক, এখনও পর্যন্ত এইটিই দেবনাগরী নামের প্রাচীনতম প্রয়োগ। ভাল্লের কিছু পরে জাঁ শারদ্যাঁ এ নাম ব্যবহার করেন।

১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে পেটার হাইন্‌রিখ্ রোট নামে এক বাভারীয় ধর্মযাজক ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি একটি নাগরী হরফের 'টেবল' বা সারণী তৈরী করেছিলেন। ১৬৬৭ সালে আমস্টার্ডাম থেকে প্রকাশিত এবং অ্যাথানাসিয়ান কিরশেরি লিখিত 'খীনা ইল্লুস্ত্রাতা' (*China Illustrata*) কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের একটি কপি আছে) বইতে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু এই সারণীতে 'নাগরী হরফ'-এর পরিবর্তে 'ভারতীয় লিপি' (*Indicis Scriptum*) নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। রোট সাহেব একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখেছিলেন এবং ইউরোপীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। তবে এটি কখনও ছেপে বেরোয় নি এবং এর পাণ্ডুলিপি শেষবারের মতো দেখেন স্পেনীয় পণ্ডিত লোরেনৎসো হার্বাস।

হার্বাস-এর পরে প্রথম সার্থক বাংলা ব্যাকরণ রচয়িতা ন্যাথানিয়েল

ব্রাসি হ্যালহেড (১৭৫১—১৮৩০) তাঁর 'এ কোড অফ জেণ্টু লজ' (১৭৭৬) বইতে দেবনাগরী নামটি ব্যবহার করেন। অর্থাৎ অল-বিরুণীর সময় থেকে ১৬২২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে 'নাগরী'-র সঙ্গে 'দেব' শব্দটির সংযোজনায় দেবনাগরীর উদ্ভব।

দেবনাগরী নামের উৎপত্তি যে-ভাবেই হোক না কেন, এ নামের জনপ্রিয়তার মূলে ম্যাক্স মুল্যর-এর দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য। ছ'টি খণ্ডে ঋগ্বেদ প্রকাশের জন্য (১৮৪৯—৭৪) তিনি ভারতীয় লিপিগুলির মধ্যে নাগরীকেই নির্বাচিত করেছিলেন। তাঁর সংগৃহীত কয়েকটি পুঁথির নাগরী হরফ গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। তিনি বিলেতে ঐ হরফ খোদাই করিয়ে তাঁর ঋগ্বেদ ছেপেছিলেন এবং মুদ্রকমহলে এটি 'অক্সফোর্ড ছাঁদের হরফ' বলে পরিচিত। বর্তমান নাগরী হরফের ছাঁদের সঙ্গে ম্যাক্স মুল্যর-এর ঋগ্বেদের হরফের ছাঁদের অল্পবিস্তর আকৃতিগত তারতম্য আছে, কিন্তু এই স্মরণীয় বিদেশী পণ্ডিতের ব্যবহৃত নাগরী হরফের ছাঁদ অনেক বেশি শিল্পগুণে মণ্ডিত। ম্যাক্স মুল্যর-এর মুদ্রিত ঋগ্বেদের জনপ্রিয়তার ফলে কালক্রমে সংস্কৃতের সঙ্গে নাগরী অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কে অন্বিত হয় এবং শিক্ষিত জনসাধারণ নাগরীকে দেবভাষার বাহন হিসাবে মনে করতে শুরু করেন।

॥ ছয় ॥

দেবনাগরী নামের তাৎপর্যও বিতর্কিত। কেউ কেউ বলেন, দেবনগর থেকে দেবনাগরী, কারো কারো মতে দেবতাদের অর্থাৎ দেবপ্রতিম ব্রাহ্মণ বা রাজাদের ব্যবহৃত নাগর বা নাগরী লিপি হিসাবে এটি দেবনাগরী। দ্বিতীয় দলের অনেকের অনুমান, নাগর ব্রাহ্মণরা এ লিপিতে লিখতেন বলে এর নাম নাগরী এবং যেহেতু তাঁরা দেবতুল্য, তাঁদের লিপি নামান্তরে দেব-নাগরী। এ ধরনের অভিমতে অনুমানের পরিমাণই বেশি, যুক্তি বা তথ্য বিশেষ নেই। অনুরূপভাবে প্রথম দলের অভিমতও প্রধানত অনুমান-নির্ভর। দেবনগর থেকে দেবনাগরীর আগমন অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে দেব-নগরের অবস্থিতি সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। ১৮২৩ সালে আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটনের জার্মান ছাত্র ও সংস্কৃতবেত্তা অটমার ফ্রাঙ্ক দেবনাগরীর উৎপত্তিস্থল দেবনগর বা দৈবনগরকে কাবুলের কাছে নির্দেশিত করেছিলেন। পূর্ব আফগানিস্তানে প্রাচীনকালে নগরহার নামে একটি জায়গা ছিল বটে, কিন্তু বর্তমান জালালাবাদের সঙ্গে সনাক্তীকৃত এই স্থানটি কাবুল থেকে দূরে। তা ছাড়া নগরহার যে নাগরীলিপির উৎসভূমি তারও কোন প্রমাণ এখনও

পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। বছর দশ আগে জনৈক ভারতীয় পণ্ডিত বলেছিলেন, 'দেবরাজ' নামে পরিচিত গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্র সংক্ষেপে 'নগর' নামে অভিহিত, অতএব দেবরাজের নগর বা দেবনগর তথা পাটলিপুত্রই হলো দেবনাগরীর আদি নিবাস।[১] এ তত্ত্বেও গোলমাল। প্রথমত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায় বা লেখাবলির হরফে আদি-নাগরীর বৈশিষ্ট্য বা পূর্বাভাস নেই; এবং দ্বিতীয়ত, আদি-নাগরীর প্রাচীনতম নিদর্শনগুলি এসেছে দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম ভারত থেকে, পাটলিপুত্র বা তার আশেপাশে এ ধরনের একটি দৃষ্টান্তও মেলে নি। তাহলে নাগরী দেবনাগরীতে নামান্তরিত হলো কেন? আমার মতে, নগরে প্রচলিত (কোন বিশেষ নগরে নয়) লিপিই নাগরী লিপি, গ্রামাঞ্চলের লিপির তুলনায় যা মার্জিত ও সুশোভন, অন্যভাবে একটি নির্ণীত ও নির্দিষ্ট মানবিশিষ্ট, ইংরেজীতে যাকে বলে স্ট্যাণ্ডার্ডাইজ্‌ড্‌। আর দূর-অতীতের ভারতবর্ষে যেহেতু লেখালেখিকে দৈব ব্যাপার বলে মনে করা হতো (যেমন ব্রাহ্মী লিপির প্রবর্তক স্বয়ং ব্রহ্মা!), সে জন্য কোন এক সময়ে নাগরীকে দেবতাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে নূতন নাম দেওয়া হয়েছিল দেবনাগরী। দেবভাষা সংস্কৃতের বাহনরূপে এর বহুল পরিচিতিও নতুন নামকরণের মূলে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে থাকবে।

১ *Indian Systems of Writing* (New Delhi, 1966) পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত বাসুদেবশরণ অগ্রবালের প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ, পৃ. ১৫।

ঐতিহাসিক ভূগোলে, বঙ্গ-বাংলা-বাংলাদেশ

কয়েক বছর আগে নূতন 'বাংলাদেশ' শব্দটি রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য লাভ করেছে। এই শব্দচিহ্নিত ভূখণ্ড অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ ১৯৪৭ সালের পর দীর্ঘ ১৪ বছরেরও বেশি 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে পরিচিত ছিল। তারপর ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে সেই ভূখণ্ড যখন পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করলো, চিহ্নিত হলো 'বাংলাদেশ' অভিধায়, তখনই বঙ্গভাষীরা অসুবিধার সম্মুখীন হলেন। এ অসুবিধা আপাতত বোধগম্য নয়, যতটা হবে ভবিষ্যতে। নামের এই বিভ্রান্তি আপাত ও সাময়িক, একটি দেশখণ্ডের নাম হিসাবে 'বাংলাদেশ'-এর ব্যবহারও সাম্প্রতিক ও অর্বাচীন। রবীন্দ্রনাথ যখন 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি' লিখেছিলেন তখন তাঁর কবিদৃষ্টিতে ছিল আবহমানকালের অখণ্ড বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ইতিহাস বললে বোঝায় দেশ-কাল-ধৃত একটি বিশিষ্ট জনের ও সংস্কৃতির, রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক সীমার উর্ধ্বে যার অবস্থান।

দেশের ইতিহাসের চাইতে দেশের নামকরণের ইতিহাস কোন অংশেই কম আকর্ষণীয় নয়। রাষ্ট্রীয় সীমার মতো রাষ্ট্র-নামের আয়তনও পরিবর্তনশীল, এই পরিবর্তন সাধারণত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রসার ও সংকোচের সঙ্গে জড়িত ; নামের ব্যবহারে 'ভারতবর্ষ' বা 'ইণ্ডিয়া'[১] এখনও অক্ষুণ্ণ, কিন্তু সেই নামগত অর্থের আয়তন ও ভৌগোলিক সীমানা ক্ষুণ্ণ—১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্টের পূর্বের ও পরের ভারতবর্ষে কত তফাৎ! অতীতের 'বঙ্গ' বা 'বাংলা' এবং সাম্প্রতিক 'বাংলাদেশ' ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় সীমার ক্ষেত্রে কি সমার্থক ?

॥ দুই ॥

কত প্রাচীন এই 'বঙ্গ' আর 'বাংলা' ? 'বাংলা'-র উদ্ভব 'বঙ্গাল' থেকে, 'বঙ্গাল'-এর জনক 'বঙ্গ'। 'বঙ্গ' নামের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ খ্রীস্টপূর্ব নবম-অষ্টম শতকের 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে, সেখানে 'বঙ্গ' 'বগধ' (সম্ভবত 'মগধ') জনের প্রতিবেশী। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের 'বৌধায়ন

---

১ খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতকের কলিঙ্গপতি খারবেলের শিলালেখে 'ভারতবর্ষ' নামের উল্লেখ মেলে। 'ইণ্ডিয়া' নামটির সর্বপ্রাচীন উল্লেখ হেরোডোটাস-এর 'ইতিহাস' (খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর) গ্রন্থে পাওয়া যায়।

ধর্মসূত্রে' বঙ্গ কলিঙ্গের প্রতিবেশীরূপে আভাসিত। বঙ্গ কলিঙ্গ ইত্যাদি অবৈদিক সংকীর্ণযোনির দেশ, যে- দেশে পদার্পণ করলে ফিরে এসে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। মহাভারতের একাধিক স্থানে বঙ্গের উল্লেখ আছে অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম প্রভৃতি জনপদের প্রতিবেশী হিসাবে, একটি শ্লোকে তাম্রলিপ্তি বা তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) বঙ্গের অংশরূপে বর্ণিত। সিংহলী বৌদ্ধ গ্রন্থ 'মহাবংশ', প্রাকৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ 'মিলিন্দপঞ্হো' (সংস্কৃত 'মিলিন্দপ্রশ্ন') এবং প্রাকৃত জৈন গ্রন্থ 'পণ্ণবনা' (প্রজ্ঞাপনা)-তেও বঙ্গের সাক্ষাৎ মেলে। আরও সাক্ষাৎ মেলে খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকের নাগার্জুনকোণ্ডার শিলালেখে, চতুর্থ শতকের দিল্লী মেহরৌলির রাজা চন্দ্রের বিখ্যাত লৌহস্তম্ভে উৎকীর্ণ অভিলেখতে এবং সপ্তম শতাব্দীর চালুক্য নরপতি দ্বিতীয় পুলকেশীর মহাকূটের শিলাস্তম্ভ-লেখতে। এই সব বিভিন্ন আকরধৃত উল্লেখ বঙ্গের অবস্থিতি নির্ণয়ে বিশেষ সাহায্য করে না, যদিও কয়েকটি ক্ষেত্রের ইঙ্গিত ভৌগোলিকভাবে আকর্ষণীয়। মিলিন্দপ্রশ্নে সমুদ্রবাণিজ্য-নির্ভর দেশ হিসাবে বঙ্গের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত।

প্রাচীন বঙ্গের অবস্থিতি বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেন গুপ্তযুগের কবি কালিদাস (খ্রীস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর)। 'রঘুবংশ' কাব্যগ্রন্থের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে কালিদাস বলেছেন, রঘু তালীবনশ্যাম উপকূলে সুহ্মদের পরাজিত করে বঙ্গে আসেন; নৌসাধনোদ্যত বঙ্গদের পরাস্ত করে 'গঙ্গাস্রোতোহন্তরে' জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন; তারপর তিনি কপিশা পার হয়ে উৎকলদের প্রদর্শিত পথে কলিঙ্গ অভিমুখে রওনা হন। ভৌগোলিক তথ্যে মূল্যবান এই বর্ণনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, কালিদাসের সময়ে অর্থাৎ চতুর্থ-পঞ্চম শতকে কপিশা বা মেদিনীপুরের কাঁসাই নদী ছিল বঙ্গের পশ্চিম সীমা (কপিশার ওপারে ছিল উৎকল) এবং শাখা-প্রশাখা- সমাকীর্ণ গাঙ্গেয় অববাহিকা ছিল এই জনপদের প্রাণ-কেন্দ্র। কাঁসাই পর্যন্ত বিস্তৃত দক্ষিণ মেদিনীপুর সহ বাখরগঞ্জ-খুলনা-দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিস্তীর্ণ অঞ্চল যে সেকালে বঙ্গ নামে অভিহিত হতো, পূর্বোক্ত মিলিন্দপ্রশ্ন- ও মহাভারত- পরিবেশিত তথ্যের ইঙ্গিতেও তা স্পষ্টতর: মিলিন্দপ্রশ্নে বঙ্গ সমুদ্রতীরবর্তী দেশ এবং মহাভারতে সমুদ্র ও কপিশার সংযোগস্থলে অবস্থিত তাম্রলিপ্তকে বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গুপ্তযুগে বঙ্গের একাংশ ভাগীরথীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে বঙ্গের পশ্চিম সীমার সঙ্কোচ ঘটে। গুপ্তোত্তর যুগে বর্ধমানভুক্তি ('ভুক্তি' অনেকটা এ কালের 'বিভাগ'-এর সঙ্গে তুলনীয়)-র

সৃষ্টি হয়, মোটামুটিভাবে এই বর্ধমানভুক্তি একালের বর্ধমান বিভাগের সঙ্গে অভিন্ন। আয়তনে বৃহত্তর আর-একটি ভুক্তি পুণ্ড্রবর্ধন বা পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, ব্রিটিশ যুগের চট্টগ্রাম, ঢাকা ও প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের অধিকাংশ ভূভাগ নিয়ে যার সর্ব্বোচ্চ সীমা রচিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, আলোচ্য বঙ্গও ছিল এই পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী। পাল আমলের শেষ দিকে বঙ্গের দু'টি ভাগ দেখা যায়, বিক্রমপুর সহ ঢাকা-ফরিদপুর নিয়ে গঠিত হয়েছিল 'অনুত্তর' অর্থাৎ 'দক্ষিণবঙ্গ'। পাল যুগের অনুত্তর-বঙ্গ হয়তো সমুদ্র অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল এবং সেন লেখমালায় উল্লিখিত 'নাব্য' নামক বিভাগটি অনুত্তর-বঙ্গের সমুদ্রকূলবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে অভিন্ন বলেই আমার ধারণা। সমুদ্রের অদূরবর্তী নৌ-চলাচলের উপযোগী নদনদীবহুল অঞ্চলটিই 'নাব্য' নামের উপযোগী এবং পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত এই নাব্য ভূখণ্ডের পূর্ব সীমা রচনা করেছিল সমুদ্র অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর।

সেন রাজাদের লেখমালায় বঙ্গ পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী এবং বঙ্গের অন্তর্গত বিক্রমপুর ও নাব্য। বিক্রমপুর ঢাকা জেলার বিখ্যাত পরগনা, সেকালে এর আয়তন আরও বড় ছিল ; ফরিদপুরের কোটালিপাড়া ও ইদিলপুর পরগনাও বিক্রমপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নাব্যের একটি বিভাগের নাম ছিল রামসিদ্ধিপাটক, সেই বিভাগের একটি গ্রাম বঙ্গালবড়া। উল্লেখনীয়, বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলায় গৌর নদী অঞ্চলে রামসিদ্ধি নামে এখনও একটি গ্রাম আছে। নদী-নালা-সমাকীর্ণ বারিবহুল বাখরগঞ্জ সঙ্গতভাবেই নাব্য নামে পরিচিতি লাভ করেছিল।

সাধারণভাবে, ঢাকা, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ এ কালের বাংলাদেশের এই তিন জেলা নিয়ে প্রাচীন বঙ্গের অবয়ব গঠিত হয়েছিল। এই তিন জেলার বাইরের অঞ্চল কখনও কখনও বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার সীমা বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণে যে একটি দেশের সীমার সংকোচ ও প্রসার ঘটে তা আগেই বলেছি। বঙ্গের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। অষ্টম-নবম শতক থেকে 'হরিকেল' বা 'হরিকেলি' ও 'বঙ্গাল' ভৌগোলিক নাম হিসাবে জনপ্রিয় হতে থাকে। তার আগে চতুর্থ শতকেই দেখা দিয়েছিল 'সমতট' নামীয় বিভাগ, পরবর্তী কালে আরও দুটি বিভাগ 'প্রবঙ্গ' ও 'উপবঙ্গ'। 'প্রবঙ্গ' কোথায় ছিল তা জানা যায় না, যশোহর ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল নিয়ে ছিল 'উপবঙ্গ'। নোয়াখালি, ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চল ছিল সমতট-ভুক্ত। দশম শতকের একটি লেখ-সাক্ষ্য অনুসারে বিক্রমপুর ও সমতট বঙ্গের বহির্ভূত। বিক্রমপুরের বহির্ভুক্তি

বঙ্গের সীমার হ্রাস সূচিত করে। কিন্তু অনতিকালের মধ্যে বঙ্গ যে তার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেন লেখমালায় তার প্রমাণ মেলে। দ্বাদশ শতকের অভিধানচিন্তামণি নামক কোষগ্রন্থের রচয়িতা হেমচন্দ্র বঙ্গ ও হরিকেলিকে সমার্থক বলেছেন। মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম নিয়ে গঠিত হরিকেল যে বঙ্গের অন্তর্ভূত ছিল হেমচন্দ্রের উক্তিতে ('বঙ্গাস্তু হরিকেলীয়াঃ') তার প্রমাণ মেলে। ত্রয়োদশ শতকের আর-একজন লেখক, কামসূত্রের টীকাকার যশোধর, বঙ্গকে লৌহিত্যের অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে নির্দিষ্ট করেছেন ('বঙ্গা লৌহিত্যাৎ পূর্বেণ')। বলা বাহুল্য, যশোধরের উক্তি বঙ্গের সঙ্কীর্ণ সীমার পরিচায়ক, কিন্তু তাঁর ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয় ; মৈমনসিংহ-শ্রীহট্ট বঙ্গের অন্তর্গত। এদিক থেকে হেমচন্দ্রের ও যশোধরের বক্তব্যে মিল আছে। সপ্তদশ শতকের 'শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে'র দেশবিভাগ অধ্যায়ে বঙ্গদেশের সীমা রত্নাকর অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয়েছে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের এই তথ্যে হেমচন্দ্র-যশোধরের উক্তি প্রতিধ্বনিত। এই গ্রন্থে বঙ্গদেশ ও ভুবনেশ্বরের অন্তর্বর্তী ভূভাগকে 'গৌড়' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ ভূখণ্ড অর্থাৎ একালের বর্ধমান বিভাগ এবং উড়িষ্যার কিয়দংশ গৌড়ের অন্তর্গত ছিল। সাধারণভাবে সে কালে ব্যাপক অর্থে বঙ্গ ব্রহ্মপুত্র-ভাগীরথীর পূর্বশায়ী দেশখণ্ডকে এবং সীমিত অর্থে ঢাকা-ফরিদপুর-বাখরগঞ্জ অঞ্চলকে বোঝাত।

॥ তিন ॥

বঙ্গ থেকে বঙ্গাল ; বঙ্গাল নামের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ ৮০৫ খ্রীস্টাব্দের বিখ্যাত রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের একটি অভিলেখে।[১] অন্যান্য বিশিষ্ট উল্লেখস্থল : রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলৈ লেখ (একাদশ শতক), কলচুর্য বংশীয় বিজ্জলের অবলূর লেখ (দ্বাদশ শতাব্দী) এবং বঙ্গের চন্দ্রবংশীয় শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ লেখ[২] (দশম শতাব্দী)। প্রথম ও শেষোক্ত অভিলেখতে বঙ্গ ও বঙ্গাল স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত। বঙ্গ ও বঙ্গালের স্বতন্ত্র উল্লেখ আরও পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত চতুর্দশ শতাব্দীর হম্মীরের কাব্যগ্রন্থ। পঞ্চদশ শতাব্দীর 'ডাকার্ণব' গ্রন্থে বঙ্গাল ও হরিকেল স্বতন্ত্র জনপদরূপে বর্ণিত এবং হেমচন্দ্রের

১ *Epigraphia Indica*, Vol. XXXIV, pp 123-40, মহারাষ্ট্রের নেসারিকায় প্রাপ্ত এই লেখে পালবংশীয় ধর্মপালকে বঙ্গালের রাজা বলা হয়েছে।

২ শ্রীহট্টের পশ্চিমভাগে আবিষ্কৃত লেখটি সম্পাদনা করেছেন শ্রীকমলাকান্ত গুপ্ত। তাঁর *Copper-plates of Sylhet* গ্রন্থে (পৃ. ৮০-১৫২) এটি পাওয়া যাবে।

সাক্ষ্য মানলে হরিকেল তথা বঙ্গ দেশটি বঙ্গাল থেকে স্বতন্ত্র। বঙ্গালের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলে বঙ্গের সীমা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। কিন্তু বঙ্গাল যে বঙ্গের অংশবিশেষ ছিল, এ কথা মনে করার কারণ আছে। কেন তা বলছি।

পরবর্তী কালের হলেও আবুল ফজলের বঙ্গ-বঙ্গাল প্রাসঙ্গিক উক্তি এ সূত্রে প্রণিধানযোগ্য। আবুল ফজল (ষোড়শ শতাব্দী) তাঁর 'আইন-ই-আকবরী'-তে[১] বলেছেন: 'এ দেশের আদি নাম ছিল বঙ্গ, এ দেশের পূর্বতন রাজারা দশ হাত উঁচু ও বিশ হাত চওড়া আল্ তৈরি করতেন, এভাবে বঙ্ শব্দের সঙ্গে আল্ যুক্ত হয়ে বঙ্গাল বা বাঙ্গালা নিষ্পন্ন হয়েছে।' বারিবহুল অঞ্চলে আল্ (পূর্ব বঙ্গীয় আইল) বা বাঁধ তৈরি করে বৃষ্টি ও বন্যাকে প্রতিহত করে কৃষি ও বাস্তুভূমিকে রক্ষা করা অস্বাভাবিক শুধু নয়, অপরিহার্য। সুতরাং বঙ্গ নামক যে- দেশখণ্ডে বৃষ্টিপাত সাধারণের তুলনায় বেশি, বন্যা যেখানে স্বাভাবিক, সেখানেই শস্যক্ষেত্রে ও নদী-তীরে পর্যাপ্ত সংখ্যক আল বাঁধা হতো এবং এই আল-বহুল বঙ্গভূমিই বঙ্গাল নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। আদিতে নদীমাতৃক বারিবহুল খুলনা-বাখরগঞ্জ অঞ্চলই ছিল সেই বঙ্গাল দেশ, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। দ্বিতীয়ত, বঙ্গের অন্যতম বিভাগ নাব্যের অন্তর্গত একটি গ্রামের নাম বঙ্গাল-বড়া, পূর্বোদ্ধৃত এ তথ্য স্মরণীয়। বঙ্গালবড়া ছিল এ কালের বাখরগঞ্জ জেলায় রামসিদ্ধি গ্রামের কাছে, বাখরগঞ্জকে বঙ্গালের অন্তর্ভুক্ত মনে করা তাই খুবই সঙ্গত। তৃতীয়ত, বঙ্গের অন্তর্গত নাব্য অর্থগতভাবে পরবর্তী কালের 'ভাটি' অঞ্চলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অন্যভাবে, নাব্য বা বাখরগঞ্জ মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ভাটি অঞ্চলের সঙ্গে অভিন্ন এবং মানিকচন্দ্রের গানের 'ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি' বাক্যটি ভাটি ও বঙ্গাল অর্থাৎ নাব্য-বাখরগঞ্জ ও বঙ্গালের সনাক্তীকরণে সহায়ক। এই সব কারণে অনুমান করি, আদিতে খুলনা-বাখরগঞ্জ বিশেষত দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রশায়ী অঞ্চলই বঙ্গাল দেশ এবং আদিতে এই অঞ্চল বঙ্গেরও প্রাণকেন্দ্র ছিল।

অন্যান্য ভৌগোলিক নামের মতো কালক্রমে বঙ্গাল নামেরও অর্থের আয়তন বেড়ে যায়। আবুল ফজলের উক্তি বা বিবৃতি অনুসারে, চট্টগ্রাম থেকে গারহি পর্যন্ত ছিল সুবা-বাংলার বিস্তার। বাংলা বা বাঙ্গালা যে বঙ্গালেরই রূপান্তর তা বলা নিষ্প্রয়োজন। অর্থাৎ আবুল ফজলের সময়ে বঙ্গ,

১ বুকম্যান-জ্যারেটের অনুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১২০।

সমতট, হরিকেল প্রভৃতি অন্যান্য জনপদ-নামগুলি ছাপিয়ে বঙ্গাল-বাঙ্গালা-বাংলা নামটিই প্রাধান্য লাভ করে এবং এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল এই অভিধায় চিহ্নিত হয়। মনে হয় তাঁর সময় থেকেই বাঙ্গালা-বাংলা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং কালক্রমে বৈদেশিকদের শ্রুতি ও স্মৃতিতে পৌঁছায়। ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বিশেষত পর্তুগীজ লেখকদের রচনায় 'বেঙ্গলা'র উল্লেখ তার প্রমাণ। গ্যাসটালডি (১৫৬১)-র মানচিত্রে এবং অন্যান্যদের রচনায় বেঙ্গলা একটি বিশিষ্ট বাণিজ্যকেন্দ্র। গ্যাসটালডির মানচিত্র দেখে মনে হয়, বেঙ্গলা পদ্মা-মেঘনার সংযোগস্থলের কাছে কোথাও অবস্থিত ছিল। কোন কোন পণ্ডিত বেঙ্গলাকে চট্টগ্রামের সঙ্গে সনাক্ত করেন, কারো কারো মতে প্রাচীন ঢাকাই এই বেঙ্গলা। বেঙ্গলার সঠিক অবস্থিতি নির্ণয় দুরূহ, তবে পূর্ববঙ্গের কোথাও নিশ্চয়ই। খুব সম্ভব মেঘনার খাড়ির কাছে ছিল এর অবস্থান।

॥ চার ॥

ইতিহাসের এমনই আশ্চর্য নির্দেশ প্রাচীন বঙ্গাল বা বাঙ্গালা সম্প্রতি-কালে মৌল অর্থেই পুনর্বার আত্মপ্রকাশ করল। ভৌগোলিকভাবে প্রতি-বেশী রাষ্ট্রের বাংলাদেশ নামকরণ যথার্থ হলেও সাংস্কৃতিক অর্থে সীমাবদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গের এবং প্রতিবেশী পূর্ববঙ্গের তাবৎ বঙ্গভাষীদের কাছে বাংলা-দেশ কি রাষ্ট্রগত অর্থে নিছক নামমাত্র? বাংলাদেশ নামের মধ্যে আবহমান কালের অখণ্ড বঙ্গভাষীগোষ্ঠীর ভাবমূর্তি কি রূপায়িত হয় নি?

ভারতশিল্পের আদিপর্ব, বিদেশবাণিজ্যের সংযোগে

একজন ইয়োরোপীয় পিকাসো যখন আফ্রিকান ভাস্কর্যে মনোযোগী হন এবং জনৈক ভারতীয় অবনীন্দ্রনাথ যখন জাপানী 'ওয়াশ' পদ্ধতিকে অবলম্বন করেন, তখন বোঝা যায় একালের শিল্পী সার্থক আত্মপ্রকাশের তাগিদে সচেতনভাবেই বিদেশী শিল্পশৈলীকে আত্মস্থ করতে চাইছেন। এ কালের মহৎ শিল্পী নিজের চেতনার রঙেই পান্নাকে সবুজ, চুনিকে লাল করে তোলেন, কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের রুচি-অভিরুচির দিকে লক্ষ না রেখেই সৃষ্টির আনন্দ পেতে প্রয়াসী। অর্থাৎ আধুনিক ললিতকলায় গোষ্ঠীচেতনার চাইতে ব্যক্তিচৈতন্য অধিকতর ক্রিয়াশীল। প্রত্যেক যুগেই মহৎ স্রষ্টার আবির্ভাব ঘটে, প্রাচীন ও মধ্য যুগেও বহু কীর্তিমান শিল্পী কালজয়ী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, কিন্তু আপেক্ষিকভাবে বলতে গেলে দূর-অতীতের শিল্পীরা কাজ করতেন গোষ্ঠীগতভাবে, কিছুটা সীমিত বিষয়ের পরিসরে, দেশ-কাল-ধর্মের দাবি মিটিয়ে ব্যক্তিগত দক্ষতার পরিচয়ও দিতেন, কিন্তু স্বীয় নাম-ঘোষণার মাধ্যমে সে পরিচয়কে সোচ্চার করতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। এই কারণেই অজন্তার ছবির বা প্রাচীন অ্যাসীরীয় বা মিশরীয় ভাস্কর্যের স্রষ্টাদের নাম ইতিহাস জানে না।

হারানো অতীতের বহির্বিশ্ব থেকে ভারতবর্ষে ফিরে এলে দেখা যাবে বিভিন্ন সময়ে এই গোষ্ঠীচেতনা কিভাবে ভারতশিল্পে উল্লেখ্য ভূমিকা নিয়েছে। এবং যখন ভারতশিল্পে বৈদেশিক শিল্পশৈলীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে তখনও তা সামগ্রিকভাবে শিল্পিগোষ্ঠীকেই স্পর্শ করেছে।

প্রাচীন ভারতশিল্পে বৈদেশিক প্রভাব প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবেই মনে পড়ে গান্ধার ও অন্ধ্র শিল্পের কথা। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম ও খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে গন্ধার অর্থাৎ বর্তমান পাকিস্তানভুক্ত পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গড়ে-ওঠা গান্ধার শিল্পশৈলীতে গ্রীক ও রোমান শিল্পধারার প্রভাব এতই প্রকট যে সময় সময় গান্ধার শিল্পকে ভারতের মাটিতে বিদেশী ফুল বলে মনে হয়। গান্ধার শিল্পের বিষয়বস্তু ভারতীয় : বুদ্ধ এবং তাঁর জীবনের ঘটনাবলি ; প্রকাশভঙ্গীতে এই শিল্প বৈদেশিক, গ্রীক-রোমান শৈলীর রচনা। গান্ধার বুদ্ধমূর্তির দিকে তাকিয়ে দেখুন, মনে হবে বুদ্ধদেব গ্রীক দেবতা অ্যাপোলোর ছদ্মবেশ নিয়েছেন কিংবা উল্টোভাবে, অ্যাপোলো

বুঝি বুদ্ধ সেজে বসে আছেন। তাঁর চুলের বিন্যাস বা কাপড় পরার ধরন বিদেশী দেবতার মতো। ভারতের অন্যত্র বুদ্ধমূর্তি গুম্ফহীন কিন্তু গান্ধার বুদ্ধ অনেক সময়ই সগুম্ফ। ভারতীয় যক্ষ, নাগ প্রভৃতি যখন গান্ধার শিল্পে দেখা দেন তখন তাঁরা আর ভারতীয় থাকেন না, গ্রীক-রোমান অ্যাটলান্টিস, হেরাক্লিস, পসাইডন প্রমুখ দেবতাদের নিকট আত্মীয় হয়ে পড়েন। কোন কোন গান্ধার রিলিফ কম্পোজিশনে করিন্থীয় কলোনেটের উপস্থিতি যেমন দৃষ্টি এড়াতে পারে না, তেমনি তক্ষশিলায় প্রাপ্ত গ্রীসীয় স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ সন্দেহাতীতভাবেই গান্ধার শিল্পের সূচনায় ও বিবর্তনে গ্রীক-রোমান শিল্পীদের ভূমিকার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে।

ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে একেবারে উল্টোদিকে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে গেলেও একই দৃশ্য চোখে পড়বে। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি সময়—এই কয়েক শ' বছরে কৃষ্ণা-গোদাবরী উপত্যকায় একটি শিল্পশৈলী গড়ে ওঠে। 'আন্ধ্র শিল্পশৈলী' নামে অভিহিত এই শৈলীতেও বিদেশী প্রভাব স্পষ্ট। অমরাবতী, নাগার্জুন-কোণ্ডা, ভট্টিপ্রোলু, জগজ্জপেটা, গুম্মুডিডুরু ইত্যাদি স্থানে আন্ধ্র শিল্পের যে-সব নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাতে রোমান শিল্প-ঐতিহ্যের আবিষ্কার দুরূহ নয়। অমরাবতী এবং নাগার্জুনকোণ্ডায় প্রাপ্ত কয়েকটি রিলিফ কম্পোজিশনের বিষয়বস্তু সুরাপানের দৃশ্য। রোমান সমাজে সুরার দেবতা ব্যাকাসের জনপ্রিয়তার ফলে এই সুরাপানের দৃশ্য রোমান শিল্পীদের আদৃত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং আলোচ্য আন্ধ্র রিলিফগুলিকে রোমান শিল্পীর কিংবা রোমান ঐতিহ্য-প্রভাবিত কোন ভারতীয় ভাস্করের কৃতি বলে মনে করতে হয়। ঐ রিলিফগুলিতে রূপায়িত সুরা-পরিবেশনকারিণীদের ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে, তারা বিদেশিনী, রোমান সাজ-সজ্জায় ললিতলোভন নগর-নন্দিনী। নাগার্জুনকোণ্ডায় যে-সমস্ত টেরাকোটা আবক্ষ-মূর্তি পাওয়া গেছে, সেগুলিতেও রোমান শিল্প-ভাষার উচ্চারণ স্পষ্ট। অমরাবতীর ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত পর্যাপ্ত সংখ্যক রোমান মুদ্রা ও মৃৎপাত্র, কিংবা নাগার্জুনকোণ্ডায় প্রাপ্ত রোমান অ্যাম্ফিথিয়েটারের অবশেষ রোমান সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন অন্ধ্রদেশের যোগ-সম্পর্কের পরিচয় বহন করে।

দক্ষিণে গেলে পণ্ডিচেরীর কাছে আরিকামেডুর ধ্বংসাবশেষ দেখা যাবে। হারানো অতীতের এই সমৃদ্ধ শহর খুঁড়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা যে-সমস্ত জিনিস আবিষ্কার করেছেন, তার একটি বড়ো অংশ স্বয়ং রোমান-ভাবাপন্ন ভারতীয় কারিগরদের তৈরি। মৃৎপাত্র, মুদ্রা, কাচের জিনিস, মূল্যবান পাথরের

অলঙ্কার ইত্যাদি পুরা নিদর্শনগুলির অধিকাংশই আদ্যন্তভাবে রোমান। ভারতবর্ষে এই রোমান সভ্যতার বিস্তৃতি দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলেই আবদ্ধ থাকে নি, অন্যত্রও রোমান সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। অন্ধ্রপ্রদেশের কোণ্ডাপুরে প্রাপ্ত সম্রাট টাইবেরিয়াসের মুদ্রার টেরাকোটা অনুকৃতিগুলি বা মহারাষ্ট্রের কোল্হাপুরে আবিষ্কৃত পসাইডনের ব্রোঞ্জ মূর্তির উল্লেখ এ প্রসঙ্গে করা যেতে পারে।

দক্ষিণ থেকে উত্তরে ফিরে গিয়ে আর-একটি পুরোন এবং প্রসিদ্ধ জায়গায় প্রত্নবিদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যেতে পারে। মথুরা নামে বিখ্যাত এই শহর থেকে, যে-সব পুরাদ্রব্য পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে আছে কিছু ভাস্কর্য-কৃতি, রিলিফ কম্পোজিশন্, যেগুলি রোমান শৈলী-প্রভাবিত। উদাহরণ-স্বরূপ, খ্রীস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকের কিছু রিলিফের বিষয়বস্তু সুরাপানের দৃশ্য, যে- দৃশ্য আমরা ইতিপূর্বে অমরাবতী ও নাগার্জুনকোণ্ডার কিছু রিলিফে দেখেছি।

ভারত-শিল্পে এই বিদেশী শিল্পশৈলীর সংক্রমণ ঘটলো কেমন করে? গ্রীক ও রোমান শিল্পধারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে প্রধানত বাণিজ্যসূত্রে—স্থলপথে এবং জলপথে। গান্ধার শিল্পে স্থলবাণিজ্যের এবং আন্ধ্র শিল্পে জল-বাণিজ্যের মাধ্যমে এই বৈদেশিক শিল্পভাষার আমদানি ঘটে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, বিশিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য প্রাচীন কাল থেকেই গান্ধার বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে গুরুত্ব লাভ করেছিল। প্রাচীন বাহলীক বা বর্তমান বালখ থেকে একটি পথ গন্ধারের মধ্য দিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে বিস্তৃত ছিল আর এই পথের উপরেই ছিল গান্ধার শিল্পের দু'টি বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র—বেগ্রাম ও তক্ষশিলা। বেগ্রামে আবিষ্কৃত খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের একটি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। কারণ, এই বাড়ির দু'টি ঘর থেকে রোমান, সিরিয়ান, মিশরীয়, চীনে প্রভৃতি বিভিন্ন বিদেশী শৈলীর শিল্পদ্রব্য পাওয়া গেছে। ফলত আমার এই অনুমান অসঙ্গত নয় যে, ঐ ঘর দু'টি ছিল কোন সওদাগর বা বণিকগোষ্ঠীর গুদামঘর যেখানে দেশ-বিদেশের শিল্পদ্রব্য জমা করে রাখা হতো। এই ঘর দু'টিতে আবিষ্কৃত গ্রীক-রোমান শিল্পনিদর্শনগুলি যেহেতু বাণিজ্যসূত্রে গন্ধারে এসেছিল, সুতরাং গান্ধার শিল্পে বাণিজ্যপথে, কিঞ্চিৎ অন্যভাবে বাণিজ্যের প্রেরণায়, গ্রীক-রোমান শিল্পশৈলীর অনুপ্রবেশ ঘটবে, এটা খুব আশ্চর্যের নয়। গন্ধারের অন্যতম রাজধানী তক্ষশিলা ও চারপাশের অঞ্চলে খ্রীস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকের বেশ কিছু স্টাকোর জিনিস পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে মানুষের ছাড়া

বিদেশী দেবদেবীর মূর্তি আছে। এ সব স্টাকোর কাজে রোমান প্রভাব এতই প্রকট যে এগুলিকে কোন রোমান কারখানায় তৈরি মনে করা অসঙ্গত নয়। আলেকজান্দ্রিয়ার মাধ্যমে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারত-বর্ষের যে বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল, তারই ফলে গন্ধারে স্টাকো টেকনিক প্রবর্তিত হয়, যে-টেকনিকের জনপ্রিয়তা অসংখ্য গন্ধার স্টাকোতে সপ্রমাণ।

গন্ধারের মতো অন্ধ্রপ্রদেশও রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপন করেছিল এবং এই সম্পর্ক ছিল জলপথসঞ্চারী। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের শেষ কয়েকটি দশক থেকে শুরু করে তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত এই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। ইতিপূর্বে যে আরিকামেডুর কথা বলেছি, তা যে একটি বিশিষ্ট রোমান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে সে কথা প্রমাণিত হয়েছে। এই ব্যাবসা-বাণিজ্যের ফল সমৃদ্ধি, সাধারণ জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ন এবং সমকালীন শিল্পেও অনিবার্যভাবে এই অর্থনৈতিক ঘটনার ছাপ পড়েছে। বিদেশী বিষয়বস্তুর কথা ছেড়েই দিলাম, এই সময়ের আন্ধ্র শিল্পে একটি সচ্ছল সুখী সমাজের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়, যে-সমাজে জীবনের অপর নাম আনন্দ। অর্থাৎ পূর্বযুগের ও অন্য অঞ্চলের, যেমন সাঁচী-ভারহুত-বোধগয়ার, শিল্পের সঙ্গে আন্ধ্র শিল্পের এই চরিত্রগত পার্থক্যের মূলে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের সূত্রে স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষে বিদেশী শিল্পী-দের আগমন ঘটেছিল। গন্ধার বা অন্ধ্রপ্রদেশে কিংবা আরিকামেডু-কোণ্ডা-পুর-মথুরা প্রভৃতি জায়গায় আদ্যন্ত বিদেশী জিনিসপত্র থেকে সে অনুমান করা চলে। ভারতীয় শিল্পীরা তাঁদের বিদেশী বন্ধুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে-ছিলেন, এটি আরেকটি সঙ্গত অনুমান। ভারতের মাটিতে বিদেশী শিল্পীর উপস্থিতির প্রমাণ ভারতীয় সাহিত্যেও মেলে। প্রাচীন তামিল সাহিত্যে 'যবন শিল্পী'দের প্রশংসা তার প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত। খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর একটি জনপ্রিয় কিংবদন্তী অনুসারে, বিবিধ শিল্পকর্মে দক্ষতার কথা শুনে খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের ভারতের পহলববংশীয় সম্রাট গণ্ডোফেনিস সেণ্ট টমাসকে তাঁর রাজ্যে নিয়ে এসেছিলেন। ভারতে দেশান্তরের দক্ষ শিল্পীর সমাদরের এই দু'টি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যেতে পারে, দূর-অতীতে ভারতবর্ষে শিল্পশৈলীর সঙ্গে শিল্পীরও আমদানি ঘটেছিল। সরস্বতী যে কখনও কখনও লক্ষ্মীর সহগামী হন, ভারতশিল্পের প্রাচীন পর্বে বাণিজ্যসূত্রে বিদেশী শিল্প-শৈলীর সংক্রাম তার দীপ্ত দৃষ্টান্ত।

আনন্দ কুমারস্বামী, শতবর্ষে

ভারতশিল্পের প্রথম সার্থক ভাষ্যকার আনন্দ কুমারস্বামীর অভ্রভেদী পাণ্ডিত্য আর বিশ্বব্যাপী খ্যাতির খবর অনেকে হয়তো রাখেন, (যদিচ তাঁর রচনার সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতিবান বাবুদের পরিচয় কতটা নিকট আমার সন্দেহ), কিন্তু ঈশ্বর যে তাঁকে রূপেও ঐশ্বর্যবান করেছিলেন, এ তথ্য হয়তো অনেকের অজানা। যাঁরা তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁরা বলেছেন, কুমার-স্বামী ছিলেন ছ' ফিটের মতো লম্বা, উন্নত নাসা এবং তীক্ষ্ণ চোখের সুপুরুষ। একজন তো কাব্যই করে ফেলেছেন, ওঁকে দেখলে কে বলবে মানুষ, যেন চন্দন-কাঠে খোদাই-করা সাক্ষাৎ ভগবান।

কলম্বোর বিখ্যাত ব্যারিস্টার স্যার মুতু কুমারস্বামীর একমাত্র সন্তান আনন্দ-র জন্ম ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ২২ অগস্ট। তাঁর মা এলিজাবেথ ক্লে বীবি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের মেয়ে, কেণ্টে তাঁদের আদিনিবাস, সেজন্য আনন্দের সঙ্গে কেণ্টিশ শব্দটিও জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তাঁর পুরো নাম হলো আনন্দ কেণ্টিশ কুমারস্বামী। তিনি নিজে লিখতেন আনন্দ-কে-কুমারস্বামী, সাধারণ্যে অবশ্য আনন্দ কুমারস্বামী নামটিই চলে গেছে। ঈষৎ অবান্তর হলেও বলে রাখি, কুমারস্বামীরা ছিলেন হিন্দু, শৈবমতাবলম্বী এবং তাঁরা দক্ষিণ ভারত থেকে সিংহলে গিয়ে বসতি করেছিলেন।

জন্মের দু বছরের মধ্যেই আনন্দ বাবাকে হারান। মায়ের সঙ্গে তিনি বিলেত চলে যান, সেখানেই লেখাপড়া শেখেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূতত্ত্বে ও উদ্ভিদবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়ে বি. এস-সি পাশ করেন। এর পর ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ভূতত্ত্বে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করে চলে আসেন কলম্বোতে। পঁচিশ বছর বয়সেই মিনারেলজিক্যাল সার্ভে অফ সিলোনের ডিরেক্টর-এর ঈর্ষণীয় পদ লাভ করেন। ১৯০৩ থেকে ১৯০৬ তিন বছর তিনি এই পদে ছিলেন, কিন্তু এই বছর কয়টি তাঁর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সময়েই তিনি সিংহলের শিল্প ও সংস্কৃতিতে গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। এবং কালক্রমে স্বাভাবিক-ভাবেই সিংহলের সঙ্গে অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত ভারতবর্ষের শিল্পকলার প্রতি তাঁর সে আকর্ষণ বিস্তৃত হয়। কৃতী ভূতাত্ত্বিক ক্রমশ ভারতের শিল্পকলা, দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যয়নে নিবিষ্ট হতে থাকেন,

উপলব্ধি করেন বিশ্বের দরবারে পরাধীন স্বদেশের শিল্প-সংস্কৃতির সম্প্রচারের প্রয়োজনীয়তা। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ আনন্দ এই সময় 'সিলোন ন্যাশানাল রিভ্যু' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করতেন। ১৯০৬ সালে তিনি সচ্ছল জীবনের মোহ কাটিয়ে মোটা মাইনের চাকুরি ছেড়ে চলে গেলেন লণ্ডনে। উদ্দেশ্য, আরো গভীরভাবে ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতির অধ্যয়ন; লক্ষ্য বিশ্বসভায় স্বমহিমায় ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা।

১৯১০ খ্রীস্টাব্দে দেশে অর্থাৎ ভারতে এলেন, সারা ভারতে বিশেষত উত্তর ভারতে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করলেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনবদ্য সব শিল্পকর্ম, বছরখানেকের মধ্যে গড়ে তুললেন এক লোভনীয় শিল্পসংগ্রহ। বারাণসীর অগ্রণী নাগরিকদের হাতে সে শিল্পসম্ভার তুলে দিতে চাইলেন, অনুরোধ জানালেন একটি মিউজিয়াম গঠনের। পরে বারাণসীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে তিনি নিজের জন্য সামান্য একটি অধ্যাপক-পদ চেয়েছিলেন এবং কর্তৃপক্ষ রাজী হন নি। ভাগ্যিস রাজী হন নি, হলে আজকের কুমারস্বামীকে আমরা পেতাম কিনা সন্দেহ!

॥ দুই ॥

১৯১১ সালের মাঝামাঝি সময়ে আনন্দ ফিরে যান লণ্ডনে, কিন্তু তাঁর অল্পবিস্তর এক বছরের ভারতবাস আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। এই এক বছরে তিনি হ্যাভেল ও নিবেদিতার সহযোগে ভারতশিল্পের ঐশ্বর্য ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে সমকালীন শিল্পীদের চৈতন্য ফেরান, তাঁদের অন্ধ পরানুকরণের মোহ থেকে মুক্ত করেন। তখন (বিদেশী চিত্ররীতির নকলনবিশ রবি বর্মার রমরমা)। এই সময় তিনি ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন, রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে দিন কতক শান্তিনিকেতনে অবসর যাপন করেন, এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কুমারস্বামীই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে পশ্চিমী পাঠকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। অজিত চক্রবর্তীর সহযোগিতায় তাঁর অনূদিত কবিতাগুলি ১৯১১ সালে *Modern Review* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, পরে সেগুলি তাঁর *Art and Swadeshi* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া ১৯১১ সালে তিনি কলকাতায় Indian Society of Oriental Art-এর এক অধিবেশনে মুঘল ও রাজপুত চিত্রকলা সম্পর্কে এক ভাষণ দেন। জ্ঞানগর্ভ অসাধারণ সেই ভাষণ যাঁরা শুনেছিলেন তাঁদের সেদিন মুগ্ধ

অসুবিধা হয়নি আনন্দ কুমারস্বামীর কল্যাণেই অচিরে ভারতশিল্প তার লুপ্ত-গৌরব ফিরে পাবে।

এবং তাঁদের সেই বিশ্বাস সত্যে পরিণত হতে দেরি হয় নি। বলতে গেলে কয়েক বছর আগেও তাঁরা এই আভাস পেয়েছিলেন। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয় কুমারস্বামীর *Mediaeval Singhalese Art* এবং একটি চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ *Aims of Indian Art*। ১৯১২ সালে বেরোল তাঁর আরো বিখ্যাত প্রবন্ধ *Dance of Siva*, মাদ্রাজের একটি পত্রিকায়, কুমারস্বামীর সঙ্গে যার যোগ এতই ওতঃপ্রোত যে, কুমারস্বামী বললেই তাঁর *Dance of Siva*-এর কথা মনে পড়ে যায়। পরের বছর বেরোল *Art and Craft of India and Ceylon* স্বল্প পরিসরে উভয় দেশের কারু ও চারু শিল্পের সুলিখিত সর্বাঙ্গীণ বিবরণ। এর পর তিনি আমৃত্যু অবিরলভাবে লিখে গেছেন ভারত ও বহির্ভারতের (মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি যেসব অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পত্তন হয়েছিল) শিল্পকলা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক বই, অসংখ্য প্রবন্ধ। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে-থাকা তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা পাঁচশোরও বেশি।[১] এই সব বই ও প্রবন্ধের পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন, কুমারস্বামীর অধ্যয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অধ্যবসায়, শ্রুতির সঙ্গে স্মৃতি। তাঁর চোখের দেখা ছিল ব্যাপক, দেখার চোখ ছিল গভীর। পাঠকের চিন্তাকে উসকে দেওয়ার মতো একাধিক মন্তব্য নেই এমন রচনা তাঁর অনুপস্থিত বললেই চলে। বস্তুত, ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতির এমন কোন প্রসঙ্গ নেই যা আনন্দ কুমারস্বামীর দৃষ্টিবলয়ের বাইরে থেকে গেছে। এবং শুধু শিল্পই বা কেন, ভারতের সাহিত্য, দর্শন, ধর্মকর্ম, ধ্যানধারণা মায় সমকালীন রাজনীতি ও স্বরাজ-চিন্তা সম্পর্কেও তিনি বিস্তর লিখে গেছেন। তাঁর অনেক বইয়ের কয়েকটির নামোল্লেখেই বোঝা যাবে তাঁর মনীষার ব্যাপকতা : *Essays in National Idealism* (১৯০৯), *Rajput Painting*, (১৯১৬), *The Mirror of Gesture* (১৯১৭), *Dance of Siva and other Essays* (১৯১৮), *History of Indian and Indonesian Art* (১৯২৭), *A New Approach to the Vedas* (১৯৩৩), *Elements of Buddhist Iconography* (১৯৩৪),

১ আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় দুটি বিরাট খণ্ডে তাঁর প্রবন্ধাবলির নির্বাচিত সংকলন প্রকাশ করছেন, আরেকটি সংকলন বেরোবে পেলুইন প্রকাশন-সংস্থা থেকে।

Spiritual Authority and Temporal Power (১৯৪২), *Hinduism and Buddhism* (১৯৪৩) ইত্যাদি। মৃত্যুর বছর বেরোয় *Am I My Brother's Keeper*। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর আনন্দ কুমারস্বামী লোকান্তরিত হন, আমেরিকার বস্টন-এ। এখানে উল্লেখ করা দরকার, যে- বস্টন মিউজিয়ামের ভারতশিল্প বিভাগে খ্যাতি আজ বিশ্বব্যাপী, তার সূত্রপাত আনন্দ কুমারস্বামীর নিজস্ব শিল্পসংগ্রহে, যে- সংগ্রহ গ্রহণ করতে একদিন বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় অপারগ হয়েছিল। এবং ১৯১৭ থেকে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের মৃত্যুদিন পর্যন্ত এই মিউজিয়াম ছিল আনন্দ কুমার-স্বামীর সাধন-ক্ষেত্র, এখন যে আমাদের তীর্থভূমি।

।। তিন ।।

বর্তমান নিবন্ধের সীমাবদ্ধ পরিসরে আনন্দ কুমারস্বামীর বিপুল রচনা-সম্ভারের মূল্যবত্তা বা তাঁর মনীষার সর্বাঙ্গীণ আলোচনা অসম্ভব। তিনি শুধু শিল্পকলা সম্পর্কেই লিখেছেন তা নয়, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি এমন কি ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কেও চিন্তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বিখ্যাত ওয়েবস্টার ইংরেজী অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৩৪) প্রকাশের সময় সংকলক ও প্রকাশকরা তাঁর সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। মাতৃভাষা ইংরেজী ছাড়া আরও দশ-বারোটা ভাষায় তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। গল্প শুনেছি, একবার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক মেধাবী ছাত্র একটি নৈশভোজে তাঁর পাশে বসেছিল। কথায় কথায় তিনি ছাত্রটির গ্রীক ও ল্যাটিনে পারদর্শিতার কথা জানতে পেরে তার সঙ্গে ল্যাটিনে কথাবার্তা শুরু করেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ছাত্রটির তো প্রাণান্তকর অবস্থা, বেচারার সেদিনের নৈশভোজের আনন্দই নাকি মাটি হয়েছিল।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমাদের সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাসে আনন্দ কুমারস্বামী রবীন্দ্রনাথের নিকটতম প্রতিবেশী। রবীন্দ্রনাথ যদি আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের স্তরে উন্নীত করে থাকেন, কুমারস্বামী তাহলে ঐশ্বর্যবান সনাতন ভারতশিল্পকে পুনরাবিষ্কারের মাধ্যমে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং এক্ষেত্রে কুমারস্বামী রবীন্দ্রনাথের সহযোগী। আমাদের জাতীয় সত্তার উজ্জ্বল বিকাশে সহায়ক হয়েছে রবীন্দ্র-নাথের অসামান্য প্রতিভা, এবং এ কাজে রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করেছে আনন্দ কুমারস্বামীর সর্বতোভদ্র পাণ্ডিত্য। বিশ্বখ্যাতি অর্জনের আগেই

যে দু চারজন মনীষী রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে উপলব্ধি করেছিলেন, কুমার-স্বামী যে তাঁদের অন্যতম এ সূত্রে তথ্যটি আর-একবার স্মরণ করা যেতে পারে। এবং আরও স্মরণীয়, যে- চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথকে তাঁর দেশ স্বীকৃতি জানাতে ইতস্তত করেছিল, মার্কিনপ্রবাসী সিংহলী-ভারতীয় আনন্দ কুমারস্বামী বস্টনে (১৯৩০) অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রচিত্র প্রদর্শনীর তালিকার সঙ্গে কবির চিত্রকলা সম্পর্কে স্বরচিত প্রবন্ধটিকে ভূমিকা হিসাবে যুক্ত করে দিয়েছিলেন। আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রকলার সগোত্র রবীন্দ্রচিত্রকর্ম সম্পর্কিত এই প্রবন্ধটি প্রমাণ করে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের শিল্পসম্পদ তাঁর চিন্তাজীবনের প্রধান অবলম্বন হলেও কুমারস্বামী আধুনিক শিল্পকলার সমঝদার ও তৎসংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন।

সন-তারিখের হিসাবে, ১৯০৮ থেকে ১৯৪৭, প্রায় চল্লিশ বছর ধরে প্রচুর লিখেছেন আনন্দ কুমারস্বামী। তাঁর জীবদ্দশাতে এবং তাঁর মৃত্যুর পরে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তাত্ত্বিক বিচারের একাধিক পদ্ধতিরও আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। ফলে তাঁর সব উক্তি, সব মন্তব্য এখন আর সর্বজনগ্রাহ্য নয়, হতেও পারে না। এবং কুমারস্বামীর মতো যুক্তিশীল মুক্ত মনের মানুষ যদি তাঁর রচনাবলির পুনর্লিখনে প্রবৃত্ত হতেন তাহলে তিনি নিজেই তাঁর বহু মত বর্জন করতেন, সংশোধন করতেন একাধিক উচ্চারণের। তিনি যা লিখেছেন, তা দিয়েই হবে তাঁর বিচার, অনায়ত্ত কারণে তিনি যা লিখতে পারেন নি তা দিয়ে তাঁর বিচার তো অন্যায়ের নামান্তর। বরং অতি-খুঁতখুঁতে সমালোচককেও স্বীকার করতে হবে, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে *History of Indian and Indonesian Art* গ্রন্থে কুমারস্বামী আমাদের শিল্পেতিহাস রচনার যে- কাঠামোটি গড়ে দিয়ে গিয়ে-ছিলেন, এখনও পর্যন্ত সেটিতে বিশেষ কোন হেরফের হয় নি। পরবর্তী কালে এদেশের-ওদেশের একাধিক পণ্ডিত ভারতশিল্পের ইতিহাস লিখেছেন, কিন্তু সেসব রচনার কাঠামোটা যে হরেদরে কুমারস্বামীর, তাতে সন্দেহ নেই। শিরোনামেই স্বপ্রকাশ, এই অসাধারণ গ্রন্থকে তিনি শুধু ভারতের ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন নি, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি বহির্ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় শিল্পরীতির প্রভাব ও প্রসার সম্পর্কেও এতে আলোচনা করেন এবং এই সব অঞ্চলের শিল্পকলাকে বাদ দিয়ে ভারতশিল্পের ইতিহাস যে অসম্পূর্ণ এই তথ্যটি প্রতিষ্ঠিত করেন। কিংবা উল্লেখ করা যাক তাঁর *Rajput Paintings* গ্রন্থের। মধ্য-যুগীয় চিত্রকৃতির স্তূপ থেকে তিনিই প্রথম রাজস্থানী চিত্রকলাকে উদ্ধার

করে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত করেন, মুঘল ও রাজপুত চিত্রশৈলীর পার্থক্য দেখান, রাজস্থানী চিত্রকলার স্নিগ্ধ নির্যাস উপহার দেন তাঁর পাঠকদের। এই বইয়েরই পরিপূরক *Catalogue of Indian Collections in the Museum of Fine Arts, Boston* (চতুর্থ–ষষ্ঠ খণ্ডে, ১৯২৪-২৬) গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে জৈন পুঁথিচিত্র, মুঘল ও রাজপুত চিত্রশিল্পের বহু অনবদ্য নিদর্শন এবং উপযোগিতায় এটি আজও অপরিহার্য। কুমারস্বামীর পর এ বিষয়ে আরও অনেকে লিখেছেন, অনেক তথ্য বেরিয়েছে, কিন্তু তাঁর *Rajput Paintings* ও পূর্বোক্ত *Catalogue*-কে সরিয়ে রেখে রাজস্থানী চিত্রকলা সম্পর্কে গবেষণা করা এখনও দুরূহ। অনুরূপভাবে মুঘল চিত্রকলার চর্চাতেও কুমারস্বামীর ভূমিকা পথিকৃতের। আমার মতে তিনিই প্রথম তাঁর *Selected Examples of Indian Art and Indian Drawings* (২য় খণ্ড, ১৯১০-১২) গ্রন্থে, *Originality in Mughal Painting, Night Effects in Indian Art* ও *Mughal Portraiture* প্রবন্ধগুলিতে এবং পূর্বোক্ত বস্টন মিউজিয়ামের *Catalogue*-এ (ষষ্ঠ খণ্ডে) মুঘল চিত্রশিল্পের বিষয়, রীতি ও প্রকরণ সম্পর্কে প্রথম বিশ্লেষণী ও বৈদগ্ধ্যগর্ভ আলোচনার সূত্রপাত করেন। শুধু কি ভাস্কর্য ও চিত্রকলা? ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধের প্রতি তিনিই প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর বৌদ্ধ শাস্ত্র থেকে স্থাপত্য-বিষয়ক পরিভাষা- সঙ্কলন মূল্যবত্তায় এখনও অম্লান।

আনন্দ কুমারস্বামী যে- সময় ভারতশিল্পের চর্চায় অধ্যয়নে রত হন ভারতবর্ষ তখন বিদেশী শক্তির পদানত। শুধু রাজনৈতিকভাবে নয়, সাংস্কৃতিকভাবেও। সাহেব-পণ্ডিতরা আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে যা বলতেন আমাদের পূর্ব-পুরুষরা তা-ই শুনে যেতেন। বিরল প্রশংসায় আত্মতৃপ্ত, অঢেল নিন্দায় নিষ্প্রতিবাদ। আমাদের বহুমুখ বহুভুজ দেব-দেবীদের মূর্তি নিয়ে তো এইসব সাহেব-পণ্ডিতের ঠাট্টা-বিদ্রূপের অন্ত ছিল না। আনন্দ কুমারস্বামী প্রথম জোর গলায় সাহসের সঙ্গে তাঁদের বললেন, তোমরা ভারতশিল্পের মর্মার্থই ধরতে পারো নি; আমাদের প্রাচীন শিল্পীরা নিছক শিল্পের জন্য শিল্পসৃষ্টি করেন নি, তাঁদের কাছে শিল্প ছিল আত্মিক প্রয়োজনের বাহন, তাঁদের অন্তর্জীবনের অভিব্যক্তি, অতএব ভারতের ধর্মকর্ম ধ্যান-ধারণার সম্যক জ্ঞান অর্জন করার পর তোমরা ভারতশিল্পের বিচার করতে বসো। তাঁর সাহসী কথাবার্তায় প্রথমে তাঁরা বিস্মিত ও বিরক্ত হলেন, কিন্তু কালক্রমে তাঁর বিপুল অধ্যয়ন ও শাণিত যুক্তির কাছে তাঁরা মাথা নত করলেন। মহাদেবের যে- নটরাজ মূর্তি এক সময় তাঁদের কাছে

ছিল বিস্ময় ও কৌতূহলের বিষয়, কুমারস্বামীর ব্যাখ্যা[১] (নটরাজ সম্পর্কিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃ. ১২১) শোনার পর তাঁরা বললেন, অপূর্ব। বিশ্বসৃষ্টির মূল তত্ত্ব, বিজ্ঞান, ধর্ম ও শিল্পের সমন্বিত রূপ কি অনন্য মাধুর্যে দক্ষিণ ভারতীয় চতুর্ভুজ নটরাজ মূর্তিতে বাঙময় হয়ে উঠেছে, কুমারস্বামীর কাছ থেকে তা শোনার পর নটরাজ সম্পর্কে তাঁরা বিস্ময়ে আবিষ্ট, প্রশংসায় পঞ্চমুখ। উল্লেখ করা দরকার, তাঁর এই নটরাজ মূর্তির ব্যাখ্যায় মূর্তিতত্ত্ব (iconology) বিষয়ক রচনাপদ্ধতির প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে। এরউইন প্যানফস্কির *Studies in Iconology* (১৯৬২) বেরোবার অনেক আগেই তিনি দেব-দেবীর প্রতিকৃতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসন্ধানের প্রতি পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর এই রচনাপদ্ধতির প্রয়োগ 'শ্রী-লক্ষ্মী' ও ইন্দ্র' সংক্রান্ত রচনায় (*Eastern Art*, Vol. I) এবং *The Yaksas* ও *Elements of Buddhist Iconography* (১৯৩৪) গ্রন্থ দু'টিতেও দেখা যায়। নটরাজ-মূর্তির ব্যাখ্যার মতো বিখ্যাত তাঁর আর-একটি প্রবন্ধ *The Origin of the Buddha Image* (১৯২৭ সালের *Art Bulletin*-এ প্রকাশিত)। এই প্রবন্ধেও কুমারস্বামীর অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণক্ষমতার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে গভীর আত্মবিশ্বাস। এক সময় ফুশে-র মতো বিদেশী পণ্ডিতরা বলতেন, গন্ধার অর্থাৎ পেশাওয়ার-রাওয়ালপিণ্ডি অঞ্চলেই প্রথম বুদ্ধের মানুষী মূর্তির উদ্ভব, আর তার রূপকার অ-ভারতীয়, গ্রীক শিল্পী। আত্মপ্রত্যয়ী কণ্ঠে কুমারস্বামী বললেন, দাঁড়ানো যক্ষমূর্তির সনাতন আদর্শেই বুদ্ধের দাঁড়ানো ভঙ্গীর মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন ভারতীয় শিল্পী, আর বুদ্ধের আসনমূর্তির আদর্শ তো সিন্ধু-সভ্যতার পশুপতি-শিবের যোগাসন মূর্তি পর্যন্ত টেনে নেওয়া যায় : তা ছাড়া আকৃতি-প্রকৃতিতে গন্ধার মূর্তি থেকে স্বতন্ত্র মথুরার বুদ্ধ-মূর্তিগুলি যে গন্ধার-পরবর্তী কালের রচনা তার প্রমাণ কোথায়? অকাট্য যুক্তি, নির্ভুল প্রমাণ, কুমারস্বামীর মত মেনে নিলেন পশ্চিমী গবেষকরা। এ ধরনের স্বাধীন চিন্তার বিশ্লেষণী ক্ষমতার আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। রোদেনস্টাইন ঠিকই বলেছিলেন, আজ ভারতবর্ষ যদি বিশ্বশিল্পের ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে এসে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে তার প্রধান কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন আনন্দ কুমারস্বামী।

---

১ তাঁর এই বিখ্যাত প্রবন্ধ ১৯১২ সালের জুলাই মাসে মাদ্রাজের 'সিদ্ধান্তদীপিকা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় এবং অগ্রণী মূর্তিশাস্ত্রবিদ্ গোপীনাথ রাও এটিকে very beautiful article রূপে বর্ণনা করে পুরো প্রবন্ধটিই তাঁর *Elements of Hindu Iconography* (Vol. II, pp. 231 ff) গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত করেন।

॥ চার ॥

জন্মসূত্রে পরাধীন দেশের এই মনীষীর শিক্ষাজীবন কেটেছিল স্বাধীন দেশে, সম্ভবত সেই কারণে তিনি নিজে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারতেন এবং অন্যদের পরানুকরণের মোহমুক্তির নির্দেশ দিতেন। ভারতবর্ষ ক্রমশ তার নিজস্ব আত্মিক সম্পদে আত্মস্থ হোক এই ছিল তাঁর অভীষ্ট, তাঁর একান্ত কামনা। দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যও তাঁর আগ্রহের ও চেষ্টার অন্ত ছিল না। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, প্রবাসী হয়েও তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন, নিউইয়র্কে স্থাপন করে-ছিলেন 'ইণ্ডিয়ান কালচারাল সেণ্টার' (১৯২৪) এবং ওয়াশিংটনে 'ন্যাশনাল কমিটি ফর ইণ্ডিয়ান ফ্রীডম'-এর সভাপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন (১৯৩৮)। কিন্তু নিখাদ দেশপ্রেমিক[১] হয়েও তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক, দেশের মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তিনি বিশ্বমায়ের আঁচলের স্পর্শ অনুভব করতেন। মৃত্যুর প্রায় মাসখানেক আগে ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট বস্টনে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলনের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, আমার জাতির এই পতাকা যে জাতীয়তা-সর্বস্ব নয় এজন্য আমি গর্বিত, সমগ্র বিশ্বভুবনের সঙ্গে সমগ্র বিশ্বমানবের সংযোগ এই পতাকার প্রতীকে নির্দেশিত। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তাঁর মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতির সেরা জিনিসগুলির সুন্দর মেলবন্ধন ঘটেছিল। আর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এমন আশ্চর্য মিলনের প্রতিমূর্তি আনন্দ কুমারস্বামীকে কিপলিঙ্ সাহেব যে বুঝতে পারেন নি, এটা তাঁর দুর্ভাগ্য।

১ কুমারস্বামীর স্বদেশচিন্তা ও জাতীয়তাবোধের পরিচয় লাভের জন্য তাঁর *Essays in National Idealism* অবশ্যপাঠ্য।

ইতশ্চিন্তা,

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মানবতার বিজ্ঞানী-শিল্পী

আজ থেকে ৫০৪ বছর আগে—১৪৫২ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল—লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আবির্ভাব। ইতালীর দা ভিঞ্চি শহরে জন্ম বলে তিনি দা ভিঞ্চি অন্যনামে পরিচিত হন। ১৪৬৯ সালে তিনি বাবার সঙ্গে ফ্লোরেন্স-এ আসেন, শিক্ষানবিশি শুরু করেন সেকালের নামী ভাস্কর, চিত্রকর ও স্বর্ণকার ভেরোচ্চিয়োর (১৪৩৫-৮৮) কাছে। কয়েক বছর পরে তিনি স্বাধীন-ভাবে শিল্পচর্চায় মনোযোগী হলেন, গুরুর সঙ্গে অবশ্য তাঁর সম্পর্ক আগের মতোই হার্দ্য ও ঘনিষ্ঠ ছিল। শোনা যায়, ছবি আঁকাতে শিষ্যের পাকা হাতের পরিচয় পেয়ে ভেরোচ্চিয়ো চিত্রাঙ্কন ছেড়ে ভাস্কর্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন।

শ্রুতকীর্তি চিত্রকর হলেও লিওনার্দোর চিত্রের সংখ্যা খুবই কম। 'মোনালিসা' ও 'লাস্ট সাপার' সহ মাত্র সতেরোটি ছবি আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে আবার চারটি অসমাপ্ত। সমকালীন ও কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালের নকলনবিশদের কাজ থেকে অনুমান করা হয়, আলোচ্য সতেরোটি ছাড়া লিওনার্দো আরও পাঁচটি কিংবা দশটি ছবি এঁকেছিলেন, যেগুলির মূল এখন আর পাওয়া যায় না। তবে তাঁর ডিজাইন ও স্কেচের সংখ্যা নগণ্য নয়, লিওনার্দোর শিল্পবিচারে যেগুলি যথেষ্ট সহায়ক। কিছু সংখ্যক স্কেচে শিল্পীর স্বহস্তলিখিত মন্তব্য বর্তমান, স্বভাবতঃই এগুলি নানা-ভাবে আকর্ষণীয় ও মূল্যবান। লিওনার্দোর কাজের একটি বড় অংশ লণ্ডনের উইণ্ডসর প্রাসাদে রয়েছে, 'মোনালিসা' ও 'জন দি ব্যাপ্‌টিস্ট' আছে প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়ামে, অন্যান্য ছবি ও স্কেচ মিলান, ভ্যাটিকান প্রাসাদ ও লেনিনগ্রাদ মিউজিয়ামে বর্তমান।

সাত-আট বছর আগে কলকাতার গভর্নমেণ্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফটস-এ লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ৮টি ছবি ও নকশার এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনী হয়েছিল। ইউনেস্কোর সহযোগিতায় কলকাতার আর্ট সোসাইটি এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন।

লিওনার্দোর বেশির ভাগ ছবি ১৪৭৩ থেকে ১৫০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আঁকা হয়; বিখ্যাত 'মোনালিসা' ছবিটি ১৫০৩ থেকে ১৫০৭ এর মধ্যেই

কোন সময়ে আঁকা। 'লাস্ট সাপার'-এর অঙ্কনকাল ১৪৯৭। 'লাস্ট সাপার'-এর অব্যবহিত পরে আঁকেন 'ভার্জিন অ্যাণ্ড চাইল্ড উইথ সেণ্ট অ্যানে', একেবারে শেষ দিককার অন্যতম বিখ্যাত ছবি 'জন দি ব্যাপ্‌টিস্ট', ১৫১৪ কি ১৫১৫ সালে আঁকা। অসমাপ্ত ছবিগুলির মধ্যে 'ক্রাইস্ট অ্যামঙ্গ দি ডক্টরস', 'ব্যাটল অফ অ্যাঙ্ঘিয়ারি', 'লেডা অ্যাণ্ড সোয়ান', 'ব্যাকাস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভাস্কর হিসাবেও নাকি লিওনার্দো আত্ম-প্রকাশ করেছিলেন, যদিও তাঁর ভাস্কর্যকৃতির কিছুই আজ আর অবশিষ্ট নেই।

মোনালিসা এবং লাস্ট সাপার ছবি দুটি যে শিল্পীকে অমরত্ব দিয়েছে, তা অকারণ নয়। বিষয়বস্তুর প্রকাশের সার্থকতায় এবং অঙ্কনগত নৈপুণ্যে এই দুই চিত্রকর্ম বিশ্বশিল্পের অনন্য সম্পদ। ফ্লোরেন্স-এর সুন্দরীশ্রেষ্ঠা শ্রীমতী লিসাকে সামান্য একটু হাসির আভাসে চিররহস্যময়ী করে রাখতে চেয়েছিলেন লিওনার্দো। শোনা যায়, যে-ঘরে বসে লিসাকে সামনে রেখে তিনি তাঁর প্রতিকৃতি আঁকছিলেন, গান-বাজনার মাধ্যমে সেই ঘরটিকে তিনি আনন্দমুখর করে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন ; উদ্দেশ্য, কোন সময়েই যাতে শ্রীমতী লিসা গম্ভীর বা বিষণ্ণ হয়ে না পড়েন। তারপর একদিন শ্রীমতী লিসার প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ হলে সবাই অবাক হয়ে দেখল রহস্য-সহাস শাশ্বতীকে। লাস্ট সাপার আঁকা হয় ডোমিনিকান সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীদের সংঘারামের ভোজনালয়ের দেওয়ালে। ছবির বিষয়বস্তু শিষ্যদের সঙ্গে যীশু-খ্রীস্টের রাত্রিকালীন ভোজন, যা তাঁর জীবনের শেষ ভোজন ; এই ভোজনের সময় যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, 'তোমাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। এই ছবি আঁকার সময় লিওনার্দো স্নানাহার ভুলে গিয়েছিলেন, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর হাত এবং তুলিকে বিরাম দেন নি। আঁকা শেষ হলে তিনি ঐ ঘরে আরও তিন-চারদিন ছিলেন ; ছবির চরিত্রগুলি ঠিক ঠিক ফুটে উঠেছে কিনা বিচার করার জন্য ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতেন, আত্ম-পরীক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। মোনালিসার মতো লাস্ট সাপারও বিষয়বস্তুর পরিস্ফুটনে এবং প্রকরণগত দক্ষতায় বিশিষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে। খাবার টেবিলে যীশুখ্রীস্ট এবং তাঁর শিষ্যরা, মাঝখানে যীশু, শুধু যীশু নন শিষ্যদের প্রত্যেকেও একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র ; নির্মম ভবিষ্যদ্বাণীতে শিষ্যদের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল শিষ্যদের মুখের ভাবে তা-ও চমৎকার ফুটে উঠেছে। এইখানেই লিওনার্দোর অনন্য শিল্প-দৃষ্টি ও অঙ্কন-নৈপুণ্য, ছবিকে তিনি কথা বলিয়েছেন। লাস্ট সাপার সম্পর্কে আর-একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য, টেম্পেরায়

ফ্রেস্কো বা দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের সাধারণ পদ্ধতির পরিবর্তে তেল রঙে তিনি দেওয়াল-চিত্রটি এঁকেছিলেন। এখানেও শিল্পীর পরীক্ষণপ্রিয় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, যদিও এ পরীক্ষার ফল খুব ভালো হয় নি, কারণ লিওনার্দোর জীবদ্দশাতেই ছবিটি দেওয়ালের ড্যাম্পের জন্য নষ্ট হতে চলেছিল। অনেক কষ্ট করে ছবিটিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো হয়েছে অবশ্য, তবে মূলের দীপ্তি ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণ উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

লিওনার্দোর ডিজাইন ও স্কেচের সংখ্যা নগণ্য নয় এবং এগুলিতেও তাঁর প্রতিভার পরিচয় প্রমূর্ত। এই সব কাজের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ম্যাডোনা সংক্রান্ত, কতকগুলি নিসর্গদৃশ্য, বাকি কিছু কাজে ঘোড়া ও অন্যান্য জন্তু জানোয়ারের প্রতিকৃতি বর্তমান। স্কেচগুলির কয়েকটিতে রয়েছে নর-নারীর শারীরিক খুঁটিনাটি, অন্যগুলিতে নানা যন্ত্রপাতির (বাস্তব ও পরিকল্পিত) নকশা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, লিওনার্দো শিল্পী হলেও বিজ্ঞানসুচেতন ছিলেন। যে কালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চা ছিল সীমাবদ্ধ, জগৎ ও জীবনের অনেক রহস্যই ছিল অজানা, সেই সময়ে এই প্রতিভাবান মানুষটি মানবদেহে রক্ত চলাচলের প্রক্রিয়া প্রায় ধরে ফেলেছিলেন। আকাশযান-বিদ্যা ও তরল পদার্থের গতিবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। বস্তুত পরবর্তী কালের কিছু বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তাঁর রেখাচিত্রে ও মন্তব্যে আভাসিত হয়েছিল। এই জন্যেই লিওনার্দোর স্কেচ ও ডিজাইনগুলি শিল্পকর্ম ছাড়া অন্যতর মূল্যে বিশিষ্ট সৃষ্টিরূপেও আকর্ষণীয়। এইজন্য তাঁর কাজে নিসর্গ সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রাকৃতিক শিলাগঠনের বৈচিত্র্য, মানুষের মুখশ্রীর সঙ্গেই মানুষের অঙ্গসংস্থানগত খুঁটিনাটি ধরা পড়ে। রূপক আর প্রতীকের প্রতিও শিল্পীর আকর্ষণ ছিল। লিওনার্দো শেষ দিকে 'প্লাবন ও সৃষ্টির ধ্বংস' বিষয়কে অবলম্বন করে 'ডেলিউজ' নামীয় কিছু ছবি এঁকেছিলেন; এক মহাপ্লাবন এসে সৃষ্টিকে একদিন ধ্বংস করে দেবে—শেষ জীবনে এই ধারণা তাঁর চিত্ত ও চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, আর তারই প্রকাশ আলোচ্য ডেলিউজ পর্যায়ের ছবিগুলিতে, যেখানে প্রকৃতির অসীম অবাধ শক্তি অসংখ্য রেখার কুণ্ডলী সমন্বয়ে আশ্চর্যভাবে রূপায়িত।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ছবি ও স্কেচ জাতীয় কাজগুলি সাধারণ দর্শকের বিস্ময়, শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা। শিল্পক্ষেত্রে লিওনার্দোর দান সামান্য নয়, নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি সমকালীন শিল্পকে যেমন

উন্নত ও সমৃদ্ধ করেছিলেন, তেমনিই স্বীয় কর্মকৃতিকে আগামীকালের শিল্পীদের প্রেরণা ও আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মোনালিসার মাধ্যমে তিনি প্রতিকৃতি-চিত্রের আদর্শ স্থাপনের সঙ্গে লাস্ট সাপারে প্রত্যেকটি চরিত্রকে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত করে ছবিতে নরনারীর ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটনের প্রয়োজনীয়তার দিকে শিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, এবং 'ভাজিন অফ দ্য রক্‌স' ছবিতে আলো-ছায়ার সম্পর্ককে নতুনভাবে প্রকাশ করেছিলেন। ছবিতে বিশেষত স্কেচ ও ডিজাইনগুলিতে তিনি ডিটেলস্‌-এর প্রতি মনোযোগী, কিন্তু চোখে-দেখা খুঁটিনাটির বিস্তৃত পরিচয় সত্ত্বেও তাঁর কাজ কখনও দুর্ভার হয়ে পড়ে নি। লিওনার্দো ছিলেন বিজ্ঞান-সচেতন, প্রথম সারির বিজ্ঞানী বললেও অত্যুক্তি হয় না, এবং সেই বিজ্ঞানী মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রেখে গেছেন বহু রেখাচিত্রে—নানাবিধ যন্ত্রপাতির নকশায় আর মানবদেহের খুঁটিনাটির রেখায়িত বর্ণনায়। তাঁর মধ্যে বিজ্ঞানীর সঙ্গে যে সাহিত্যস্রষ্টারও সমাবেশ ঘটেছিল, তার প্রমাণ তাঁর 'নোটবুক'গুলি, আজ পর্যন্ত যাদের আবিষ্কৃত সংখ্যা উনিশ। এবং সেই সঙ্গে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য তাঁর বহু ছবি, যেগুলি কাব্যরসে স্নিগ্ধ-সুন্দর। প্রতিভা সাধারণত একমুখী হয়, কিন্তু লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ছিল বহুমুখী প্রতিভা।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মতো বিস্ময়কর ও লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দের ২রা মে যখন তিনি দেহরক্ষা করেন, তখনই সারা ইউরোপে তিনি মহান স্রষ্টারূপে সম্মানিত। মানবতাবাদ যদি রেনেসাঁসের অন্যতম চরিত্রলক্ষণ হয়, তবে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ইউরোপীয় রেনেসাঁসের বিশিষ্ট ও সার্থক প্রতিনিধি, মানুষ ও তাবৎ জীবজগতের প্রতি যাঁর করুণা ও মমতা ছিল অন্তহীন (তাঁর সম্পর্কে গল্প আছে, তিনি খাঁচায় বদ্ধ পাখি কিনে সেই পাখিকে মুক্তি দিতেন)। অর্থহীন আচারনিষ্ঠতা ও কুসংস্কারের তীব্র বিরোধী এবং পরবর্তী কালের বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অগ্রদূত লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ছিলেন যাকে বলে আদ্যন্ত 'আধুনিক মানুষ'। তাঁর মৃত্যুর পর কয়েকটি শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে, গড়িয়ে গেছে সুখে-দুঃখে আন্দোলিত মানবজীবনের অসংখ্য দিন-রাত্রি। কিন্তু এই কয়েক শ বছরে চিরদিনের মানুষ লিওনার্দো দা ভিঞ্চি বিস্মৃতির অন্তরালে যান নি, বরং মানুষের আরও কাছে এসেছেন; ছবি, স্কেচ, ড্রইংস আর নোট্‌স-এর মাধ্যমে বিশ্বমানবের স্পর্শ দিয়েছেন সমগ্র মানবসমাজকে। সুপুরুষ ও খামখেয়ালী এই অসামান্য প্রতিভাবান শিল্পী সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'দা ভিঞ্চি একাই সকলকে জয় করেছিলেন।' সে-

হৃদয়বত্তা দিয়ে দা ভিঞ্চি সেদিন সবাইকে জয় করেছিলেন, সেই ভালোবাসা সেই মানবতার মৃত্যু নেই। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির শিল্পকর্মে উচ্চারিত এই উজ্জ্বল বিশ্বাস যিনি তাঁর চিত্তে সঞ্চারিত করতে পারেন, তিনিই এই মহান শিল্পীর সার্থক দর্শক।

সমালোচনার সমালোচনা

জীবনানন্দ বলেছিলেন, সবাই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। আমি বলি, সবাই সমালোচক নয়, কেউ কেউ সমালোচক। সঙ্গীতজ্ঞ, কবি, চিত্রশিল্পী প্রভৃতি মহৎ শিল্পের স্রষ্টারা সমালোচককে যতই তির্যক চোখে দেখুন না কেন, সার্থক সমালোচক স্রষ্টা-শিল্পীর সমান পংক্তিতে বসার যোগ্য বলে আমার বিনীত ধারণা। অন্তত এ মুহূর্তে আমি অধ্যাপক ম্যাকেইলকে সাক্ষী মানতে পারি, যাঁর মতে সমালোচনার ক্ষমতা ও সৃষ্টিশক্তি সমগোত্রীয়—The critical faculty is akin to the creative faculty of the artist. আর আর্নল্ড-এলিয়ট-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মতো একাধারে মহৎ স্রষ্টা ও সার্থক সমালোচকের সাক্ষাৎ পাওয়াতে এ সিদ্ধান্ত প্রায় অনিবার্য, সমালোচনা সৃষ্টিশীল শিল্পকর্মের অন্যতম এবং কাব্যরচনা বা চিত্রাঙ্কন জাতীয় সুকুমারশিল্পের মতোই দুরূহ ও দুশ্চর সাধনাসাপেক্ষ।

কিন্তু এই সাধনার ধারপাশ দিয়ে যান খুব কম সমালোচক। অধিকাংশ সমালোচকের মূলধন পল্লবগ্রাহিতা। তাৎপর্যহীন কয়েকটি শব্দ বা jargon-এর সাহায্যে চমকপ্রদ হওয়ার ও পাণ্ডিত্য প্রমাণের চেষ্টাতে যাঁদের উদ্যম নিঃশেষিত তাঁরা আর যাই হোন সমালোচক নন। বন্ধুত্ব বা শত্রুতা, দলীয়তা, চলতি হাওয়ার অনুসরণ, আত্মস্বার্থচিন্তা প্রভৃতি শিল্পবহির্ভূত বিষয়গুলি যখন সৃষ্টিশীল শিল্পের সমালোচনায় প্রেরণারূপে কাজ করে, তখনই সমালোচনার অপমৃত্যু ঘটে; ভাষান্তরে, সমালোচনার জন্মই অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে অগণ্য ছদ্মসমালোচকরা সৃষ্টিশীল শিল্পীদের মনোবেদনার ও ক্ষোভের কারণ হয়েছেন। এই সমালোচকদের অনেকে স্ব স্ব যুগে প্রতিপত্তি বিস্তার করলেও শেষ পর্যন্ত অখণ্ড কালের হাতে তাঁদের অপমৃত্যু ঘটেছে, অন্য পক্ষে তাঁদের অবহেলিত অনাদৃত সৃষ্টিশীল শিল্পীরা মৃত্যুঞ্জয়রূপে দেখা দিয়েছেন। কীটসের বিরূপ সমালোচকদের নাম আজ গবেষণার বিষয়, কীটস আজও অসংখ্য মানুষের হৃদয় অধিকার করে আছেন।

॥ দুই ॥

সমালোচকের প্রাথমিক ও আবশ্যিক গুণ সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদনা, সমালোচ্য শিল্পীর সৃষ্টিশীল চিত্তের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা। এই হিসাবে সমালোচকও সৃষ্টিশীল শিল্পী। অর্থাৎ যিনি কাব্য-সমালোচক তিনি ইচ্ছা করলে কবিতা লিখতে পারেন বা পারতেন, যিনি সঙ্গীত-সমালোচক সঙ্গীতশিল্পীর ক্ষমতা তাঁর আয়ত্তে (একটি চীনে প্রবাদ মনে পড়ছে: সে-ই যথাযথ বাঘের ছবি আঁকতে পারে, যার মধ্যে বাঘ হবার শক্তি বিদ্যমান)। সৎ সমালোচনার দ্বিতীয় শর্ত তথ্যনিষ্ঠা, যে- তথ্যনিষ্ঠাকে টি. এস. এলিয়ট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন;[১] অর্থাৎ সমালোচককে পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হতে হবে। তৃতীয় ও সর্বশেষ কথা, যেহেতু সমালোচনা শেষ পর্যন্ত মূল্যায়নবিশেষ, অন্তত একালের সমালোচনা, চিন্তাশীলতা ও বিদ্যাবত্তা সমালোচকের প্রধান সম্পদ বলে পরিগণ্য। কোন শিল্পসৃষ্টি সম্পর্কে ভালো-মন্দ মন্তব্য উচ্চারণ করার আগে সৎ সমালোচককে রীতিমতো ভাবতে হয়, অনুরূপ আর-দশটা শিল্পকর্মের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করতে হয়। এই তুলনামূলক বিচারের সময় আবার যুগ, সমাজ, ব্যক্তিমানস, রুচি ইত্যাদির প্রশ্ন এসে পড়ে। স্থিতধী সমালোচক মনে মনে এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করে তাঁর অধীত শিল্পকৃতি সম্পর্কে আন্তরিক রায় দেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে, সমালোচনা-কর্ম আপাতদৃষ্টিতে যত সহজ, প্রকৃতপক্ষে তত দুরূহ। বিভিন্ন উপাদানকে সংশ্লেষণ করে শিল্পী তাঁর চিন্তা-কল্পনাকে মূর্তিত করেন, সমালোচক সেই রূপপ্রমূর্তির উপাদানগুলিকে বিশ্লিষ্ট করে প্রত্যেকটি অংশের স্বতন্ত্র বিচার করেন এবং পুনর্বার অংশগুলিকে শিল্পিসুলভ পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট করে অধীত সৃষ্টির বিচারে প্রবৃত্ত হন। এইজন্যই বলেছি, সার্থক সমালোচকের স্থান সৃষ্টিশীল শিল্পীর আসনের সন্নিকট। শিল্পস্রষ্টা ও সৎ সমালোচক লক্ষ্যে-কর্মে-আদর্শে সমগোত্রীয় এবং এইজন্যই ম্যাথু আর্নল্ড, টি. এস. এলিয়ট, এজরা পাউণ্ড, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্র-

১ খবরের কাগজে সাধারণত যে- ধরনের তথ্যবিশ্লিষ্ট স্বমতসর্বস্ব হামবড়া ভাসা-ভাসা সমালোচনা প্রকাশিত হয় এলিয়ট তার তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন: **Any book, any essay, any note in Notes and Queries which produces a fact even of the lowest order about a work of art is a better piece of work than nine-tenths of the most pretentious critical journalism in journals or in books.**

-নাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ দেশী-বিদেশী লেখকদের অনেকে একাধারে সাহিত্যিক ও সাহিত্যসমালোচক।

॥ তিন ॥

সমালোচনা কি? সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত ইত্যাদি শিল্পকর্মের সম্যক আলোচনা অর্থাৎ শিল্পকর্মবিশেষের গুণ-দোষ বিচারের সরল ও বিস্তৃত আলোচনাই সমালোচনা। সমালোচনা কেন? কোনটি সুরচনা কোনটি কুরচনা তা বুঝিয়ে দেবার জন্য সমালোচকের প্রয়োজন অবশ্যস্বীকার্য। এজরা পাউণ্ডও একই সুরে সমালোচনাকে 'ঝাড়াই-বাছাই'র কাজ হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেন : Excernment. The general ordering and weeding out of what has actually been performed......the ordering of knowledge so that the next man (or generation) can most readily find the live part of it, and waste the least possible time among obsolete issues. এই ঝাড়াই-বাছাই করতে গিয়ে সমালোচক অনেক অনাদৃত লেখক চিত্রশিল্পী ভাস্কর সংগীতজ্ঞকে আবিষ্কার করেন, রসজ্ঞ সমাজকে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। আবার কোন বিশেষ দেশকালের (কখনও কখনও প্রচারমাহাত্ম্যে) বিখ্যাত জনকেও তিনি বিচার করে দেখান, ভদ্রলোক প্রাপ্যের অতিরিক্ত পেয়েছেন।

সমালোচনা যদি হয় শিল্পসৃষ্টির মূল্যায়ন, সমালোচক যদি হন প্রতিভার আবিষ্কারক, তবে বাংলাদেশের হয়তো বা ভারতবর্ষের, সাহিত্য-সমালোচনা এখনও দুর্বল। বাংলাদেশে যথার্থ সাহিত্য-সমালোচনার সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্র থেকে, তাঁর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বা দীনবন্ধু মিত্র সংক্রান্ত আলোচনা সাহিত্য-সমালোচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য-সমালোচনাকে যিনি মহৎ শিল্পকর্মে রূপান্তরিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা অনেকাংশে কবির সংবেদন ও ভাবাবেগে অনুরঞ্জিত। রবীন্দ্রনাথের পর যে- দু-চারজন সাহিত্য-সমালোচক উল্লেখের দাবি রাখেন তাঁরা—প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুশীলকুমার দে ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ইদানীংকালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ সাহিত্যস্রষ্টাকে যখন মাঝে-মধ্যে সমালোচকরূপে আত্মপ্রকাশ করতে দেখেছি, তখন আশান্বিত বোধ করেছি এই ভেবে, এ দেশেও এলিয়ট-পাউণ্ডের আদর্শ বাস্তবে অসম্ভব নয়; এবং সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য-সমালোচনা যদি কখনও কখনও পাঠযোগ্য হয়ে থাকে

তা এঁদের ও এঁদের মতো সাহিত্য-স্রষ্টার লেখনীর দাক্ষিণ্যেই। সামগ্রিক-ভাবে বলতে গেলে বাংলা সাহিত্য-সমালোচনাকে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁরা মূলত কিংবা প্রধানত সাহিত্যশিল্পী। সাহিত্যিক নন এমন সমালোচকের সংখ্যা একালে নগণ্য নয়, কিন্তু শশিভূষণ দাশগুপ্ত (স্বর্গত দাশগুপ্ত অবশ্য কিছু কিছু সাহিত্যকর্মেরও নিদর্শন রেখে গেছেন) বা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো দু-চারজনকে বাদ দিলে অধিকাংশ সমালোচক পাঠ-যোগ্য বিশেষ কিছু লেখেন নি। এর কারণ বোধ করি সমালোচক নামধেয় লেখকদের সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্যতার অভাব, চিন্তার অপরিচ্ছন্নতা, পণ্ডিত-মন্যতা, চর্বিতচর্বণের অভ্যাস, রচনায় প্রসাদগুণের অনুপস্থিতি। পেশা-বিশেষের প্রতি কটাক্ষ করছি না, অধ্যাপক-হেতু-সমালোচকদের মধ্যে এমন খুব কমই আছেন, যাঁরা ইচ্ছা করলে সৃষ্টিশীল লেখক হতে পারেন বা পারতেন। এবং যেহেতু সার্থক সমালোচনা শেষ পর্যন্ত সৃষ্টিশীল শিল্প-কর্ম, সে কারণে আগে-অধ্যাপক-পরে-সমালোচক আর যাই হোক চিন্তাস্পর্শী সরস সমালোচনা সৃষ্টিতে অক্ষম। এই ধরনের সমালোচককেই জীবনানন্দ দাশ (যিনি স্বয়ং অধ্যাপক ছিলেন) সব্যঙ্গে 'ছায়াপিণ্ড' আখ্যা দিয়েছিলেন। টেনিসনের ক্রিস্টোফারও এই শ্রেণার সমালোচকদের আদর্শ প্রতিনিধি।

বাংলাদেশে সমালোচনার ক্ষেত্রে সাহিত্য বড় অংশ দখল করে আছে আর সাহিত্য-আলোচনার মানই যখন এ দেশে পর্যাপ্ত উন্নত নয়, তখন চিত্র, ভাস্কর্য ইত্যাদি অন্যান্য শিল্পের এবং ইতিহাস, অর্থনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ বা আলোচনার প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো। সাহিত্য-সমা-লোচনার ক্ষেত্রে কোন রিচার্ডস, উইলসন, লীভিসকে আজও আমরা পাই নি, চিত্র ভাস্কর্য ইত্যাদি আলোচনার ক্ষেত্রে আপলমিয়ের, ফ্রাই, রীড এখনও অনুপস্থিত। বদলেয়ার, স্টাইন, কক্তোর মতো একাধারে সাহিত্যিক ও শিল্প-আলোচক এ দেশে কোটিকে গোটিক। রবীন্দ্রনাথ বা অবনীন্দ্রনাথ বা এ কালে বিষ্ণু দের মতো দু-চারজনকে বাদ দিলে সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সীমার বাইরে পদার্পণ করার মতো সাহস ও বিচার-বুদ্ধি নেই। শিল্প-সমালোচনার ক্ষেত্রে শাহেদ সুরাবর্দী, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ দু-চারজনের নাম এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। শাহেদ সুরাবর্দীর রচনা মিতপরিমাণ, কিন্তু আমার মতে তিনি প্রথম সারির শিল্প-সমালোচক। এ তথ্য আজ অনেকের অজ্ঞাত, যামিনী রায় সম্পর্কে তিনিই প্রথম উল্লেখযোগ্য রসজ্ঞ আলোচনা করেন; এবং এক হিসাবে যামিনী রায়কে শ্রীসুরাবর্দীর আবিষ্কারও বলা

চলে।[১] সঙ্গীত, নাটক, চলচ্চিত্র প্রভৃতি অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে সংখ্যায় কম হলেও রাজেশ্বর মিত্র, শম্ভু মিত্র, সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্তের মতো সার্থক আলোচক আছেন, কিন্তু তাঁদের নিয়মিত রচনা প্রকাশে পত্র-পত্রিকার কর্তা এবং পুস্তক-প্রকাশকদের উৎসাহ কম। খবরের কাগজে এসব বিষয়ে যে-ধরনের রচনা প্রকাশিত হয় (বিশেষত চলচ্চিত্র সংক্রান্ত আলোচনা) সেগুলি চিন্তায় অগভীর ও অস্বচ্ছ এবং রচনারীতিতে কষ্টপাঠ্য।

বাংলাদেশে সমালোচনার কেন এই দুরবস্থা ? আমার মতে অন্তত চারটি কারণ এই দুরবস্থার জন্য দায়ী। প্রথম, সমালোচকের সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্যতা এবং মননশীলতার অভাব ; দুই, প্রয়োজনীয় তথ্যনিষ্ঠার প্রতি সমালোচকের অনাগ্রহ, অন্যভাবে পরিশ্রম-বিমুখতা ; তিন, বাঙালী সমালোচকের দলিতপন্থায় নিশ্চিন্ত ভ্রমণের অভ্যাস, অন্যভাবে সাহসের অভাব ; এবং চতুর্থ, সমালোচ্য শিল্পসৃষ্টির আলোচনায় সৃষ্টিবহির্ভূত বিবিধ কারণের (যেমন সাহিত্যিক দলাদলি, রাজনীতি, আত্মস্বার্থসিদ্ধির বিভিন্ন উপায় চিন্তন ইত্যাদি) ভয়াবহ উপস্থিতি। এই সমস্ত কারণের সোনায় সোহাগার কাজ করছে সংবাদপত্র, বিভিন্ন সাহিত্যিকগোষ্ঠী, ধনপতিসমাজ (পাব্লিক থিয়েটার ও সিনেমার ক্ষেত্রে এদের দুর্নীতিগর্ভ প্রভাব দুঃসহ) এবং অর্থগৃধ্নু অশিক্ষিত প্রকাশক (তথাকথিত অনেক সাহিত্যকার বিখ্যাত প্রকাশকও বটেন !)। আপাতত এমন প্রকাশক অঙ্গুলিগণ্য যিনি সুগ্রন্থ প্রকাশে আদৌ আগ্রহী। ফলত বাংলা ভাষায় সার্থক সমালোচনা বিরলদর্শন, সুখপাঠ্য বুদ্ধিগ্রাহ্য সমালোচনা স্বল্পপ্রচারিত সাহিত্য পত্রিকার (যাদের 'লিটল ম্যাগাজিন' বলা যায়) মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সাম্প্রতিক বাংলা সমালোচনা হয় নির্জলা প্রশংসার উত্থায়ী উচ্ছ্বাস নতুবা অকারণ নিন্দার পঙ্কিল বিলাস। এ দুই ধরনের সমালোচনার মধ্যবর্তী এক জাতের সমালোচনা মাঝে-মধ্যে চোখে পড়ে, যাদের বক্তব্য আমার মতো সাধারণ ব্যক্তির বুদ্ধির বহিঃপাতী। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের সেকাল আর একালের তুলনামূলক আলোচনায় এক এক সময় মনে হয়, সেকালের সমালোচনায় আর যারই অভাব থাকুক, সাহস, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার ঘাটতি ছিল না (বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গুরু ঈশ্বর গুপ্তকেও সমালোচনা করতে ছাড়েন নি)। সমালোচক হয়তো কখনও কখনও সমালোচ্য স্রষ্টাকে ভুল বুঝতেন কিন্তু স্বীয় বিচারবোধকে সুস্পষ্টভাবে

১ পরবর্তী কালে যামিনী রায় সম্পর্কে জন আরউইন ও বিষ্ণু দে সার্থক আলোচনা করেছেন।

প্রকাশ করার সাহস তাঁর ছিল। এ কালের সমালোচক স্বত্রত উদ্‌ঘাপনের পূর্বে ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির কথা বিশেষভাবে চিন্তা করেন। ফলত এ কালে যোগ্য সমালোচক অনেক সময়েই আত্মপ্রকাশে দ্বিধাগ্রস্ত, ব্যক্তিগত কারণে যথার্থ সমালোচনায় নিরস্ত হন, সাংসারিক বুদ্ধিতে পাকা হবে দলবিশেষের ক্যানেস্তারা হিসাবে আত্মনিয়োগ করেন। তবু অন্ধকার সমুদ্রে নিঃসঙ্গ লাইটহাউসের মতো দু-চারজন সৎ ও নির্ভীক সমালোচক অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ছিলেন, আছেন ও ভবিষ্যতেও থাকবেন। নির্বোধ বর্তমানের সাধারণ বাঙালীর পক্ষে এই আশাই একমাত্র অবলম্বন।

স্বাধীন ভারত, পরাধীন ভারতীয়

কয়েক বছর আগে একটি দৈনিক পত্রের 'চিঠিপত্র' বিভাগে জনৈক পত্রলেখক (খুব সম্ভবত পত্রলেখিকা) ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, ভারতের সেরা ছেলেরা ('ক্রীম অফ দি স্টুডেণ্টস') ইউরোপ আমেরিকায় লেখাপড়া শিখে ও-দেশের মেয়ে বিয়ে করে, ফলে এ-দেশের মেয়েরা যোগ্য পতিলাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে এ ঘটনা নিঃসন্দেহেই দুঃখের, বিশেষত যে- দেশে মেয়েদের বিবাহ অন্যতম সামাজিক সমস্যা। কিন্তু প্রাসঙ্গিক তথ্যসংগ্রহ ও তথ্যবিশ্লেষণে দেখা যাবে, ইউরোপপ্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে বিদেশিনী বিবাহের ঘটনার সংখ্যা এমন প্রচুর নয় যা ভারতীয় মেয়েদের চিন্তার ও দুঃখের কারণ হতে পারে। তা ছাড়া, ইউরোপ-আমেরিকায় যাঁরা উচ্চশিক্ষার জন্য যান, তাঁরা সকলেই সেরা ছেলে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই ; বরং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে বহির্ভারতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই সাধারণ ও অতি সাধারণ ছাত্র, পৈতৃক সাচ্ছল্য, মুরুব্বির জোর প্রভৃতি বস্তুগত কারণে তাঁরা আপাতদৃষ্টিতে 'সেরা ছেলে' বলে চিহ্নিত হচ্ছেন। খেদজনক সত্য এই, সে- কালের মতো একালেও অধিকাংশ কৃতী ছাত্র মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকেই সমাগত, স্বীয় পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও বিদ্যাবুদ্ধির সম্পদে যাঁদের প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হয়। অথচ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে এই কৃতী ছাত্রদের অধিকাংশই সুযোগ-সুবিধার অভাবে বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অসমর্থ হন ; অন্তত, যে- সময়ে তাঁরা সেই শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী, সেই সময়ে তাঁদের চাকুরির খাতিরে দেশে থেকে যেতে হয়। চাকুরিই যখন ভারতীয় মধ্যবিত্ত জীবনের শেষ-সার আবিষ্কার তখন বিদেশে উচ্চশিক্ষা

গ্রহণের ইচ্ছা স্বপ্নবিলাস, স্বদেশে চাকুরি সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে বিদেশ-গমন আর্থিক ঝুঁকির নামান্তর মাত্র। অতএব সেরা ছেলেরা দেশেই থাকেন, বিদেশে যান না ; দু-চারজন গেলেও বিদেশিনী বড়ো একটা বিয়ে করেন না। অতএব পত্রলেখিকার ক্ষোভের বা খেদের কোন কারণ দেখি না।

ভারতীয়দের বিদেশগমনের মোহ প্রসঙ্গে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত আমারই একটি পুরোন মন্তব্য মনে পড়ছে : স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে আমাদের মানসিক পরাধীনতা অনেক বেড়ে গেছে, এবং তা ক্রমবর্ধমান। আমাদের রক্তের সঙ্গে মেশা দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিকতা-বিষের প্রতিক্রিয়া যেন ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে। এই মানসিক পরাধীনতা আজ উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এতই সুপ্রকট, বিবেকবান আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে তা দুঃসহ ও যন্ত্রণাদায়ক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 'ডক্টরেট' থীসিস পরীক্ষার ব্যাপারে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক (অন্তত একজন) নিয়োগ প্রায় অলিখিত নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্য পরীক্ষক থাকা সত্ত্বেও বিদেশী পরীক্ষকের কাছে থীসিস পাঠানোর একটিই অর্থ হয়, যার নাম হীনমন্যতাবোধ, অন্য ভাষায় মানসিক পরাধীনতা। বস্তুত এই মানসিক ব্যাধি এতই দূরবিস্তৃত, আমরা বাংলা সাহিত্যের বা বাংলা ভাষাতত্ত্বের থীসিস পর্যন্ত বিদেশী, প্রধানত ইঙ্গ-মার্কিন, অধ্যাপকের কাছে পাঠাচ্ছি। পাঠাচ্ছি তেমন অধ্যাপকের কাছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যাঁর জ্ঞান সন্দেহাতীত নয়। অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এ দেশের ক'জন ইংরেজীর অধ্যাপককে আজ পর্যন্ত ক'টি ইংরেজী সাহিত্য সংক্রান্ত থীসিস পরীক্ষা করতে দিয়েছেন জানতে ইচ্ছা করে। আর একটু বিশদ করে বলি, ইউরোপীয় ও মার্কিন অধ্যাপককে থীসিস পাঠানোতে আমার আপত্তি নেই, প্রাসঙ্গিক বিদ্যায় যদি তাঁদের বৈদগ্ধ্য হয় অসন্দিগ্ধ ও অসাধারণ।

বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী কলেজ ইত্যাদিতে অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রেও নিয়োগকর্তাদের বিদেশী ডিগ্রীর প্রতি মোহ দুঃসহরকমের প্রকট হতে দেখা যায়। যে- কোনো বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী এখানকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলিতে মূল্যবান স্মাগলড বা ইমপোর্টেড জিনিসের মতো সমাদৃত। অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের মতো কুলীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ডিগ্রির দাম সর্বাধিক। এই ডিগ্রীর জোরে সরাসরি শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বোচ্চ 'প্রোফেসর'-পদ লাভের ঘটনা শিক্ষাগ্রহীদের অবিদিত নয়। পৃথিবীর সর্বত্র শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতা এবং বিশিষ্ট গবেষণা-প্রবন্ধাদির প্রকাশ 'প্রোফেসর'-পদের প্রাথমিক গুণাবলি রূপে বিবেচিত হয়, হয় না শুধু ভারতবর্ষে — স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে।

অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের মতো বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রীধারীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট-প্রাপ্ত অধ্যাপক—তিনি যতই অভিজ্ঞ, প্রবীণ ও সুলেখক হোন না কেন—শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করেন। আশ্চর্য লাগে ভাবতে, অনেক সময় বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রীধারীদের উচ্চ পদে নিয়োগ করেন তাঁরাই, যাঁরা ছাত্রজীবনে বিদেশে যান নি, যাঁরা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট-প্রাপ্ত নন এবং দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজীবনেই যাঁরা খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়েছেন। আশ্চর্য লাগে ভাবতে, স্বাধীন ভারতের এই দুর্মর মানসিক ব্যাধি পরাধীন ভারতবর্ষে প্রায় অনুপস্থিত ছিল। সেকালেও বিদেশে যেতেন ছাত্ররা, ডিগ্রীও অর্জন করতেন, কিন্তু শুধুমাত্র অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের ডিগ্রীর দৌলতে তাঁরা এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বা সরকারী কলেজে প্রথমেই প্রোফেসর অথবা বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হতেন না। হুমায়ুন কবির বা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো কৃতী ছাত্র অক্সফোর্ডের ডিগ্রী অর্জন করেও সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ 'প্রোফেসর'-পদ লাভ করতে পারেন নি; বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং কলেজের 'লেকচারার' পদেই তাঁদের শিক্ষকজীবন শুরু করতে হয়েছিল। আর এখন? তাঁদের তুলনায় অনেক নিরেশ ছাত্রও বিদেশী ডিগ্রীর জোরে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় কোনোরকম অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও সরাসরি প্রোফেসর, রীডার ইত্যাদি উচ্চ পদে নিযুক্ত হচ্ছেন কিংবা সিমলার ইনস্টিট্যুট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডি জাতীয় তথাকথিত প্রাগ্রসর গবেষণা-কেন্দ্রগুলিতে স্ফীত অঙ্কের চাকুরিতে বহাল হচ্ছেন।

স্বাধীন ভারতবর্ষে মানসিক পরাধীনতার আর-একটি দৃষ্টান্ত ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ের জনপ্রিয়তা। কলকাতা ও অন্যান্য বড়ো শহরগুলির পাড়ায় পাড়ায় যে- হারে ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয় আবির্ভূত হচ্ছে, তাতে সন্দেহ হয় অদূর ভবিষ্যতে বাঙলা, হিন্দী, অসমীয়া, গুজরাতী, তেলুগু প্রভৃতি দেশী ভাষায় কথাবার্তা বলার জন্য গ্রামাঞ্চল থেকে লোক আমদানি করতে হবে। কিন্তু ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ের এহেন ক্রমবর্ধমান সংখ্যা সত্ত্বেও ইংরেজীর মানোন্নয়ন হচ্ছে কি? নিঃসংশয়েই ইংরেজী শিক্ষার মান পূর্বাপেক্ষা নিম্নমুখী হয়েছে (অভিজ্ঞ ইংরেজী শিক্ষকদের সর্বসম্মত মন্তব্য)) এবং একথা যদি সত্য হয়, তা হলে বুঝতে হবে ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ের সংখ্যাই শুধু বেড়েছে, ইংরেজী শেখার প্রতি আগ্রহ বা আন্তরিকতা বাড়ে নি। পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয় সংখ্যায় কম হলেও ছিল, কিন্তু সে সব স্কুলের ক'জন ছাত্র ইংরেজীতে

দক্ষতা অর্জন করেছিলেন ? অন্য পক্ষে সেই সব স্কুলে পড়াশোনা না করেও বহু ভারতীয় ইংরেজীনবীশ হিসাবে খ্যাত হয়েছিলেন। অজ পাড়াগাঁয়ের বাংলা-মাধ্যম স্কুলে পড়েও ইংরেজী পারঙ্গমতার জন্য বহু ভারতীয় ইংরেজ পণ্ডিতদের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। যতদূর জানি, হুমায়ুন কবির, হীরেন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, রাজা রাও, মনোহর মালগঙ্কার, খুসবন্ত সিং-এর মতো খ্যাতিমান ইংরেজীনবীশ লেখক ও বক্তাদের কেউই ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন না ; অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের ইংরেজী ভাষার সুলেখকদের অনেকে ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন নি। উপরিবর্ণিত তথ্যের আলোকে অতএব এই সত্যই উদ্‌ঘাটিত, ইংরেজী শেখা নির্ভর করে ছাত্রের ইচ্ছা ও আন্তরিকতার উপর, ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়াশোনার উপর নয়। তবে সাধারণভাবে বাংলা-মাধ্যম বিদ্যালয়ের তুলনায় ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ে নিয়মানুবর্তিতা প্রশংসনীয় এবং সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতিও উন্নততর এই যুক্তিতে পিতামাতা যদি তাঁদের সন্তানকে ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ে পাঠাতে আগ্রহী হন, তবে সে- যুক্তির সারবত্তা স্বতন্ত্রভাবে চিন্তনীয়।

অতএব সন্দেহ নেই, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে আমরা মানসিকভাবে ক্রমশ ইউরোপীয় তথা বিদেশী সংস্কৃতির অধীন হয়ে পড়ছি। স্বাধীন ভারতবর্ষে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, সোভিয়েত সব দেশই আছে, নেই শুধু আবহমান কালের ভারতবর্ষ। স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরা দৃশ্যত ভারতীয়, পরিচয়েও ভারতীয়, কিন্তু মনে-প্রাণে বিদেশের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছি কিংবা বাঁধার জন্য নিতুই আকুল। আমার ধারণা, আমাদের ভালো ছেলেরা বিদেশে যেতে আগ্রহী হন, তার অন্যতম কারণ, তাঁদের চাইতে নিরেশ ছেলেরা শুধুমাত্র বিদেশী ডিগ্রীর দৌলতে অনায়াসে অনেক বেশি সাংসারিক সাফল্য অর্জন করেন। নেপোলিঅনের মতো গণ-তন্ত্রবিমুখ কট্টর সাম্রাজ্যবাদী (হালফিল রাজনৈতিক ভাষায় 'প্রতিক্রিয়াশীল') তাঁর শাসনপদ্ধতিতে career open to talent নীতিকে সশ্রদ্ধ স্থান দিয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতিতে অলিখিতভাবে স্বীকৃত নীতি career open to money and/or clique, এ দেশে উন্নতি সম্ভব—হয় বাপের জোরে নয় পাপের জোরে।

হিন্দীর জন্যে, হিন্দীভাষীদের কাছে

বছর দশ আগে ভাষান্ধতার দৈত্য দুঃসহভাবে মাথা তুলেছিল। উত্তরপ্রদেশে ব্যাপকভাবে এবং মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে আংশিকভাবে উগ্র হিন্দীপ্রেমীদের তাণ্ডবলীলা অন্যভাষীদের বিরক্তি ও কিছুটা শঙ্কার উদ্রেক করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রভাবশালী মহল মুখে জাতীয় ঐক্যের বুলি আওড়ালেও পরোক্ষভাবে এই হিন্দী প্রচারাভিযানকে সমর্থন করেছিলেন, 'আংরেজী হটাও'র মন্ত্র নিয়ে আলকাতরা-বাহিনী ইংরেজী-বিজয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, শহরে মফস্বলে রেল-স্টেশনের ও দোকানের সাইনবোর্ডে, মোটর গাড়ির লাইসেন্সপ্লেটে যেখানেই ইংরেজী হরফ সেখানেই এই বাহিনীর লক্ষণীয় ক্ষিপ্রতা দেখা গিয়েছিল। বেনারস-প্রত্যাগত একজনের মুখে শুনেছিলাম, সেখানে পথে-ঘাটে রেল-স্টেশনে তাঁর ইংরেজী হরফ আর চোখে পড়ে নি, নিখিল শহর হিন্দীময় হয়ে গিয়েছিল।

সরকারী ভাষা বিলের বিরুদ্ধে হিন্দীওয়ালা (হিন্দীওয়ালা বেশ হিন্দী-হিন্দী শোনায়) সম্প্রদায় বেশ কয়েক দিন যাবৎ সারা উত্তর ভারত জুড়ে যে-তুর্কী নাচন নেচেছিল, শান্তিপ্রিয় শিক্ষিত নাগরিকমাত্রই তাতে ভীত হয়েছিলেন। লখনৌয়ে 'হিন্দী সেনা'দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর সৈন্য-সংখ্যা নাকি ক্রমবর্ধমান হচ্ছিল। উত্তরপ্রদেশের স্থানে স্থানে অন্যভাষীদের হুমকি দেওয়া হয়েছিল, নির্যাতনের ঘটনাও বিরল ছিল না। অন্যভাষা-মাধ্যম স্কুল-কলেজ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে রেল-স্টেশন ডাকঘর প্রভৃতি জাতীয় সম্পত্তির উপরও হিন্দী সৈনিকরা আক্রমণ চালিয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে এই সর্বনাশা বর্বরতা বেশিদিন চলে নি।

স্বর্গত রামমনোহর লোহিয়ার 'আংরেজী হটাও' শ্লোগানের মূলে ছিল ইংরেজীনবীশ ও ভারতীয় ভাষীদের মধ্যে অসাম্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা। স্বয়ং ইংরেজী-দক্ষ ডক্টর লোহিয়া ছিলেন দরিদ্র ভারতবাসীদের দরদী বন্ধু। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতায় যখন দেখলেন, স্বাধীন ভারতবর্ষেও ইংরেজীতে কথাবার্তা বলতে পারার জন্য অঙ্গুলিগণ্য কিছু লোক (যাদের অধিকাংশই উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত) অসংখ্য সাধারণ ভারতীয় ভাষীদের মাথার উপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে, তখনই তিনি সক্ষোভে শ্লোগান তুললেন 'আংরেজী হটাও'। ডক্টর লোহিয়ার একজন বিশ্বস্ত অনুচর ও প্রত্যক্ষ শিষ্যের কাছে শুনেছি, ডক্টর লোহিয়া কখনই ইংরেজী-বিদ্বেষী ছিলেন না, ইংরেজীনবীশ সুবিধা-

বাদী পরপীড়ক আত্মকেন্দ্রিক কিছু লোকের উপরেই ছিল তাঁর প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ক্রোধ। এই সুবিধাবাদী লোকগুলির আচার-আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি নাকি বলেছিলেন, 'দেখ ভারতীয় গণতন্ত্রে (যাকে তিনি ঝুটা বলতেন) এই লোকগুলির নীতিগর্হিত উত্থান-উন্নতি প্রতিরোধের যখন কোন ব্যবস্থা হবে না, তখন বাধ্য হয়েই ইংরেজীর বিরুদ্ধে নামতে হবে এবং সেই কারণেই তিনি শ্লোগান দিয়েছিলেন, আংরেজী হটাও।'

পরবর্তী কালের শিষ্যদের হাতে গুরুর বাণী ও উপদেশের প্রায় অবধারিত বিকৃতির মতো ডক্টর রামমনোহর লোহিয়ার শ্লোগানও কদর্থ পেয়েছে। সাম্প্রতিক হিন্দীওয়ালাদের আংরেজী হটাও আন্দোলন লোহিয়ার মূল বক্তব্যকে পদদলিত করে রাজনৈতিক বর্বরতার ঝাণ্ডা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এদের আজকের আংরেজী হটাও কালক্রমে 'বাংলা হটাও' 'তামিল হটাও' প্রভৃতি আন্দোলনে পরিণতিলাভ করবে বলে এক এক সময়ে আশঙ্কা হয়। হিন্দীমত্তদের এই অশ্লীল অভিযান বন্ধ করার জন্য অহিন্দী ভারতবর্ষকে অবিলম্বে তৎপর হতে হবে, কারণ হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার অর্থই ভারতবর্ষের খণ্ড-বিখণ্ডীকরণ।

॥ দুই ॥

হিন্দীসমর্থকদের অধিকাংশই জানে না তারা কেন আন্দোলনে নেমেছে। কার বিরুদ্ধে আন্দোলন, কেন আন্দোলন ইত্যাদির জবাব তারা জানে না, জানার প্রবৃত্তি নেই, হয়তো অনেকক্ষেত্রে ক্ষমতাও নেই ; অথচ নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা যে হিন্দীর নেই, তা নয় ; এবং এই অশিক্ষিত হিন্দীমত্তরা খবর রাখে না, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো চিন্তাশীল বাঙালী সাহিত্যকার হিন্দীর সমর্থক ও কল্যাণকামী ছিলেন, কিংবা 'বঙ্গবাসী'-সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অগ্রণী সাংবাদিক তাঁর পত্রিকার হিন্দী সংস্করণকে জনপ্রিয় করেছিলেন। হিন্দীকে সাত-তাড়াতাড়ি সর্বভারতীয় ভাষা করতে গিয়ে হিন্দীওয়ালারা যা করছে, তাতে যীশুখ্রীস্টের অন্তিম বাণীই মনে পড়ছে : 'প্রভু, ইহারা জানে না ইহারা কি করিতেছে।'

শুধু হিন্দী-সৈনিক বা রাস্তার আন্দোলনকারীদের নিন্দা করেই বা কি লাভ, তথাকথিত শিক্ষিত হিন্দীসমর্থকরাও কি উগ্র মনোভাবে কম যান? হিন্দী আন্দোলনের পুরোধাদের মধ্যে বয়ঃপ্রবীণ ও স্বনামধন্য এমন অনেকে আছেন যাঁদের মূঢ়তা ইতিমধ্যেই বহুজনবিদিত হয়ে গেছে। শ্রীযুক্ত সুমিত্রানন্দন পন্থের দৃষ্টান্তই নেওয়া যাক। শ্রীপন্থ হিন্দী সাহিত্যের লব্ধ-

প্রতিষ্ঠ কবি, রাষ্ট্রীয় পুরস্কার খেতাব ইত্যাদি যথেষ্ট অর্জন করেছেন। অন্য-ভাষীরা তাঁর কবিপ্রতিভা সম্পর্কে বিশদ না জানলেও এ খবর রাখেন, সুমিত্রানন্দনজী হিন্দীসমর্থকদের প্রথম সারিতে অবস্থান করেন। ১৯৬৭ সালের ২০শে অগস্টের 'লিঙ্ক' পত্রিকার 'চিঠিপত্র' বিভাগে প্রকাশিত একটি চিঠি থেকে জেনেছিলাম, ভারতবর্ষে ইউরোপের মহৎ চিন্তাধারার প্রচার-প্রকাশ সম্পর্কে যে- প্রশংসা উচ্চারিত হয়ে থাকে, শ্রীযুক্ত পন্থ নাকি তাকে দাস-মনোভাবের পরিচায়ক বলে দ্বিধাহীনভাবে তার নিন্দা করেন। শ্রীযুক্ত পন্থ আরও বলেন, সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন কান্ট, হেগেল, স্পিনোজা ও অন্যান্য ইউরোপীয় দার্শনিকদের চাইতে অনেক বড়। পত্রলেখক শ্রীরঘুপতি সহায় 'ফিরাক' (বিখ্যাত উর্দু লেখক) সবিদ্রূপে বলছিলেন, 'বন্ধুবর শ্রীপন্থের এই কথা শোনার পর বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, রাধাকৃষ্ণন যদি আপনার মতো খুব বেশি (অথবা খুব কম) ইংরেজী জানতেন তাহলে তিনি পন্থ হতেন, রাধাকৃষ্ণন হতে পারতেন না।'

সুমিত্রানন্দন পন্থের মতো স্বনামধন্য হিন্দী কবি যদি তাঁর ভাষা-প্রীতিকে ভাষান্ধতা তথা উগ্র দেশপ্রীতিতে পর্যবসিত করতে পারেন, তবে স্কুল-কলেজের অপরিণত-বুদ্ধি ছাত্র বা রাস্তাঘাটের উত্তেজনাপ্রিয় অশিক্ষিত লোকজনের আর দোষ কি! মত্ত জনতা যুক্তির ধার ধারে না, ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো সব কিছু লণ্ডভণ্ড করাই তাদের লক্ষ্য।

তাহলে কি বলব, হিন্দীওয়ালাদের — শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই— ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স বা হীনমন্যতাবোধ নামক ব্যাধিতে ভোগেন। এই ব্যাধিরই অনিবার্য প্রকাশ হিন্দীমত্ততায়, আংরেজী হটাও আন্দোলনে। হিন্দীওয়ালাদের সংখ্যাধিক্য আছে, কণ্ঠস্বরে তীব্রতা আছে, কিন্তু নেই শুধু আত্মবিশ্বাস। যে বড়লোক তাকে দরজায় দরজায় গিয়ে বলতে হয় না, 'জানো আমার অনেক টাকা আছে, ইচ্ছে করলে আমি তোমাদের কিনে নিতে পারি।' হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য যথার্থ সমৃদ্ধ হলে হিন্দী ভাষা নিয়ে এত আন্দোলন করার প্রয়োজন হবে না, কালক্রমে হিন্দী সহজভাবেই সর্বভারতীয় ভাষার মর্যাদা পাবে। আত্মমর্যাদার প্রশ্নে বাংলা- কিংবা তামিল- ভাষীদের হিন্দীওয়ালাদের মতো কখনও রাস্তায় নামতে হয় নি।

হিন্দীর প্রতি হিন্দীভাষীদের মমত্ববোধ স্বাভাবিক ও মানবোচিত। হিন্দীভাষীদের সেই মমত্ববোধকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি, আমার প্রচণ্ড আপত্তি ও তীব্র নিন্দা তাঁদের ভাষান্ধতায়, আত্মঘাতী আন্দোলনে। ডক্টর লোহিয়া যখন আংরেজী হটাও ধ্বনি তুলেছিলেন, তখন বহু তিক্ত অভিজ্ঞতায়

ও দুঃখে তাঁর মতো ইংরেজীনবীশকে এই ধ্বনি তুলতে হয়েছিল। স্বাধীন ভারতবর্ষে লোহিয়াজী যে- দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন, পরাধীন ভারতবর্ষে একাধিক ইংরেজীনবীশ মনীষীর মুখে স্বভাষাপ্রীতি উচ্চারিত হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আজ থেকে ৫৬ বছর আগে—১৩২৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে—প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্রে' 'বাঙালী পেট্রিয়টিজম' প্রবন্ধে যা বলেছিলেন, তা থেকে প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

'আমি যে ইংরেজী লিখিনে তার থেকে বোঝা উচিত যে অ-বঙ্গ পেট্রিয়টিজম আমার মনের উপর একাধিপত্য করে না। যে ভাষা ভারতবর্ষের কোন দেশেরই ভাষা নয়, সেই ভাষাকে সমগ্র ভারতবর্ষের ভাষা গণ্য করে সেই ভাষাতে পেট্রিয়টিক বক্তৃতা করতে হলে আমি সেই পেট্রিয়টিজমের বাহানা করতে বাধ্য হতুম যে, দেশপ্রীতি ভারতবর্ষের কোনো দেশের প্রতি ভালোবাসা নয়, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতি। মুখস্থ ভাষায় শুধু মুখস্থ ভাবই প্রকাশ করা যায়।'

প্রমথ চৌধুরীর মতো বাংলা গদ্যের অন্যতম শিল্পী ও মননশীল লেখক ইংরেজীতে দক্ষতা সত্ত্বেও সারাজীবন বঙ্গবাণীর সাধনা করে গেছেন। হিন্দী ভাষার সাহিত্যিক ও আন্দোলনকারীরা উপরি-উদ্ধৃত অংশ পড়ে অনুপ্রেরণা পাবেন এই ভেবে যে, আজ থেকে ৫৬ বছর আগে একজন 'বাঙালী' বুদ্ধিজীবী লেখক পরোক্ষভাবে তাঁদের আজকের আংরেজী হটাও আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা আজ যা বলছেন, যা নিয়ে মাতামাতি করছেন, দীর্ঘকাল আগে প্রমথ চৌধুরীর মতো অনেক বাঙালী মনীষী তা করে গেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বন্ধুর লেখা ইংরেজী চিঠি বিনা উত্তরে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার ঘটনাও এখানে উল্লেখ করতে পারি।

পরাধীন ভারতবর্ষের এই সব মনীষীর নিজের ও অন্যান্য প্রদেশের ভাষার প্রতি মমত্ববোধ আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষের ভাষা-সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণযোগ্য। হিন্দী প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার মর্যাদা-প্রতিষ্ঠা এবং সুবিধাবাদী আত্মকেন্দ্রিক ইংরেজীগর্বীদের প্রাধান্য হ্রাস যদি হিন্দী ভাষার আন্দোলনকারীদের মূল লক্ষ্য হয়, তবে আমি তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানাব। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য যদি হয়, অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার উপর হিন্দীর সৌধনির্মাণ তবে আমি তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে সবাইকে আহ্বান জানাব। হিন্দীওয়ালাদের অনুপ্রেরণার জন্য যে- বাঙালী লেখকের রচনাংশ উদ্ধৃত করেছি, সেই প্রমথ চৌধুরীই আলোচ্য রচনার অন্যত্র যা বলেছেন, হিন্দীভাষার সাহিত্যিক ও নেতৃবর্গ তা থেকে পথনির্দেশ পাবেন :

'ইম্পিরিয়ালিজম সর্বনেশে জিনিস, তা সে স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক।...বহুকে এক করবার চেষ্টা ভালো, কিন্তু একাকার করবার চেষ্টা মারাত্মক, কেন না তার উপায় হচ্ছে জবরদস্তি। যদি বল যে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না, তার উত্তর আমাদের সম্বন্ধে সেলফ-ডিটারমিনেশন যদি না খাটে তো ইউরোপে মোটেই খাটে না। ইউরোপে কোনো জাতির সঙ্গে অপর কোনো জাতির সে প্রভেদ নেই, আমাদের এক জাতির সঙ্গে অপর জাতির যে প্রভেদ আছে। বাংলার সঙ্গে মাদ্রাজের যে প্রভেদ ইংলণ্ডের সঙ্গে হল্যাণ্ডের সে প্রভেদ নেই, এমন কি ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীরও সে প্রভেদ নেই। তবে যে প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের নাম শুনলে এক দলের পলিটিশিয়ানরা আঁৎকে ওঠেন, তার কারণ তাঁদের বিশ্বাস ও মনোভাব জাতীয় সংকীর্ণ স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়। নিজের সন্তানকে স্তন দিলে কোনো মায়ের উপর যদি এই অভিযোগ আনা হয় যে, সে মাতা অতি স্বার্থপর, যে হেতু তিনি পাড়া-পড়শীর ছেলেদের নিজের স্তন্যক্ষীরে বঞ্চিত করছেন, তা হলে সে অভিযোগের কি কোনো প্রতিবাদ করা আবশ্যক? মানুষের পক্ষে যা অস্বাভাবিক তাই করার ভিতর যেন আসল মনুষ্যত্ব নিহিত এ কথা বলে অতি-মানুষে আর শোনে অমানুষে। ধর, যদি কোনো জননী নিজেকে জগজ্জননী জ্ঞানে পাড়াসুদ্ধ ছেলে-মেয়েদের নিজের স্তনের দুধ জোগাতে ব্রতী হন, তাহলেও সে দুধে এত জল মেশাতে হবে যে তা পান করে কারও পেট ভরবে না, সকলের পেট ভরবে শুধু যকৃতে। আমার বিশ্বাস, আমাদের পলিটিশিয়ানরা অদ্যাবধি পেট্রিয়টিজমের উক্তরূপ জল-দুধের কারবার করছেন, এবং আর সকলকেও তাই করতে পরামর্শ দিচ্ছেন।'

সাম্প্রতিক হিন্দী আন্দোলনকারীরা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার পরিবর্তে একাকার করার যে- চেষ্টা করছেন, তার ফলে তাঁরা শুধু নন, সমগ্র ভারত-বর্ষ বিপন্ন হয়ে পড়বে। এবং প্রমথ চৌধুরীর অনন্য উপমার আশ্রয় নিয়ে বলতে ইচ্ছে হয়, হিন্দী ভাষা যদি নিজেকে জগজ্জননী জ্ঞানে দেশসুদ্ধ ছেলে-মেয়ে-বুড়োদেরও তাঁর স্তন্যপান করতে বলপ্রয়োগ করেন, তবে তাঁর কপালে জনতার হাতে উন্মাদিনীর নির্যাতন-ভোগ অনিবার্য।

হিন্দীভাষার লেখক ও রাজনৈতিক নেতাদের আমরা স্থির মস্তিষ্কে ভাষা-সমস্যা নিয়ে ভাবতে অনুরোধ করছি। অসংখ্য সমস্যা-জর্জরিত ভারতবর্ষ ইতিমধ্যে অনেক আঘাত সহ্য করেছে, আপামর হিন্দীভাষীদের কাছে তাই আমাদের আবেদন: 'ভাষায় আপনারা দেশকে ভাসাবেন না।'

সমাজবিজ্ঞান ও ভারতবর্ষ

অন্যান্য অনেক বিদ্যার মতো সমাজবিজ্ঞান বা 'সোসিওলজি' এদেশের বিদ্যাব্রতীসমাজে এখনও যোগ্য সমাদর লাভ করে নি। এ দেশের ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে সমাজবিদ্যার পঠন-পাঠন হয় সে সম্পর্কে জানতে ইচ্ছা করে। অথচ পশ্চিমের সমস্ত অগ্রণী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ-বিদ্যা ক্রমশ গুরুত্ব অর্জন করছে। অধিকন্তু অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে।

কয়েক বছর আগে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মুখপাত্র 'ভার্সিটি'র একটি সংখ্যায় (মার্চ ৯, ১৯৬৮) দেখেছিলাম, শিক্ষকদের সহযোগিতায় সেখানকার আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট ছাত্ররা নিজেদের নৈতিক চরিত্র সমীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল। যে- ভাবে তারা সমীক্ষা-কার্য পরিচালনা করেছিল তা বিস্ময়কর। এবং ততোধিক বিস্ময়কর প্রার্থিত ফললাভে তাদের সাফল্য। আটটি প্রশ্ন-সম্বলিত একটি প্রশ্নপত্র প্রতি কুড়িজনের কুড়িসংখ্যক ছাত্র বা ছাত্রীকে দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্নগুলি ব্যক্তিগত ও অস্বস্তিকর হওয়ার ফলে কেম্ব্রিজের মতো ইউরোপের একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিপন্থী ছাত্র-ছাত্রীরাও সকলে শেষ পর্যন্ত উত্তর দেন নি। শতকরা ৪৯ জন মাত্র উত্তর দিয়েছিলেন। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের মনোজগতের খবর পেতে এই শতকরা ৪৯ জনের উত্তরই যথেষ্ট। বস্তুত, ফলিত অর্থনীতি বা 'অ্যাপ্লায়েড ইকনমিকস' বিভাগের ডক্টর লুসি স্লেটার বলেছেন, এই শতকরা ৪৯ জনের উত্তর প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত, উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট। অধ্যাপক স্লেটারের ভাষায়, অধিকসংখ্যক অসাধু উত্তরে ভুলভ্রান্তি ঘটার চাইতে অল্প-সংখ্যক সাধু উত্তর বাঞ্ছনীয়। যাঁরা উত্তরদানে বিরত থেকেছেন, উত্তর দেওয়ার জন্য উত্তর বানান নি, সাহসী উত্তরদাতাদের মতো সমীক্ষার কাজকে সফল করার জন্য তাঁরাও সমান প্রশংসার যোগ্য। যে- প্রশ্নগুলি ছাত্র-ছাত্রী-দের দেওয়া হয়েছিল স্থান-সংক্ষিপ্ততা হেতু সেগুলি এখানে দেওয়া হলো না। পাঠক 'ভার্সিটি'র আলোচ্য সংখ্যাটি দেখে নিতে পারেন।

মনে রাখতে হবে সাহসী সমাজসমীক্ষাটি ঘটেছে ইংল্যাণ্ডের অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল ও ঐতিহ্যমণ্ডিত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৫১ জন ছাত্র-ছাত্রী উত্তরদানে বিরত থাকার ঘটনা থেকে বোঝা যায় ইংরেজ ছাত্র-ছাত্রীদের কট্টর আধুনিক হতে এখনও বোধ হয় কিছু

সময় লাগবে। কিন্তু বাকি ৪৯ জনের নিঃসঙ্কোচ উত্তরদানে এই কথাই সপ্রমাণ, ওদেশে ফলিত সমাজবিদ্যা কতখানি গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে চলেছে। ইংল্যাণ্ডের মতো আমেরিকাতেও সমাজবিদ্যা বিশেষ জনপ্রিয়, আমেরিকার অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিদ্যার পঠন-পাঠন ও গবেষণার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে।

॥ দুই ॥

সমাজবিজ্ঞানের প্রতি পাশ্চাত্য বিদ্যাব্রতীদের আকর্ষণ কি আকস্মিক? এ শতাব্দীর শুরু থেকেই সমাজবিজ্ঞানের প্রতি পশ্চিমের বিদ্বৎসমাজ আগ্রহ প্রকাশ করে আসছেন। অপেক্ষাকৃত প্রাচীনদের মধ্যে ক্লার্ক উইজলার, আর. এইচ. লোয়ি এবং আধুনিকদের মধ্যে বি. ম্যালিনোভস্কি, রুথ বেনেডিক্ট, কার্ল ম্যানহাইম প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আপাতত এ পণ্ডিত-দের প্রসঙ্গ ছেড়ে আরও একটি সমাজ-সমীক্ষার উল্লেখ করতে পারি, যা পরিচালনা করেছেন ছাত্র-ছাত্রীরা এবং যা অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ থেকে ১৬ বছর আগে ইংল্যাণ্ডেরই প্রাচীনতম দু'টি বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে—অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কৌতূহলী পাঠক ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত 'টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী' পত্রিকার ৫ম সংখ্যাটি দেখতে পারেন। ঐ পত্রিকার ৪১০-৪২৬ পৃষ্ঠায় উক্ত সমাজ-সমীক্ষার বিস্তারিত ফলাফল বর্ণিত হয়েছে। পরিসর-সংক্ষিপ্ততা হেতু আমি শুধু প্রশ্নাবলি নিচে তুলে দিলাম।

১। আপনি ভবিষ্যতে কোন্ পেশা গ্রহণ করবেন? কেন?

২। পেশা বাছাইর সময় পেশার নৈতিক মূল্য কি আপনাকে প্রভাবিত করছে?

৩। পাঁচ বছরে আপনি কত টাকা রোজগার করতে পারবেন মনে করেন।

৪। কোন্ কোন্ আন্তর্জাতিক প্রশ্নে আপনি সত্যই চিন্তিত?

৫। আপনি কি ইংল্যাণ্ডের দলীয় রাজনীতি বা 'পার্টি পলিটিক্স' নিয়ে সত্যই মাথা ঘামান?

৬। বাধ্যতামূলক যুদ্ধে যোগদান সম্পর্কে আপনার মত কি?

৭। ইংরেজ জীবনের কোন্ কোন্ জিনিস আপনার পছন্দ? অন্য কোনো জীবনযাত্রা-পদ্ধতির (যেমন রাশিয়ান, আমেরিকান, ফরাসী) প্রতি কি আপনার আকর্ষণ আছে?

৮। আপনার ভাবনা-চিন্তার সার্থক প্রকাশ আপনি আধুনিক কোন্ লেখকদের রচনায় পেয়েছেন ? কারা আপনাকে সব চাইতে বেশি প্রভাবিত করেছেন ?

৯। আপনার জীবনে পোষাক-পরিচ্ছদের গুরুত্ব কি ? আপনার মতে পোষাক-পরিচ্ছদের সার্থকতা কিসে ?

১০। ধর্মের প্রতি আপনার কি রকম মনোভাব ? আপনি কি নিজেকে খ্রীস্টান মনে করেন ? যদি না করেন, তা হলে নিজেকে আর কি মনে করেন ?

১১। পিতামাতাকে আপনি কি চোখে দেখেন ? তাঁদের প্রতি আপনার কি রকম মনোভাব ?

১২। মানুষের মধ্যে কোন্ কোন্ গুণ দেখতে পেলে আপনি খুশি হন ?

১৩। ক'টি ছেলেমেয়ের জনক বা জননী হতে চান ?

১৪। এই প্রশ্নপত্রে বাদ পড়ে গেছে এমন কোন্ প্রশ্ন আপনার মতে এখানে থাকা উচিত ছিল ? কিভাবে আপনি তার উত্তর দেবেন ?

'টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী' বা তার আলোচ্য সংখ্যাটি হয়তো খুব কম ভারতীয় দেখেছেন, দেখলেও সমাজ-সমীক্ষামূলক রচনাটি মনোযোগ সহকারে পড়েছেন কি না সন্দেহ। হতে পারে রচনাটি মূলত ইংরেজ সমাজ-প্রাসঙ্গিক, কিন্তু সমগ্র রচনাটিতে যে যুব-মানসের পরিচয় বিধৃত, তা কি ইংল্যাণ্ডের ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ ? অন্য দেশের অনুরূপ সমাজ-সমীক্ষা কি ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদের অবশ্যপাঠ্য নয় ?

হয়তো নয়। কারণ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতো বিদ্যাচর্চার বেলাতেও আমরা সঙ্কীর্ণ। নিজের গণ্ডীর বাইরে যেতে আমাদের প্রচণ্ড অনীহা। এ অনীহার কারণ কি ? ভয়, লজ্জা, সঙ্কোচ ? এ অনীহার কারণ কি আমাদের মনের স্থবিরতা চিত্তের জাড্য নয় ? আমাদের উচ্চতর শিক্ষার জগতে কেবল একটি বিষয়ে বৈশেষিক জ্ঞান অর্জনের দিকে যে আগ্রহ বা প্রবণতা দেখা যায়, তা আর যাই হোক মননগত স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নয়। বিশেষজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার মূঢ়তা আমার নেই, কিন্তু অতিরিক্ত বিশেষজ্ঞতা যে মানুষের দৃষ্টিকে খণ্ডিত করে, চিত্তকে করে সঙ্কীর্ণ, তার প্রমাণ এ দেশে প্রায়শই পরিদৃষ্ট হয়। তা ছাড়া যে-পদ্ধতিতে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন পরিচালিত হয় সেই প্রথাগত ও গ্রন্থসর্বস্ব 'অ্যাকাডেমিক পদ্ধতি' ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির মতো উন্নতিশীল ক্রমপ্রসারী বিদ্যাগুলির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের অন্তরায়।

পাশ্চাত্যের দেশগুলি যখন অ্যাকাডেমিক পদ্ধতির বাইরে এই সব বিদ্যাকে বিস্তৃত করতে উদ্যোগী, ভারতবর্ষ তখনও সনাতন পন্থায় বিশেষজ্ঞ সৃষ্টিতে আত্মমগ্ন। কিন্তু বিশেষজ্ঞ সৃষ্টিতেও কি ভারতবর্ষ সফলকাম? কি বিজ্ঞানে কি মানবিকী বিদ্যায় সাম্প্রতিক কালে কোন্ ভারতীয় পণ্ডিতের কোন্ তত্ত্ব বা মত বিশ্বজনীন স্বীকৃতি পেয়েছে? সার কথা এই, পশ্চিমের দেশগুলির তুলনায় উচ্চশিক্ষার জগতে আমরা এখনও পশ্চাদ্বর্তী। যে-সব তত্ত্ব ও তথ্যের দিন পশ্চিমে সারা, আমাদের দেশে তখন তাদের শুরু। সমাজবিজ্ঞান যখন ওদেশে বিস্তর এগিয়ে যাবে, আমাদের দেশে তখন সমাজবিজ্ঞান-চর্চার সূত্রপাত ঘটবে।

অথচ অবাক লাগে ভাবতে, ওদেশে যখন সমাজবিজ্ঞান-চর্চার সূত্রপাত, এই দেশেই তখন সাংস্কৃতিক ইতিহাস-রচনায় সমাজবিজ্ঞানের উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, পেশাগতভাবে যিনি ঐতিহাসিক বা সমাজতত্ত্ববিদ্ ছিলেন না, ছাত্রাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশ স্পর্শ করেন নি। একাত্তর বছর আগে ১৯০৫ সালে 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে' তিনি যে-কথাগুলি উচ্চারণ করেছিলেন সেগুলি কোনো কবির না কি আধুনিক পেশাদারী সমাজশাস্ত্রবিদের ভাবতে ধন্দ লাগে। অল্পবিস্তর পরিচিত রবীন্দ্রনাথের সেই আহ্বান ও উপদেশবাণী উদ্ধৃত করি :

'...যেখানেই হউক না কেন, মানবসাধারণের মধ্যে যা কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে, তাহা ভাল করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে, পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে, কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না।

আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnology-র বই যে পড়ি না, তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম...রহিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনি বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কতো বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে—পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব, তাহাকে কতই তুচ্ছ করিয়া জানি। কিন্তু জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না। ....সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে

সামাজিক প্রথার বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোন বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে।'

আমাদের পেশাদারী ঐতিহাসিকদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসবোধ যে কত প্রখর ও গভীর ছিল 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' তার অন্যতম বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। দুঃখের বিষয়, দীর্ঘদিন আগে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসচর্চায় যে- সমাজ-শাস্ত্রগত উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলেছিলেন অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক পণ্ডিতই সেই পদ্ধতি প্রয়োগে অগ্রণী হয়েছেন।

ফলত, অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ সমাজবিজ্ঞানের যে প্রয়োগপদ্ধতি পরিদৃষ্ট হচ্ছে, ভারতবর্ষে হয়তো আরও পঁচিশ বছর বাদে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। যে- ধরনের সমাজ-সমীক্ষা আজ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ে তা কি একান্তই অসম্ভব ? পাঠক হয়তো ভাবছেন, আমাদের সমাজ রক্ষণশীল, আমাদের ছাত্রসমাজ ও-দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় পশ্চাদ্বর্তী। আমার মতে ভারতীয় ছাত্রসমাজকে আমাদের শিক্ষকশ্রেণী অকারণ মৃতপ্রায় সনাতনপন্থী সঙ্কোচবিহ্বল দেখতে অভ্যস্ত। ভারতীয় ছাত্রসমাজ আমার চোখে চিরকালই সপ্রাণ, উদার ও সাহসী। সুতরাং অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ ও অন্যান্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যে- ধরনের সমাজসমীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতেও তা অনায়াসে সম্ভব। কিন্তু এই সমাজ-সমীক্ষার সম্ভাবনাকে সম্ভব করবেন যাঁরা সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অধ্যাপক বা শিক্ষার্থী চিন্তার জগতে অষ্টাদশ শতকের বাসিন্দা, নতুন কিছু ভাবার বা করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। নিজেদের গর্তকে এঁরা দুনিয়া মনে করেন, ব্যক্তিগত উন্নতি এঁদের লক্ষ্য, নিষ্প্রাণ অ্যাকাডেমিক পদ্ধতির সঙ্গে এঁদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। সমাজ-বিজ্ঞানের চর্চা তো দূরের কথা, নিজেদের বিষয়েও এঁরা কূপমণ্ডুক। ফলে যিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছেন, আকবর-আওরঙ্গজেবের বা বেণ্টিঙ্ক-ডালহৌসীর সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান প্রায় শিশু-সুলভ। কিংবা ভারত-ইতিহাসের আধুনিক পর্ব যাঁর আয়ত্তে, শশাঙ্ক-ধর্মপাল-মহম্মদ তুঘলুক তাঁর কাছে নামমাত্র। এই ধরনের ঐতিহাসিক বিশেষজ্ঞ ভারত-ইতিহাস-চর্চার উন্নতি-বিবর্ধনে কতখানি সার্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন সাধারণ মানুষের পক্ষে এই প্রশ্নের উত্থাপন অস্বাভাবিক নয়।

আমার বক্তব্যের অসাধারণ পণ্ডিত পাঠক (যদি কেউ থাকেন) পালটা প্রমাণ করতে পারেন, প্রতিদিন যেখানে বিভিন্ন বিদ্যার ক্ষেত্রসীমা

প্রসারিত হচ্ছে, সেখানে কি একজনের পক্ষে সমস্ত বিদ্যা অধিগত করা সম্ভব ? বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন কি আরও বেড়ে যাচ্ছে না ? তাঁর এই প্রশ্নের উত্তরে সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে আমার বিনীত উত্তর : নিজের অধীত ও অধীতব্য বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন তখনই সার্থক যখন তা অন্যান্য জ্ঞাতিবিদ্যা বা 'অ্যালায়েড ডিসিপ্লিনের' সঙ্গে সমন্বিত হয়। অন্যান্য জ্ঞাতিবিদ্যার মূলসূত্রগুলি জানা না থাকলে নিজের বিষয়ের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে। অর্থাৎ জ্ঞাতিবিদ্যাগুলিতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন তাদের মূলসূত্রগুলির সঙ্গে পরিচিতি। মুদ্রাতত্ত্বে যিনি বিশেষজ্ঞ হতে চলেছেন অর্থবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলির সঙ্গে যদি তাঁর পরিচয় না থাকে তবে তাঁর মুদ্রাতাত্ত্বিক অধ্যয়ন মুদ্রার করণিকসুলভ বর্ণনামাত্রে পর্যবসিত হতে বাধ্য। প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতবর্ষের সমাজ সম্বন্ধে যিনি পড়াশোনা করেছেন বলে দাবি করেন, তিনি যদি ট্রেভেলিআনের 'ইংলিশ সোস্যাল হিসটরী' বা বার্ট্রাণ্ড রাসেলের 'ম্যারেজ অ্যাণ্ড মর্যালস' দেখে প্রশ্ন করেন 'ওটা আবার কি বস্তু', তাহলে তাঁর বিষয়-বিশেষে অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা কতদূর সার্থক ও সম্পূর্ণ সে সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়।

বলা বাহুল্য, আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই ধরনের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারাই সমাকীর্ণ। 'ডক্টরেট' ডিগ্রীর ক্রমপ্রসারী মোহে প্রতি বছর বহু 'ডক্টর' জন্মাচ্ছে, আর সর্বদোষহর এই ডিগ্রীর জোরে সর্বোচ্চ শিক্ষার উঁচু আসনগুলিতে গিয়ে যাঁরা বসছেন, যথার্থ শিক্ষার্থী তাঁদের কাছ থেকে যা পাবেন তা না পেলে কিংবা পেয়ে বর্জন করলে ভারতবর্ষের শিক্ষাজগৎ বাঁচবে, অন্যথায় তাঁর মানসিক মৃত্যু অনিবার্য।

ভারতবর্ষে সমাজবিজ্ঞানের মতো আধুনিক বিদ্যার সার্থক পত্তন ও প্রসার আপাতত তাই কিঞ্চিৎ দূরবর্তী বলেই মনে হচ্ছে।

নির্ঘণ্ট

দ্রষ্টব্য : উদ্ধৃতিচিহ্নভুক্ত শব্দ গ্রন্থনাম-নির্দেশক।

সংযোজন ও সংশোধন

সং যো জ ন

পৃ. ৬২, ২৮ সংখ্যক পংক্তির পরে নূতন প্যারা ॥ কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি আধুনিক ঐতিহাসিকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিচয় দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ভারত-সংস্কৃতির নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি এবং স্থানীয় ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা প্রশংসনীয়। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে শিষ্য রাখালদাসের মনোগত সাধর্ম্য আছে (পৃ. ৯১)। হিন্দু উৎসব অনুষ্ঠানের নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াসের একটি উদাহরণ 'দুর্গোৎসবে নব পত্রিকা' ('হরপ্রসাদ রচনাবলী', দ্বিতীয় সম্ভার, পৃ. ৪৪১-৪২)। সুলিখিত ও তথ্যপূর্ণ এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: 'অ্যানথ্রোপলজির পুস্তক পড়িলে দেখা যাইবে পৃথিবীর নানা স্থানে শীতের প্রারম্ভে এইরূপ গাছপালা লইয়া উৎসব হইয়া থাকে। ক্রমে সেই গাছপালার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হন। ক্রমে সেই দেবতাগণের মূর্ত্তি হইল।...দুর্গা-মাহাত্ম্যের সহিত মিলাইয়া মূর্ত্তি হইতে ছোটখাট মূর্ত্তি বাদ দিয়া বড় বড় মূর্ত্তি দিয়া উৎসবের প্রতিমা গড়া হইল। ক্রমে সেই সকল মূর্ত্তি এক মূর্ত্তিতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। তিনিই প্রধান মূর্ত্তি দশভুজা। গাছপালার পূজা ক্রমে ব্রাহ্মণদের হাতে পড়িয়া অদ্বৈতে পরিণত হইল।' পূর্বগামী রাজেন্দ্রলালের মতো হরপ্রসাদও আঞ্চলিক ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণার গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন। অন্তত তাঁর একটি উক্তি থেকে একথা মনে করার কারণ আছে: 'বাঙ্গালাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্যেক জেলার ইতিহাস সমন্বয় করিয়া দেখিলে ইতিহাস যে একটা জানার জিনিস, আমরা না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি সেটা বেশ বোধগম্য হয় (তদেব, পৃ. ৪৯৫)।'

পৃ. ১৫৭-৫৯ ॥ লেখনসামগ্রীর ব্যাপারে 'কাব্যমীমাংসা'র দশম অধ্যায়ে রাজশেখর (নবম-দশম শতাব্দী) কবি অর্থাৎ লেখকের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন: 'তস্য সম্পুটিকা সফলকটিকা, সমুদ্রকঃ, সলেখনীমষীভাজনানি তাড়িপত্রাণি ভূর্জত্বচো বা, সলোহকণ্টকানি তালদলানি সুসম্মৃষ্টা ভিত্তয়ঃ সততসন্নিহিতাঃ স্যুঃ।' অর্থাৎ হাতের কাছে সব সময় সম্পুটিকা (বাক্স), চকখড়িসহ একটি ফলক, তাড়ি (তাড়পত্র) ও ভূর্জপত্র, কলম, কালি ও দোয়াত, লৌহকীলক (স্টাইলাস) ও তালপত্র এবং মাজিত ও পরিচ্ছন্ন লেখনপট্ট রাখবে।

পৃ. ১৫৮ ॥ 'দোয়াত' বা 'দত' আরবী 'দবাত'-এর রূপান্তর।

পৃ. ১৫৯ ।। দোয়াতের মতো 'কলম' শব্দটিও আরবী, তবে এটির মূল বোধ হয় সংস্কৃত 'কলম্ব', কলম্বের অর্থ শাকনালিকা বা ডাঁটা ; ডাঁটার সঙ্গে সাদৃশ্য হেতুই কি লেখনী কলম ? হওয়া আশ্চর্যের নয়। 'কলম' শব্দও সংস্কৃত সাহিত্যে আছে, অর্থ শালি জাতীয় ধান্যবিশেষ, তা থেকে সরাসরি লেখনী অর্থে 'কলম' এসেছে কিনা বলা শক্ত। লেখনী অর্থে কলম অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন সংস্কৃত অভিধানগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে।

সং শো ধ ন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১৩	(১৮৫৭-১৯৩১)	(১৮৫৩-১৯৩১)
৫	৮-৯	তথ্যনিষ্ঠ হয়েও কলার উদ্ভব,...বাংলাদেশের শিল্পকলার	তথ্যনিষ্ঠ হয়েও উপন্যাসের মতো সুখপাঠ্য। ভারতবর্ষের বিশেষত বাংলাদেশের শিল্পকলার উদ্ভব
২২	১৩ পাদটীকা	Cunpingham	Cunningham
৬৪	১২	প্রাটী	পাটী (অর্থাৎ পাদটীকা)
৬৪	১৭	অগৌণ নয়	গৌণ নয়
৬৬	২	এবং সসভাপতির	এবং দুবার সভাপতির
১০৭	৫	দেবত্রবলির	দেবতাবলির
১৫৪	২৯	সপ্তম-অষ্টম শতকের	ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের
১৫৬	৩-৪	নিয়া, খোটান প্রভৃতি	খোটানের নিয়া, এন্‌ডেরে প্রভৃতি
১৫৭	২৭	নিয়া, কাশগড়, খোটান প্রভৃতি	কাশগড় এবং খোটানের নিয়া, এন্‌ডেরে প্রভৃতি
১৮৩	২২	শিল্পোতিহাস	শিল্পেতিহাস
১৮৭	১	৫০৪ বছর আগে	৫২৪ বছর আগে